

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

কোর্স কোড: SSC 1659

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এসএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

কোর্স কোড : SSC-1659

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এসএসসি প্রোগ্রাম)

প্রণেতা

প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান
প্রফেসর ড. আশফাক হোসেন
প্রফেসর ড. সুলতানা নিগার চৌধুরী

সৃজনশীল অংশের লেখক
প্রফেসর সাবিতা ইসলাম

সম্পাদক

প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন

সমন্বয়কারী
ড. মো. আদনান আরিফ সালিম

ওপেন স্কুল



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

কোর্স কোড :SSC-1659

এসএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৬

পুনঃমুদ্রণ : মে, ২০১৭

পুনঃমুদ্রণ : মে, ২০১৮

পুনঃমুদ্রণ : মার্চ, ২০১৯

পুনঃমুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২০

অনলাইন সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২২

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুল্লাহ আব্বাস

কতার গ্রাফিকস

আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ তিপু সুলতান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-3123-03

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ

মোল্লা প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

হাসেম রোড, মাতুয়াইল, ঢাকা।

নিবেদন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা নামক বইটি রচিত। বইটি স্ব-শিখন তথা মডিউলার পদ্ধতিতে খুবই সহজ করে লেখা হয়েছে। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস বিষয়টি সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্র ও ড্রাই সংযোজন করা হয়েছে। বইটি রচনায় প্রাঞ্জ লেখকগণ ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। আমরা বইটি কোর্সের চাহিদা অনুযায়ী যতোটা সম্ভব সংক্ষেপ করার চেষ্টা করেছি। তারপরও পাঠ্ক্রমের কারণে আরো সংক্ষিপ্ত করা গেল না। আমরা চেয়েছিলাম, এ পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভারাক্রান্ত না করতে। তবে এ কারণে, প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ যায়নি। উচ্চতর ক্লাশে ছাত্ররা আরো বিস্তারিতভাবে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবে।

আশা করি বইটি স্ব-শিখন পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের খুবই উপকারে আসবে। এই ইতিহাস পাঠ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনমান উন্নয়ন ও দেশগড়ার কাজে লাগাবে। বইটির লেখক, রিভিউয়ার, সমন্বয়ক এবং ওপেন স্কুলের ডিন ও কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বইটি যাদের জন্য লেখা তারা উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২০১৬/১৪২৩



কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

কোর্স কোড : SSC-1659

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উচ্চুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এসএসসি প্রোগ্রামের নতুন সিলেবাসের আলোকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য স্ব-শিখন পাঠ্সম্মতী হিসেবে ‘বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা’ বইটি রচিত হয়েছে।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠ্সম্মতী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদুর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্স বইটির ভাবগত এক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশেষ কোন দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। ইউনিটটি কত সময়ে শেষ করতে হবে তা ইউনিটের শুরুতে উল্লেখ করা আছে এবং ইউনিটে কতগুলো পাঠ আছে তাও উল্লেখ করা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে এ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কী না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি মূলপাঠ অবশ্যই বুঝে-বুঝে পড়তে হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে এ পাঠের সারসংক্ষেপ দেয়া আছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোন্তর মূল্যায়নে এবং ইউনিটের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ও স্বীকৃত প্রশ্ন দেয়া হয়েছে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

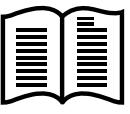
শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো :

- ইউনিটের শিরোনাম, ভূমিকা ও উদ্দেশ্য পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো ‘উদ্দেশ্য’ পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হলো কী না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোন ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নেট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীর কাজ (অ্যাকটিভিটি) সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাকটিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- অধ্যয়নের শেষে পাঠোন্তর মূল্যায়নের সমস্যাগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন। বই-এর শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং সমস্যার সঠিক সমাধানের চেষ্টা করুন। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রয়োজনে সহপাঠিদের সাথে সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন, দেখবেন সমাধানের পথ সহজ হয়ে গেছে।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোয়েগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে কতটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রত্যেক টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে

আপনার নেট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের (শিক্ষকের) সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মডিউল এর কোনটি শিখনফল, কোন্টি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোন্টি পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন, কোন্টি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা | কোর্স/ইউনিট সমাপ্তির সময় | উদ্দেশ্য | বিষয়বস্তু/মূলপাঠ | শিক্ষার্থীর কাজ | সারসংক্ষেপ |
|  |  |  |  |  |  |
| পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন | চূড়ান্ত মূল্যায়ন | উত্তরমালা | ভিডিও বা দেখা | অডিও বা শোনা | সাহায্য/প্রয়োজনে |

| | | |
|---|---------------------|---|
|  | কোর্স সমাপ্তির সময় | কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ ৯০ দিন সময় লাগবে |
|---|---------------------|---|

| | |
|---|---|
|  | এ বিষয়ের অডিও ও ভিডিও প্রোগ্রাম যথাক্রমে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হবে। প্রোগ্রামের সিডিউল সংগ্রহ করে তা শুনতে পাবেন। |
|---|---|

| | | |
|---|-------------------|---|
|  | সাহায্য/প্রয়োজনে | সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন- |
| | | মো. আদনান আরিফ সালিম কোর্স শিক্ষক ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর-১৭০৫। |

সূচিপত্র

প্রফেসর ড. সুলতানা নিগার চৌধুরী (ইউনিট-১,২)

| | |
|--|------|
| ইউনিট ১: ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা | ১-৩ |
| পাঠ ১.১: ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা | ১ |
| ইউনিট ২: বিশ্বসভ্যতা..... | ৮-২০ |
| পাঠ ২.১: মিসরীয় সভ্যতা | ৮ |
| পাঠ ২.২: মেসোপটেমীয় সভ্যতা..... | ৮ |
| পাঠ ২.৩: সিঙ্গু সভ্যতা | ১০ |
| পাঠ ২.৪: চিন সভ্যতা..... | ১৪ |
| পাঠ ২.৫: ছিক সভ্যতা | ১৮ |

প্রফেসর ড. আশফাক হোসেন (ইউনিট-৩, ৪, ৫, ৬, ৭)

| | |
|--|-------|
| ইউনিট ৩: বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব..... | ২১-২৭ |
| পাঠ ৩.১: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি | ২১ |
| পাঠ ৩.২: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং এর প্রভাব | ২৫ |
| ইউনিট ৪: প্রাচীন বাংলার জনপদ ও রাজনৈতিক ইতিহাস..... | ২৮-৪১ |
| পাঠ ৪.১: প্রাচীন বাংলার জনপদ..... | ২৮ |
| পাঠ ৪.২: প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস..... | ৩২ |
| পাঠ ৪.৩: বাংলায় পাল বংশের শাসন..... | ৩৪ |
| পাঠ ৪.৪: বাংলায় সেন বংশের শাসন..... | ৩৮ |
| ইউনিট ৫: প্রাচীন বাংলার জীবনচর্চা..... | ৪২-৪৯ |
| পাঠ ৫.১: প্রাচীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি | ৪২ |
| পাঠ ৫.২: প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি | ৪৬ |
| ইউনিট ৬: মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস..... | ৫০-৬৫ |
| পাঠ ৬.১: বখতিয়ার খিলজি ও বাংলায় তুর্কি শাসন..... | ৫০ |
| পাঠ ৬.২: ইলিয়াস শাহ ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন..... | ৫৫ |
| পাঠ ৬.৩: হোসেনশাহী বংশের অধীনে বাংলা | ৫৮ |
| পাঠ ৬.৪: বাংলায় মোগল শাসন ও বার ভুইয়া | ৬১ |
| ইউনিট ৭: মধ্যযুগে বাংলার জীবনচর্চা..... | ৬৬-৭২ |
| পাঠ ৭.১: মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি | ৬৬ |
| পাঠ ৭.২: মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি..... | ৭০ |

প্রফেসর ড. সুলতানা নিগার চৌধুরী (ইউনিট-৮, ৯, ১০, ১১, ১২)

| | |
|--|-------|
| ইউনিট ৮: বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন | ৭৩-৮৪ |
| পাঠ ৮.১: বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন | ৭৩ |
| পাঠ ৮.২: বাংলায় ইংরেজদের ক্ষমতা দখল | ৭৬ |
| পাঠ ৮.৩: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত | ৮১ |

| | |
|--|----------------|
| ইউনিট ৯: বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রভাব | ৮৫-৯১ |
| পাঠ ৯.১: অর্থনৈতিক শোষণ ও দুর্ভিক্ষ | ৮৫ |
| পাঠ ৯.২: বাংলায় ইংরেজদের সংক্ষার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন | ৮৯ |
| ইউনিট ১০: বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ..... | ৯২-১০১ |
| পাঠ ১০.১: ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ..... | ৯২ |
| পাঠ ১০.২: তিতুমীরের সংগ্রাম | ৯৫ |
| পাঠ ১০.৩: নীল বিদ্রোহ..... | ৯৭ |
| পাঠ ১০.৪: ফরায়েজি আন্দোলন..... | ৯৯ |
| ইউনিট ১১: বাংলায় নবযুগ | ১০২-১১১ |
| পাঠ ১১.১: নবজাগরণ ও রাজা রামমোহন রায় | ১০২ |
| পাঠ ১১.২: ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ১০৫ |
| পাঠ ১১.৩: নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী | ১০৮ |
| পাঠ ১১.৪: বেগম রোকেয়া | ১১০ |
| ইউনিট ১২: ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন..... | ১১২-১৩৩ |
| পাঠ ১২.১: ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম | ১১২ |
| পাঠ ১২.২: ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন..... | ১১৬ |
| পাঠ ১২.৩: বঙ্গভদ্র ও স্বদেশী আন্দোলন..... | ১১৯ |
| পাঠ ১২.৪: খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন | ১২২ |
| পাঠ ১২.৫: লাহোর প্রস্তাব | ১২৬ |
| পাঠ ১২.৬: ত্রিটিশ শাসনের অবসান | ১২৯ |
| প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান (ইউনিট-১৩, ১৪) | |
| ইউনিট ১৩: ভাষা আন্দোলন ও বাঞ্ছিলির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৮-১৯৬৯..... | ১৩৪-১৬৭ |
| পাঠ ১৩.১: ভাষা আন্দোলন : পটভূমি, ঘটনা প্রাবাহ ও প্রভাব..... | ১৩৪ |
| পাঠ ১৩.২: যুক্তফন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন | ১৪২ |
| পাঠ ১৩.৩: সামরিক শাসন ও আইয়ুবীয় স্বৈরাচার..... | ১৪৮ |
| পাঠ ১৩.৪: ছয়দফা আন্দোলন | ১৫৭ |
| পাঠ ১৩.৫: আগরাতলা মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান | ১৬২ |
| পাঠ ১৩.৬: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান | ১৬৫ |
| ইউনিট ১৪: ১৯৭০ এর নির্বাচন ও যুক্তিযুদ্ধ..... | ১৬৮-২০৪ |
| পাঠ ১৪.১: ১৯৭০ সালের নির্বাচন | ১৬৮ |
| পাঠ ১৪.২: অসহযোগ আন্দোলন : মার্চ ১৯৭১ | ১৭২ |
| পাঠ ১৪.৩: বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা | ১৭৭ |
| পাঠ ১৪.৪: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র : মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ১৭৯ |
| পাঠ ১৪.৫: বেসামরিক ও সামরিক প্রতিরোধ এবং ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ | ১৮৫ |
| পাঠ ১৪.৬: জেনোসাইড বা গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ১৯৭১-এর শরণার্থী | ১৮৮ |
| পাঠ ১৪.৭: মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা | ১৯২ |
| পাঠ ১৪.৮: মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত | ১৯৭ |
| পাঠ ১৪.৯: স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও বিজয় দিবস | ১৯৯ |
| পাঠ ১৪.১০: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সরকার গঠন..... | ২০১ |

ইউনিট ১

ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে, নয় মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে আমরা বিজয়ী হয়েছি। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্বের, গৌরবের কাহিনি। বাঙালি জাতির এমন অনেক গৌরবের কাহিনি আছে। যে সব জানতে হলে ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন। ইতিহাস তুলে ধরে দেশ বা জাতির বিভিন্ন যুগের সামাজিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের সত্যনির্ণ ধারাবাহিক বর্ণনা। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত এই সব বর্ণনাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ইতিহাস পাঠ করতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে ইতিহাস কী? জানতে হবে এর বিষয়বস্তু এবং পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এই ইউনিটে এসব বিষয় নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ দিন

পাঠ-১.১ ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ইতিহাসের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিবরণ দিতে পারবেন;
- ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

ঐতিহ্য, ইতিহ+আস, হিস্টরিয়া, ইতিহাসের জনক, গুহাবাসী, কৃষিসভ্যতা, ভিকো, লিওপোল্ড ফন র্যাংকে



ইতিহাসের সংজ্ঞা: ‘ইতিহাস’ শব্দটির উৎপত্তি ‘ইতিহ’ শব্দ থেকে যার অর্থ ‘ঐতিহ্য’। ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয় ইতিহাস। ঐতিহাসিক ই.এইচ.কার-এর ভাষায়, ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তর্হীন সংলাপ।

ইতিহাস শব্দটির সঙ্গে বিচ্ছেদ করলে এর রূপ দাঁড়ায়, ইতিহ+আস। যার অর্থ এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ড. জনসনও ঘটে যাওয়া ঘটনাকে ইতিহাস বলেছেন। তাঁর মতে, যা কিছু ঘটে তাই ইতিহাস। যা ঘটে না তা ইতিহাস নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে নিরন্তর বয়ে যাওয়া ঘটনা প্রবাহই ইতিহাস।

গ্রিক শব্দ ‘হিস্টরিয়া’ (Historia) থেকে ইংরেজি ‘হিস্ট্রি’ (History) শব্দটির উৎপত্তি। যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ইতিহাস। ‘হিস্টরিয়া’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক) তিনি ‘ইতিহাসের জনক’ হিসেবে খ্যাত। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণা কর্মের নামকরণে এ শব্দটি ব্যবহার করেন যার আভিধানিক অর্থ হলো সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস হলো যা সত্যিকার অর্থে ছিল বা সংঘটিত

হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা ও লেখা। তিনি তাঁর গবেষণায় ছিস ও পারস্যের (বর্তমানে ইরান) মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন।

এতে তিনি প্রাণ্ত তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ এবং গ্রিসের বিজয়গাঁথা লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ ঘটনা ভুলে না যায়। এ বিবরণ যাতে তাদের উৎসাহিত করে এবং দেশপ্রেমে উন্নুন্দ করে। হেরোডোটাসই প্রথম ইতিহাস এবং অনুসন্ধান – এ দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করেন। ফলে ইতিহাস পরিগত হয় বিজ্ঞানে; পরিপূর্ণভাবে হয়ে ওঠে তথ্য নির্ভর এবং গবেষণার বিষয়। ইতিহাসবিদ টয়েনবির মতে, সমাজের জীবনই ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের অন্ত ঘটনা প্রবাহহই হলো ইতিহাস। আবার র্যাপসন বলেছেন, ইতিহাস হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বর্ণনা। আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন্ড র্যাংকে মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ইতিহাস হলো মানব সমাজের অতীত কার্যাবলির বিবরণ। সুতরাং সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার বিবরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। সঠিক ইতিহাস সব সময় সত্যকে নির্ভর করে রচিত।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু : মানব সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রামাণ্য ও লিখিত দলিল হলো ইতিহাস। ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিকো (Vico) মনে করেন যে, মানব সমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশ হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানব জীবনের গতিধারা সৃষ্টির শুরু থেকে যা কিছু ঘটেছে, সব কিছুই ইতিহাস। কিন্তু ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা ইতিহাসে স্থান পায় না, বরং যে সব ঘটনা বা বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তাই সাধারণত ইতিহাসে স্থান পায়। এসব ঘটনাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।



ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস শুধু ঘটনার সমষ্টি নয়, ঘটনার অন্তরালে থাকা পরিস্থিতির বিশ্লেষণও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো মানব সমাজ, সভ্যতা বিকাশের ধারাবিবরণী। অর্থাৎ মানুষের আদিম সভ্যতা ও তার ক্রমবিকাশ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এক সময় মানুষ ছিল গুহাবাসী। তার জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল শিকার, মাছধরা, ফলমূল সংগ্রহ। এরপর ধীরে ধীরে তার জীবিকার ধরণ বদলাতে থাকে। এক সময় যায়াবর মানুষ কৃষিজীবী মানুষে পরিণত হয়। এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কৃষিসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকে নগরসভ্যতা। এসব পরিবর্তনের বিবরণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা মানব সমাজ-সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাস ভূক্ত বিষয়। যেমন- শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম আইন – প্রভৃতি বিষয় সামগ্রিকভাবে যা কিছু সমাজ-সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা: মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবরণের সত্য নির্ভর বিবরণ হচ্ছে ইতিহাস। যে কারণে জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাসের গুরুত্ব অসীম। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুবাতে, ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের ফলে মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজদেশ সম্পর্কে মঙ্গল-অঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব। সুতরাং দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তির প্রয়োজনে ইতিহাস পাঠ অত্যন্ত জরুরি।

অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ জাতির সফল সংগ্রাম, গৌরবময় ঐতিহ্যের তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উন্নুন্দ করে। একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। সে ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই।

ইতিহাস জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উখান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালো মন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুবাতে পারে। ফলে সে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

ইতিহাসের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ ইতিহাস পাঠ করে অতীত ঘটনাবলির দ্রষ্টব্য থেকে শিক্ষা নিতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। ইতিহাস দৃষ্টিভঙ্গের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় বলে ইতিহাসকে বলা হয় শিক্ষনীয় দর্শন। মানুষ তার অতীত ঘটনা জানতে চায়। ইতিহাস পাঠ করার মাধ্যমেই অতীতকে জানা সম্ভব।

সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠ করে যে জ্ঞান লাভ হয়, তা বাস্তব জীবনে চলার জন্য উৎকৃষ্টতম শিক্ষা। ইতিহাস পাঠ করলে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, যা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গ তৈরিতে সাহায্য করে। ফলে জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ জন্মে।

| | |
|--|---|
|  <p>অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) শিক্ষার্থীর কাজ</p> | <p>১। সত্যনির্ণিত তথ্যের সাহায্যে অতীতকে পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য – ব্যাখ্যা করুন।</p> <p>২। আপনার এলাকার অথবা কাছাকাছি অবস্থিত কোন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে তার ঐতিহাসিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন।</p> |
|--|---|

সারসংক্ষেপ

ইতিহাস হলো মানব সভ্যতা ও মানব সমাজের অগ্রগতির ধারাবাহিক সত্যনির্ভর বিবরণ। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির উত্থান পতনের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ঘৃক পশ্চিত হেরোডেটাস সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সম্মতভাবে মানুষের অতীতের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে রচনার চেষ্টা করেছিলেন বলে তাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। ইতিহাস পাঠ করে আমরা অতীতের অবস্থা জানতে পারি। আবার অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎও গড়তে পারি। সর্বোপরি ইতিহাস পাঠ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, আত্মর্যাদাবোধ এবং জাতীয়তাবোধেরও জন্ম দেয়। সে ক্ষেত্রে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ একটি শাস্ত্র বা বিষয়।

পাঠোভ্র মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

সুজনশীল প্রশ্ন

নিলুফারের মেয়ে বইমেলায় কিছু ইতিহাসের বই কিনছিল। কারণ তার পিয়া বিষয় ইতিহাস। শ্রেণিকক্ষেও সে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় সবার আগে, সেই সাথে প্রশ্ন করে জানতে চায় ইতিহাস পাঠ করা কেন প্রয়োজন? শিক্ষক উভয়ের বলেন মানুষ ও তার চারপাশ এবং এর ধারাবাহিক অগ্রগতি সবই ইতিহাসের অংশ। তদুপরি “ইতিহাস সত্য নির্ভর” যা পার্টের মাধ্যমে দেশকে ভালোবেসে দেশ গঠনে মানুষ এগিয়ে যায়।

ক. কোন ইতিহাসবিদের মতে “সমাজের জীবনই ইতিহাস”।

খ. ইতিহাসের জ্ঞান মানবকে সচেতন করে তোলে কীভাবে? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দিপকের শিক্ষকের উত্তরের সাথে পাঠ্যপদ্ধতিকের ইতিহাসের বিষয়বস্তুর কটকট মিল রয়েছে। তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. ইতিহাসের উপাদান সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমন্ব দেশ গঠন করে - আপনার উন্নয়নের স্বপক্ষে যত্নি দিন।

ଉତ୍ତରମାଳା

পাঠ্টোভৰ মূল্যায়ন- ১.১ : ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক

ইউনিট

২

বিশ্বসভ্যতা

আদিম যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানত না। বনে জঙলে ঘুরে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করত। এই ছিল তাদের খাদ্য। এরপর মানুষ পাথর ভেঙে ঘষে ঘষে ধারালো অস্ত্র তৈরি করতে শেখে। সে সময় পাথরটি ছিল তাদের একমাত্র হাতিয়ার। সে কারণে এ যুগকে পাথরের যুগ বলা হয়। পাথর যুগের প্রথম পর্যায়কে বলা হতো পুরনো পাথরের যুগ বা পুরোপলীয় যুগ। এ যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে দলবদ্ধভাবে পশ্চ শিকার করত। এরা আগনের ব্যবহারও জানত।

পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষ যখন কৃষিকাজ শেখে, একই সঙ্গে শেষ হয় তার যায়াবর জীবন। এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির প্রয়োজনে এযুগে মানুষ নদীর তীরে তীরে বসবাস শুরু করে। ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে শেখে। এভাবেই মানব সভ্যতার শুরু। এই ইউনিটে কীভাবে মানুষ ধাপে ধাপে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তারই সত্য কাহিনী, যাকে আমরা বলি ইতিহাস— সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যে সভ্যতাগুলো থেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস জানা যায় এমনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা সম্পর্কে এ ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, সিঙ্গু সভ্যতা, চীন সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, রোমান সভ্যতা।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : মিশরীয় সভ্যতা

পাঠ-২.২ : মেসোপটেমীয় সভ্যতা

পাঠ-২.৩ : সিঙ্গু সভ্যতা

পাঠ-২.৪ : চীন সভ্যতা

পাঠ-২.৫ : হিন্দু সভ্যতা

পাঠ-২.৬ : রোমান সভ্যতা



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন

পাঠ-২.১ মিশরীয় সভ্যতা



এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ধারাবাহিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- নীলনদের অবদান, প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিশ্বসভ্যতা বিকাশে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।



মুক্ত শব্দ (Key Words)

খ্রিস্টপূর্ব, ঐতিহাসিক যুগ, হায়ারোগ্লিফিক, নরপতি, ফারাও, মমি, পিরামিড, প্রাচীন
বিশ্বসভ্যতা, নোম, ‘পের-ও’, নারমার, মেনেস



পটভূমি

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বিস্তৃতিকাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ পর্যন্ত। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ যা আমাদের কাছে পরিচিত ইঞ্জিপ্ট বা মিশর নামে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অন্দে মিশরে প্রথম সাম্রাজ্যের উত্তর ঘটে। যার একটি ছিল উত্তর মিশর (নিম্ন মিশর) অপরটি ছিল দক্ষিণ মিশর (উচ্চ মিশর)। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সময়ে নীলনদের অববাহিকায় একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সে সময়টা প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলে

পরিচিত। এ সময় থেকে মিশর প্রাচীন সভ্যতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে। প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দ থেকে। তখন থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের শুরু। একই সময়ে নিম্ন ও উচ্চ মিশরকে একত্রিত করে ‘নারমার’ বা ‘মেনেস’ একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি এবং পুরোহিত হন। তিনি প্রথম ফারাও-এর মর্যাদাও লাভ করেন। এরপর থেকে ফারওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করে।

সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান

বিশ্বসভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

রাষ্ট্র ও সমাজ

প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতগুলো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে ‘নোম’ বলা হতো। মিশরের প্রথম রাজা বা ফারাও-এর (মেনেস বা নারমার) অধিনে ঐক্যবদ্ধ মিশরের রাজধানী ছিল দক্ষিণ মিশরের মেফিস। মিশরীয় ‘পের-ও’ শব্দ থেকে ফারাও শব্দের জন্ম। ফারওরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তারা নিজেদেরকে সূর্য দেবতার বংশধর মনে করতেন। ফারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। অর্থাৎ ফারাওয়ের ছেলে হতো উত্তরাধিকার সৃত্রে ফারাও। পেশার উপর ভিত্তি করে মিশরের সমাজের মানুষকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন: রাজপরিবার, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকার, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক ও ভূমিদাস।

মিশরের অর্থনৈতি মূলত ছিল কৃষি নির্ভর। নীল নদের তীরে গড়ে তোলা সভ্যতার মানুষ অর্থাৎ মিশরীয়রা বন্যার সময় বাঁধ তৈরি করে ফসল রক্ষা করত। আবার শুক্র মৌসমে ফসলের ক্ষেতে পানি দেয়ার জন্য খাল কেটে গড়ে তুলেছিল সেচ ব্যবস্থা। মিশরেই প্রথম সরকারি ব্যবস্থায় চাষাবাদ চালু হয়। কৃষিনির্ভর মিশরের উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গম, ঘব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচ ইত্যাদি। ব্যবসায়-বাণিজ্যও মিশর ছিল অগ্রগামী। মিশরে উৎপাদিত গম, লিনেন কাপড় ও মাটির পাত্র ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় রপ্তানি হতো। বিভিন্ন দেশ থেকে মিশরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি আমদানি করতো।

নীল নদ:

মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফিকার লেক ভিট্টেরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক ‘হেরোডেটাস’ যথার্থে বলেছেন— ‘মিশর নীল নদের দান।’ নীল নদ না থাকলে মিশর মরংভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীন কালে প্রতিবছর নীল নদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল।

মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস

সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানবসভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে। তারা জড়বন্ধনের পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্মের পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মীবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, সূর্যদেবতা ‘রে’ বা ‘আমন রে’ এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীলনদীর দেবতা ‘ওসিরিস’ মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন। তবে তাদের জীবনে সূর্যদেবতা ‘রে’-এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।



পিরামিড

মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মৃতদেহ সংরক্ষণ করত। এই পদ্ধতিকে বলা হয় মর্ম। এই চিন্তা থেকে মরিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। ফারাওর উল্লেখের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করতেন। তাঁরা ছিলেন প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতদেরও তাঁরা নিয়োগ করতেন।

শিল্প

মিশরের চিরাশিল্পও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। মিশরীয়দের চিরকলা বিশেষভাবে বৈচিত্রপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের চিরাশিল্পের সূচনা হয় সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে। তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা-কালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিরাশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে।

কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারুশিল্পের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।



প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকর্ম

ফ্রিংকস

ভাস্কর্য

প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্য শিল্পে-অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য, মানুষ অথবা জীবজন্তু সবই ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতদার্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গির্জার অতুলনীয় ফ্রিংকস। ফ্রিংকস হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহটা সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নির্দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

লিখনপদ্ধতি ও কাগজ আবিষ্কার

মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উত্তর ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঙ্গনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিরালিপি। এই চিরালিপিকে বলা হয় ‘হায়ারোগ্রাফিক’ বা পরিত্র অক্ষর। মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের মত থেকে কাগজ বানাতে শেখে। পরে এই কাগজের উপর তারা লিখতে শুরু করে। গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় ‘প্যাপিরাস’। যে শব্দ থেকে ইংরেজি ‘পেপার’ শব্দের উৎপত্তি। এখানে উল্লেখ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয়, যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। এতে গ্রিক এবং ‘হায়ারোগ্রাফিক’ ভাষায় অনেক লেখা ছিল; যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়।



লিখন পদ্ধতি বা হায়ারোগ্রাফিক

বিজ্ঞান

মিশরীয় সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। সে কারণে নীল নদের প্লাবন, নাব্যতা, পানি প্রবাহের মাপ জোয়ারভাটা ইত্যাদি ছাড়াও জমির মাপ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এসবের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অংক শাস্ত্রের ছিল গভীর যোগাযোগ। ফলে এ দুটি বিদ্যা তারা আয়ত্ন করেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। তারা অংক শাস্ত্রের দুটি শাখা— জ্যামিতি এবং পাটিগণিতেরও প্রচলন করে। মিশরীয় সভ্যতার মানুষ যোগ, বিয়োগ ও ভাগের ব্যবহার জানত। খ্রিস্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে তারা পৃথিবীতে প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। ৩৬৫ দিনে বছর এ হিসাবের আবিষ্কারকও তারা। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য সূর্য ঘড়ি, ছায়াঘড়ি, জলঘড়ি আবিষ্কার করে। ধর্মের কারণে মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন মিশরীয়রা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল। তারা চোখ, দাঁত, পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত। অঙ্গোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিদ্যাও তাদের জানা ছিল। তারা হাড় জোড়া লাগানো, হংপিণ্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত। চিকিৎসা শাস্ত্রে মিশরীয়রাই সর্বপ্রথম ‘মেটেরিয়া মেডিকা’ বা ঔষুধের তালিকা প্রণয়নে সক্ষম হয়। মিশরীয়রা দর্শন, সাহিত্য চর্চাও করত। তাদের রচনায় দুঃখ হতাশার কোন প্রকাশ ছিল না। তারা আশাবাদী ছিল। তাদের লেখায় সব সময়ই আনন্দের প্রকাশ দেখা গেছে।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | মানব সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদানের একটি তালিকা প্রস্তুত করছি। |
|---|---|

১ সারসংক্ষেপ

প্রাচীন মিশরীয়রা মানব সভ্যতার ইতিহাসে গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতি তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা যায়। চিত্রকলায় আছে বিশেষ বৈচিত্রিপূর্ণ অবদান। লিখন পদ্ধতির উভাবন, সেচ ব্যবস্থা চালু, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র অংক শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। যে কারণে মানব জাতি এখনও মিশরীয়দের কাছে ঝণী।

২ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মিশরীয়রা ব্যঙ্গনবর্ণের কয়টি বর্ণ আবিষ্কার করে?

- | | |
|-----------|-----------|
| (ক) ১১ টি | (খ) ৩৯ টি |
| (গ) ২৪ টি | (ঘ) ২৩ টি |

২। হায়ারোগ্নিফিক কী?

- | | |
|------------------------|----------------|
| (ক) মিশরীয় চিত্র লিপি | (খ) চীনের লিপি |
| (গ) গ্রিক লিপি | (ঘ) রোমান লিপি |

৩। মিশরীয়রা মৃতদেহ মরি করে রাখত কেন? (অনুধাবণ)

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (ক) দেহকে জীবিত করার জন্য | (খ) দেহকে কবর দেওয়ার জন্য |
| (গ) দেহ সৎকারের জন্য | (ঘ) দেহকে তাজা রাখার জন্য |

৪। মিশরের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হয়ে ওঠে-

- | | |
|--|--|
| i) বন্যায় বাঁধ দিয়ে ফসল রক্ষা করার মাধ্যমে | ii) শুক্র মৌসুমে খাল কেটে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় |
| iii) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায় | |

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|------|-----------|-------------|------------|
| ক) i | খ) i ও ii | গ) ii ও iii | ঘ) i ও iii |
|------|-----------|-------------|------------|

পাঠ-২.২ মেসোপটেমীয় সভ্যতা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাগুলোর নাম বলতে পারবেন।



নগর সভ্যতা, সেচ ব্যবস্থা, উর্বরভূমি, বেদুইন, মন্দির, আইনের শাসন, মরংভূমি।

মুখ্য শব্দ (Key Words)



মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান

খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ অন্দে মিশরে যখন নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেই সময় আরো কিছু নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই নগর সভ্যতাগুলোর আলাদা আলাদা নাম থাকলেও, একই ভূখণ্ডে গড়ে ওঠার কারণে এদেরকে একত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলা হয়। বর্তমান ইরাক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যেই প্রাচীন মেসোপটেমীয়া অঞ্চল অবস্থিত।

মেসোপটেমীয়া একটি ত্রিক শব্দ। যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। মেসোপটেমীয়া বলতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাত) এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বোঝায়। এই উর্বর ভূখণ্ডের উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, পশ্চিম ও দক্ষিণে আরব মরংভূমি; দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর, পূর্বে এলাম পার্বত্যাঞ্চল এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত।

মেসোপটেমীয়ার অর্তভুক্ত সভ্যতাসমূহ

প্রাচীন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যেমন: সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, এ্যাসিরীয়, ক্যালতীয় ও আকাদীয় সভ্যতা।

নগর সভ্যতার উদ্ধার

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫,৫০০ অন্দে দক্ষিণ মেসোপটেমীয়ার অধিবাসীরা ইউফ্রেটিস নদীর পানির প্রবাহ পরিবর্তন করে এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করতে শেখে। মেসোপটেমীয়ায় কৃষি কাজের জন্য এ ধরনের সেচ ব্যবস্থার খুবই দরকার ছিল। কারণ এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই কম হতো। আস্তে আস্তে ঐ অঞ্চলবাসীরা বুঝতে পারে যে, বৃষ্টির পানির চেয়ে, সেচের পানি চাষের জন্য বেশি উপযোগী এবং উপকারী। এতে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রাচুর ফসল ফলতে থাকে। ফলে কিছু মানুষের হাতে অতিরিক্ত সম্পদ জমা হতে থাকে। পরবর্তীকালে এরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং শাসক বা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করেই নগরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামোর ভিত গড়ে উঠতে থাকে।



মেসোপটেমীয় সভ্যতার নিদর্শন

মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য

উর্বর ভূমি হওয়ার কারণে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির কাছে বসবাসের জন্য মেসোপটেমীয়া ছিল আকর্ষণীয় ভূ-খণ্ড। তাছাড়া ভোগোলিকভাবে অরক্ষিত হওয়ার কারণেও বিদেশীদের আগমন এবং আক্রমণ দুইই ছিল সহজ ব্যাপার। ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষ মেসোপটেমীয়ার উর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আবার দক্ষিণে অবস্থিত আরব মরাবুমি থেকে মরক বেদুইনরাও মেসোপটেমীয়া আক্রমণের চেষ্টা করেছে। মেসোপটেমীয়া মিশরের মতো কোনো একজন রাজার শাসনাধীনে ছিল না। মন্দিরের প্রাচুর্য ও অবস্থান দেখে ধারণা করা হয় যে, এই অঞ্চলের মানুষ মন্দিরের বেধে দেয়া নিয়ম ও শাসন মেনে চলতে বাধ্য থাকতো। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হতো মন্দিরের নির্দেশ মতো। এ কারণে দেখা যায় যে, মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনায় পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল প্রধান। মেসোপটেমীয়ায় আইনের শাসন যেমন ছিল কঠোর, শাস্তির বিধানও ছিল তেমন কঠিন।

| | |
|--|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) শিক্ষার্থীর কাজ | মেসোপটেমীয় সভ্যতা সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন লিখুন। |
|--|---|

ফ সারসংক্ষেপ

মেসোপটেমীয় সভ্যতার জন্য টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস দুই নদীর মধ্যবর্তী উর্বর সমতল অঞ্চলে। এই অঞ্চল আরো পাঁচটি সভ্যতার জন্মস্থান। যে সভ্যতাগুলো বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ফ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। বর্তমান কোন রাষ্ট্রের সীমানায় মেসোপটেমীয়া অঞ্চল অবস্থিত ছিল?

- | | |
|----------|-------------|
| (ক) মিশর | (খ) সিরিয়া |
| (গ) ইরাক | (ঘ) ইরান |

২। মেসোপটেমীয়া কোন ভাষার শব্দ?

- | | |
|-------------|------------|
| (ক) গ্রিক | (খ) চাইনিজ |
| (গ) সংস্কৃত | (ঘ) আরবি |

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

ক নামক দেশটি কোন একক রাজার শাসনাধীন ছিল না। বিদেশীরা প্রায়ই আক্রমণ করতো এবং দেশটিতে প্রবেশ করতো। উপরন্ত সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেধে দেওয়া নিয়ম মেনে চলতে সকলে বাধ্য ছিল।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত অবস্থায় কোন সভ্যতার চিত্র ফুটে উঠেছে?

- | | |
|-----------------|-------------|
| (ক) রোমান | (খ) গ্রিক |
| (গ) মেসোপটেমীয় | (ঘ) মিশরীয় |

৪। উক্ত সভ্যতায় কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেধে দেওয়া নিয়ম মানতে হতো?

- | | |
|------------|--------------|
| (ক) মন্দির | (খ) মসজিদ |
| (গ) গীর্জা | (ঘ) প্যাগোডা |

পাঠ-২.৩ | সিঙ্গু সভ্যতা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সিঙ্গু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল বলতে পারবেন;
- মানব সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গে সিঙ্গু সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।



হরপ্তা সংস্কৃতি, প্রাত্মতত্ত্ববিদ, আর্যজাতি, নগরদুর্গ, মাতৃতান্ত্রিক, মাতৃপূজা, পোড়ামাটি।

মুখ্য শব্দ (Key Words)



পটভূমি

সিঙ্গু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম সিঙ্গু সভ্যতা। সিঙ্গু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্তা সংস্কৃতি বা হরপ্তা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি প্রাত্মতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের সিঙ্গু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঝোদারোতে এবং দয়ারাম সাহানীর চেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টেগোমারী জেলার হরপ্তায় এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরো বহু নির্দশন আবিষ্কার করে। মহেঝোদারো ও হরপ্তা উভয় অঞ্চল একই সভ্যতার অঙ্গরূপ। সিঙ্গু সভ্যতা উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা।

ভৌগোলিক অবস্থান

উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম সিঙ্গু সভ্যতা হলেও এর বিস্তৃতি ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। মহেঝোদারো ও হরপ্তাতে এই সভ্যতার নির্দশন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই সভ্যতা শুধু সিঙ্গু নদীর অববাহিকা বা ঐ দুটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিঙ্গু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নির্দশন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সিঙ্গু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।



সিঙ্গু সভ্যতা

সময়কাল

সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতার উত্থান-পতনের কাল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, আর্য জাতির আক্রমণের ফলে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অথবা ১৪০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার অবসান ঘটে। তবে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। এই সভ্যতার সময়কাল মর্টিমার হইলারের মতে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত।

রাজনৈতিক ও সামজিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার জনগণের রাজনৈতিক জীবন ও শাসন প্রণালি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শহরের এক পাশে উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত নগর দুর্গগুলো দেখে মনে হয় নগরের শাসনকর্তারা নগর দুর্গে বসবাস করতো। চারদিক প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে প্রশাসনিক বাড়িগুলোর অবস্থাও দেখা যায়। হরপ্রা ও মহেঝেদারো দুই নগরের নগর পরিকল্পনা ছিল প্রায় এক। নগরের ছিল প্রবেশদ্বার। দুর্গ বা বিরাট অট্টালিকা দেখে মনে হয় একই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে নগর দুটিতে প্রচলিত ছিল। এই প্রশাসন জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত।

সিন্ধু সভ্যতার যুগে মানুষ সমাজবন্দ পরিবেশে বসবাস করত। সেখানে একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল। সব লোক সমান সুযোগ সুবিধা পেত না। সমাজ ধরি ও দরিদ্র দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কৃষকেরা গ্রামে বসবাস করত। শহরে ধরি এবং শ্রমিকদের জন্য আলাদা আলাদা বাসস্থানের নির্দেশন পাওয়া গেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তারা মূলত সুতা ও পশম ব্যবহার করত। সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতাত্ত্বিক। মহিলারা খুবই সৌখিন ছিল। তাদের প্রিয় অলংকারের মধ্যে ছিল হার, বালা, আংটি, দুল, বিছা, বাজুবন্দ, চুড়ি, পায়ের মল ইত্যাদি। তারা নকশা করা দীর্ঘ পোশাক পরত। সমাজে পুরুষরাও অলংকার ব্যবহার করত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। তাছাড়া অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন ও বাণিজ্য। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলংকার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্প পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সিন্ধু সভ্যতার বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। বণিকদের সাথে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতায় কোনো মন্দির বা মঠের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়নি। তবে, তাদের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মন্দির, উপাসনা গৃহের অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন স্থানে পোড়ামাটির অসংখ্য নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়, তারা এ ধরনের দেবীমূর্তির পূজা করত। সিন্ধুবাসীদের মধ্যে মাতৃপূজা খুব জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা দেব-দেবী মনে করে বৃক্ষ, পাথর, সাপ এবং পশুপাখির উপাসনাও করত। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত। যে কারণে মৃতের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলংকার তার করবে রেখে দিত।

নগর পরিকল্পনা

সভ্যতার ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা একটি পরিকল্পিত নগরীর ধারণা দিয়েছে। হরপ্রা ও মহেঝেদারো নগর দুটো প্রায় একই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতায় অবস্থিত এই বড় নগর দুটো ছাড়াও অন্যান্য সব শহরের ঘরবাড়ি সবই পোড়া মাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িগুলোর নকশা থেকে সহজে বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যন্ত ছিল। নগরিয়ের ভিতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কৃপ ও স্নানাগার ছিল। পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলো মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবন্দ ল্যাম্পপোস্ট। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য শহরগুলোতে মোতায়েন থাকত। এক বাক্যে বলা যায়, সিন্ধু সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার মতো উন্নত ছিল।

পরিমাপ পদ্ধতি

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির উভাবক ছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত। দাগ কাটা ক্ষেত্র দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল।

শিল্প

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মৃৎশিল্পের কথা বলতে হয়। তারা কুমারের চাকার ব্যবহার জানত এবং তার সাহায্যে সুন্দর মাটির পাত্র বানাতে পারত। পাত্রগুলোর গায়ে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা থাকত। তাঁরা বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল। ধাতুর সাহায্যে আসবাবপত্র, অস্ত্র এবং অলংকার তৈরি করা হতো। তারা তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল। কারিগররা রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির তৈজসপত্র তৈরি করত। তাছাড়া সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর অলংকার তৈরিতে তারা পারদর্শী ছিল। অলংকারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্দ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা লোহার ব্যবহার জানত না। ধাতু ছাড়া দামি পাথরের সাহায্যে অলংকার নির্মাণ শিল্পেরও বিকাশ ঘটে এবং হাতির দাঁতসহ অন্যান্য হস্তশিল্পেরও দক্ষ কারিগর ছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নির্দর্শন রেখে গেছে। সেখানে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ

কক্ষের বাড়ির সন্ধানও পাওয়া গেছে। আবার কোথাও দুই তিন তলার ঘরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঝেদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ‘বৃহৎ মিলনায়তন’ যে মিলনায়তনটির ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিরাট এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

হরপ্রাতে বিরাট আকারের শস্যাগারও পাওয়া গেছে।

মহেঝেদারোতে একটি ‘বৃহৎ স্নানাগার’-এর নির্দর্শন পাওয়া গেছে, যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চাটি ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী।



বৃহৎ স্নানাগার

ভাস্কর্য শিল্পেও সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের দক্ষতা ছিল। পাথরে খোদিত ভাস্কর্যের সংখ্যা কম হলেও সেগুলোর শৈলিক কারিগরি দক্ষতা ছিল উল্লেখ করার মতো। এ যুগে মোট ১৩টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। চুনাপাথরের তৈরি একটি মূর্তির মাথা পাওয়া গেছে। মহেঝেদারোতে পাওয়া গেছে নৃত্যরত একটি নারী মূর্তি। এছাড়া মাটির তৈরি ছেট ছেট মানুষ আর পশুমূর্তি পাওয়া গেছে। হরপ্রাত মহেঝেদারোতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫০০ সিল। ধর্মীয় ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হতো। তবে সিলগুলোর লেখা এখনও পড়ে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা লেখা পড়া জানতো।



সীল মোহুর

| | |
|---|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) <i>/শিক্ষার্থীর কাজ</i> | <ol style="list-style-type: none"> ১. ভারত পাকিস্তানের যেসব অঞ্চলে সিদ্ধু সভ্যতার নির্দর্শন পাওয়া গেছে, তার দেশ ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করুন। ২. সিদ্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের কোন কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল? |
|---|--|

 সারসংক্ষেপ

সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিন্ধু সভ্যতার মূল অঞ্চল পাঞ্জাবের হরপ্লা এবং সিন্ধুর মহেঝেদারো হলেও এর নির্দশন পাওয়া গেছে পাকিস্তান ভারতের আরো কিছু কিছু অঞ্চলে। সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতি মূলত কৃষি নির্ভর হলেও, এরা আধুনিক কালের মতো উন্নততর নগর সভ্যতা গড়ে তৃণেছিল। তবে এরা লোহার ব্যবহার জানত না।

পাঠ্যনির্দেশনা-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

সুজনশীল প্রশ্ন

- ১। বাসাইল গ্রামের জোতদার লেবু মিয়া তার বাড়ির আঙিনায় গোসলের জন্য কুয়া খনন করে চারদিকটা ইট দিয়ে পাকা করে দেন। একই সাথে ধান মাপার জন্য বিশেষ ধরনের ওজন মাপার পাথর তৈরি করে দিয়েছিলেন। এতে ফসলের ওজন করা হয়েছিল সহজ, অপরদিকে আধুনিক জীবনের সম্মানও তিনি দিয়েছিলেন।

ক. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম কী?

খ. সিন্ধু সভ্যতাকে নগর সভ্যতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে লেবু মিয়ার তৈরি ব্যবস্থা পাঠ্য বইয়ের কোন সভ্যতার তৈরি ব্যবস্থার সাথে মিল দেখা যায়? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. ‘উক্ত সভ্যতার অধিবাসীরা পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক’ যাতে আধুনিকতার স্পর্শ রয়েছে – আপনি কী একমত?

মতামত দিন।

পাঠ-২.৪ চিন সভ্যতা



এই পাঠ শেষে আপনি

- চিন সভ্যতার পরিচয় ও অবস্থানের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- চিনের আদি মানুষ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শাং রাজাদের যুগের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সভ্যতায় চৌ-যুগের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।



প্রাগেতিহাসিক, পিকিং মানুষ, নবোপলীয়যুগ, আইডিও ছাফ, লোহযুগ, এ্যানিমেল ম্যান, মহাথাচীর,

মুখ্য শব্দ (Key Words)



চিন সভ্যতার পরিচয় ও অবস্থান

চিনের প্রাচীন সভ্যতা একমাত্র সভ্যতা যা কোনো সময় পুরোপুরি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে আজ পর্যন্ত চিন তার সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এককথায় চিন সভ্যতা পৃথিবীতে বিরাজমান সবচেয়ে পুরাতন সভ্যতা। ভৌগোলিক কারণে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকায় এ অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নিজস্ব নিয়মে, ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে। চিন পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র। দেশটির তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। একটি হোয়াং হো নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াং জেকিয়াং নদীর তীরে, তৃতীয়টি দক্ষিণ চিনের ভূখণ্ডে। এই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল- শাং ও চৌ রাজাদের আমলে।

দেশটির সীমান্ত জুড়ে বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকার কারণে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ ছিল না। চীনের উভর দিকে গোবি মরুভূমি, পূর্ব ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে রয়েছে তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল। নদীগুলোর প্রভাবে প্রাচীন চিনে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যে কারণে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা সহজ ছিল। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে চিনের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

চিনের আদি মানুষ

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চিনে প্রাগেতিহাসিক যুগের মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে। চিনের রাজধানী পিকিং-এর (বর্তমান বেইজিং) কাছে এই খুলি পাওয়া যায়। এরাই চিনের আদিম মানুষ; যাদেরকে ‘পিকিং মানুষ’ বলা হয়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে নবোপলীয় যুগ বা নতুন পাথরের যুগে চীনে মানুষের বসবাস ছিল। চিনের আদিবাসিরা হোয়াং-হো ও ইয়াংসি নদীর দুই পাড়েই বাস করত। পরে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এদের এক অংশ চাষাবাদ করতো, অপর অংশটি যায়াবর জীবনে অভ্যন্ত ছিল। যে অংশটি নদীর তীরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করে ধীরে ধীরে সভ্য জাতিতে পরিণত হতে থাকে। এরা কৃষিকাজের পাশাপাশি পশু পালনও করতো। এরাই প্রাচীন চীন চীন সভ্যতার সৃষ্টি। এই সভ্যতার সৃষ্টাদের বেশমের কাপড়, চাকাযুক্ত গাঢ়ি, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, তামা ও ব্রাঞ্জের অন্তর্শ্রেণী তৈরি করার বিদ্যা জানা ছিল। তারা কৃষি কাজের জন্য লাঙ্গল ব্যবহার করত। কৃষি জমিতে পানি সেচের জন্য তারা খাল কেটে নদী থেকে জমিতে পানি সরবরাহ করত। চীনের আদি মানুষরা নগর নির্মাণ করে উঁচু দেয়াল দিয়ে তাকে সুরক্ষিত রাখত, যাতে যায়াবরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরা এক ধরণের দিনপঞ্জি বা ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছিল।

শাং রাজাদের যুগ (১৭৬৬-১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

ধারণা করা হয় প্রায় চার হাজার বছর আগে চিনে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। হুয়াংতি নামের একজন শক্তিশালী শাসক হোয়াংহো নদীর তীরে এক বড় রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এই হোয়াংহো নদী তীরেই শাং রাজারা যে সভ্যতা গড়ে তোলেন, তা অগ্রগতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। বেশ কয়েকটি রাজবংশ চিনের সভ্যতা গড়ে তুলে ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে

পুরোনো ছিল শাং বংশ। শাং রাজাদের যুগে ব্রাহ্মের জিনিস পত্রের বেশি ব্যবহার হতো বলে এ যুগের সংস্কৃতি ব্রাহ্ম সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

সভ্যতায় শাংযুগের অবদান

শাংযুগের মানুষের মানব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাসস্থান

শাংযুগে অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। ফসলের মধ্যে গম, ঘবই বেশি চাষ হতো। কিছু কিছু জমিতে ধানেরও চাষ হতো। এ যুগের মানুষের মধ্যে পশু পালনের ব্যাপক প্রচলন ছিল। গ্রামের মানুষরা মাটির ঘরে বাস করত। প্রত্যেক পরিবারের ঘরের ছাদকে নলখাগড়ার ওপর কাদার আবরণ দিয়ে ছাওয়া হতো। সে সময়ে বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করত। শহরের ঘরবাড়ি ছিল চমৎকার। ঘরগুলো হতো আয়তকার। ঘরের ছাদগুলো ছিল ত্রিকোণ আকৃতির। শাং সমাজে কারিগর বা শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। সাধারণ জনগণ অর্থাৎ ভূমিদাস এবং দাসেরা সমাজের সব অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করত। এদের বেশিরভাগ ছিল কৃষক। কৃষি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এরা গুটিপোকার চাষ করত। এই গুটি পোকা থেকে সূতা বের করে মসৃণ কাপড় বোনা হতো। পরবর্তিকালের সমাটদের সময়ে এই মসৃণ সিঙ্ক চিনের একটি প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়।

স্কুলশিল্প

বিভিন্ন সুন্দর জিনিস তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। শাং যুগের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ব্রাহ্মের তৈরি পাত্র, ছুরি, কুঠার ইত্যাদি। শাং যুগের কারিগররা হাড়, বিনুক, শিং এসব দিয়েও সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করতে পারতো। তারা হাতির দাঁত দিয়ে বিলাসী দ্রব্য তৈরিতে দক্ষ ছিল। শাং যুগের নানা ধরনের মাটির পাত্র, চীনের বিখ্যাত চিনামাটির পাত্রের নির্দশনও পাওয়া গেছে। তাছাড়া তৌর, ধনুক, চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি, যোদ্ধাদের জন্য তৈরি চামড়ার বর্ম, অস্ত্র-শস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, মুখোশ প্রভৃতি তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

লিখন পদ্ধতি

চিনে ভিন্ন ধরনের একটি লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই লিখন পদ্ধতিকে বলা হয় আইডিও গ্রাফ। এ লেখা গুলো দেখতে অনেকটা চিত্র লিপির মতো ছিল। লেখার জন্য তৈরি হয় কালি আর তুলি। শাং লিপিকাররা রেশমি কাপড়ের উপর লিখতেন। এ লেখার পদ্ধতি উদ্ভবের পেছনে কারণ ছিল রাজার আদেশ ও পুরোহিতের বাণী প্রচার।

ধর্মীয় ক্ষেত্র

রাজকার্য ছাড়াও ধর্মীয় বিষয়ে শাংরাজাদের ভূমিকা ছিল প্রধান। রাজার নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। শাং যুগের প্রধান দেবতার নাম ছিল শাংতি। মৃত রাজাকেও কখনও কখনও পূজা করা হতো। তাই রাজার সমাধিসৌধ বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হতো। শাং যুগের মানুষ মাটি, বাতাস, নদী, বিভিন্ন দিক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ) এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মনে করতো।

চৌ রাজাদের যুগ (১০২৭-২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

শাং রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে চৌ রাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে চৌ রাজারা ছিলেন শাংদের অধীনস্থ মিত্র। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব এগারো শতকে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চৌরা শাং রাজবংশকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে।

সভ্যতায় চৌযুগের অবদান

চৌ রাজারা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ক্ষমতা দখল করে প্রায় ৮০০ বছর গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করে। সে সময়ের মধ্যে তারা চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সাফল্যের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানব সভ্যতায় তাদের অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক

গেশার দিক থেকে প্রথম থেকেই চৌ বংশের লোকেরা ছিল কৃষক। তাদের শাসন কালেও তাদের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। তারা খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। চৌ-রা কৃষি কাজে পশু ব্যবহার করত। চৌ শাসন আমলে চীনের সভ্যতা নতুন পাথরে যুগ থেকে লৌহ যুগে প্রবেশ করে। তারা লোহার ব্যবহার শেখে। লোহার ফলায়ুক্ত লাঙল ব্যবহারের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। এ কারণে সে সময় প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো।

চৌ-জাতিরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। এরা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বড় বড় শহর গড়ে তোলে। শহরের বাসিন্দাদের জন্য খাদ্য এবং মালপত্র বহনের লক্ষ্যে যে সমস্ত রাস্তা নির্মাণ ও খাল খনন করা হয় তা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে। এসময় চীনা বণিকদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ হয়। বণিকরা গাধা, উটের সাহায্যে মালামাল পরিবহণ করতো। শস্য, লবণ, রেশম ইত্যাদি দ্রব্য দেশের বাইরে রপ্তানি করা হতো। তাছাড়া ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য আরো সম্প্রসারিত হয়।

সামাজিক কাঠামো

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো চৈনিক সভ্যতায়ও সামাজিক বৈষম্য ছিল। সমাজে অনেক দাস ছিল। তাদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। সরকারিভাবে গবাদি পশু আর দাসদের একই তালিকায় রাখা হতো। চীনা পরিভাষায় এদের ‘এ্যানিমেল ম্যান’ বলা হতো।

সাধারণ কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থান ছিল সমাজে সবচেয়ে নিচু স্তরে। ভূষামী ও কৃষকদের মধ্যে ব্যবধান ছিল আকাশ-পাতাল। সমাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে। পিতৃতাত্ত্বিক পরিবার থাকায় মেয়েদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান

চৌ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। এযুগের লেখা অনেক এন্থ পাওয়া গেছে। চৌ আমলে হাতের লেখার প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং এ সময় নথিপত্র সংরক্ষণের কাজ ব্যাপকভাবে লাভ করে। চৌ যুগের শেষ দিকে ইতিহাস, সংগীত, আচার-অনুষ্ঠান, তোরণ নির্মাণ, কবিতা সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বহু বই পুস্তক লেখা হয়।

ধর্ম

চৌ যুগের লোকেরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করতো। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল তিয়েন। মাটিকে ঘনে করা হতো কৃষির দেবতা। চৌ যুগেও পূর্ব পুরুষের পূজার প্রচলন ছিল। এ যুগেই চিনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।

চিনের প্রাচীর

চিনের মহা প্রাচীর নির্মিত হয় চৌ-রাজ বংশের আমলে। রাজা শিহ়য়ং তি এই প্রাচীর তৈরি করেন। ভূনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল এখন তা বিশ্বের আশ্চর্য বস্তর একটি। দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ এই প্রাচীরের উচ্চতা গড়ে ২৪ ফুট। এই প্রাচীরের উপর দিয়ে ৬ জন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলতে পারতো।



চিনের মহাপ্রাচীর

দর্শনের ক্ষেত্রে অবদান

দর্শন বিদ্যায় চিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। চৌ-রাজাদের আমলে একটি শিক্ষিত নতুন সামাজিক শ্রেণির উত্তর ঘটে। দার্শনিকরা ছিল এই শ্রেণিভুক্ত। চিনের প্রাচীন দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে (খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪-৫১৭) তার চিন্তা চিনা জীবন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে এবং অব্যাহতভাবে প্রভাবিত করে রেখে ছিল। তিনি বিশ্বসভ্যতায় এক অবিস্মরণীয় মানবতাবাদী দর্শন উপহার দেন। কনফুসিয়াসের সময় চিনের সমাজ জীবন খুব উচ্ছ্বেল হয়ে পড়ে। তিনি চিনের যুবকদের শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দর্শনের একটির স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কনফুসিয়াসের দর্শন খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অন্দে চিনে ধর্মে পরিণত হয়। কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশেও তার দার্শনিক চিন্তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। চিনের অন্যান্য খ্যাতনামা দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন জেনসিয়াস ও মোতি।



কনফুসিয়াস

| | |
|---|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) <i>/শিক্ষার্থীর কাজ</i> | ১. ‘পিকিং মানুষ’ কী? কী করে এরা সভ্যতাতে পরিণত হয়? লিখে দেখান। ২. কী কী বিষয় চীনা সভ্যতাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে? একটি রচনা লিখুন। |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

চিন সভ্যতা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শাং এবং চৌদের আমলে চিনের সমাজ-অর্থনীতি-সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে লাঙ্গলে লোহার ফলা ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং বাণিজ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। প্রকৃতি পূজা থেকে তারা ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হয়। কনফুসিয়াসের দর্শন ধর্মীয় মতবাদে পরিণত হয়। ঐ সময় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। চিন সিঙ্ক, চিন মাটির পাত্র, চিনের মহাপ্রাচীর সব কিছু চিনা সভ্যতাকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। কোন সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই?
 - ক) ত্রিক
 - খ) মিশরীয়
 - গ) সিঙ্ক
 - ঘ) চিন
- ২। চিনে প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো-
 - ক) জমিতে সার প্রয়োগ করে
 - খ) ট্রাঙ্কের ব্যবহার করে
 - গ) লোহার ফলায়ুক্ত লাঞ্জল ব্যবহার করে
 - ঘ) বাধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে
- ৩। চিনে সিঙ্ক কেন রঞ্জানিয়োগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়?
 - i) গুটি পোকার সূতা থেকে মসৃণ কাপড় তৈরির কারণে
 - ii) রেশমী সূতা তৈরির মাধ্যমে
 - iii) উন্নত ডিজাইন ব্যবহার করে।
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i
 - খ) ii
 - গ) i ও ii
 - ঘ) i ও iii
- ৪। চিনা যুবকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কনফুসিয়াস কী প্রতিষ্ঠা করেন?
 - ক) ব্যায়ামাগার
 - খ) অন্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
 - গ) দর্শনের বিদ্যালয়
 - ঘ) বিজ্ঞান গবেষণাগার
- ৫। “এ্যানিমেল ম্যান” কাদের বলা হতো?
 - ক) কৃষকদের
 - খ) দাসদের
 - গ) বণিকদের
 - ঘ) তাঁতীদের

পাঠ-২.৫ গ্রিক সভ্যতা



এই পাঠ শেষে আপনি

- গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সভ্যতায় গ্রিসের অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

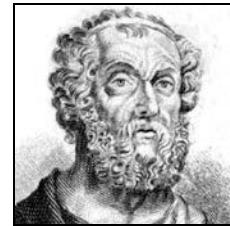


মুখ্য শব্দ (Key Words)

মহাকাব্য, হেলাস, হেলেনীয় সংস্কৃতি, নগররাষ্ট্র, দাস, সফিস্ট, পৃথিবীর মানচিত্র, বাদ্যযন্ত্র, অলিম্পিক ড্রিড়া



পটভূমি: গ্রিসের মহাকবি হোমারের ‘ইলিয়ড’ ও ‘ওডিসি’ মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত চমকপদ কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের। উনিশ শতকের শেষে হোমারের কাহিনী আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বেরিয়ে আসে এর ভিতরের সত্য ইতিহাস। ইজিয়ান সাগরের দ্঵ীপপুঁজে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কৃত হয় এক উল্লততর প্রাচীন নগর সভ্যতা। সন্ধান মেলে মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশত নগরীর ধ্বংস স্তরের। ইউরোপ মহাদেশের এই অঞ্চলেই প্রথম সভ্যতার উন্মেশ ঘটেছিল।



মহাকবি হোমার

ভৌগোলিক অবস্থা ও সময়কাল

গ্রিস দেশটি আভ্রিয়াটিক সাগর, ভূ-মধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইউরোপের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বলকান উপস্থিতি। এর দক্ষিণাংশে একটি ছোট পাহাড়ি দেশ গ্রিস। গ্রিস মূলত একটি পর্বতময় দ্বীপ রাষ্ট্র। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক সভ্যতার সূচনা হয় যার পূর্ণ বিকাশ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতকে। গ্রিকরা ৩৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সভ্যতায় গ্রিসের অবদান

গ্রিসের পূর্ব নাম ছিল হেলাস। রোমানরা পরবর্তিকালে এর নামকরণ করে গ্রিস। গ্রিক সংস্কৃতি হেলেনীয় সংস্কৃতি নামে বেশি পরিচিত। অসংখ্য নগররাষ্ট্র নিয়ে গড়ে উঠা প্রাচীন গ্রিসে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা এবং গণতন্ত্র চর্চার মূল কেন্দ্র ছিল এথেন্স। নিম্নে প্রাচীন সভ্যতায় গ্রিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

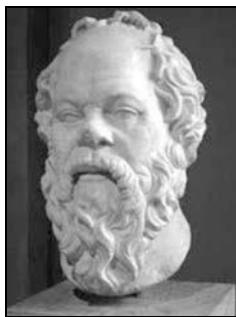
শিক্ষা: শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া। স্বাধীন গ্রিসবাসির ছেলেরা সাত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া আসা করত। ধনি ব্যক্তিদের ছেলেদের ১৮ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো। কারিগর আর কৃষকের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত। মেয়েরা কোনো প্রতিষ্ঠানে যেয়ে লেখাপড়া করতে পারত না। দাসদের সন্তানের জন্যও বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। শিক্ষা সম্পর্কে গ্রিক জ্ঞানী-গুণিরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তাদের কারো কারো মতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। আবার কেউ কেউ মনে করতেন- সুশিক্ষিত নাগরিকের হাতেই শাসনভার দেওয়া উচিত এবং সরকারের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সাহিত্য: সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানব সমাজের মূল্যবান সম্পদ। হোমারের মহাকাব্য ‘ইলিয়ড’ এবং ‘ওডিসি’ মহাকাব্যের অপূর্ব নির্দর্শন। সাহিত্য ক্ষেত্রে গ্রিক প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। বিয়োগান্তক নাটক রচনায় গ্রিকরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। ‘এসকাইলাস’কে এই ধরনের নাটকের জনক বলা হয়। তার রচিত বিখ্যাত দুটি নাটকের নাম ‘প্রমিথিউস বাউড’ ও ‘আগামেনন’। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তার বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রাজা ‘অয়দিপাউস’, ‘আন্তিগোনে’ ও ‘ইলেকট্রা’ অন্যতম। আর এক বিখ্যাত নাট্যকারের নাম ইউরিপিদিস। এরিস্টোফেনেসের মিলনান্তক ও ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইতিহাস রচনায়ও গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ইতিহাস রচনা শুরু করে গ্রিকরা। হেরোডোটাস প্রথম ইতিহাস রচনা শুরু করেন বলে তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত ইতিহাস সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যকার যুদ্ধ নিয়ে। খুরিডাইডিস ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক। তাঁর বইটির শিরোনাম ছিল ‘দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়ার’।

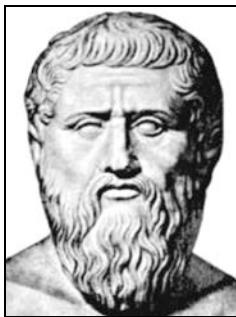
ধর্ম: গ্রিকদের বারটি দেব-দেবী ছিল। এছাড়াও তারা বিভিন্ন প্রাক্তিক শক্তি ও বীর যোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিলেন দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা। এখনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বার

জনের মধ্যে এই চার জন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।

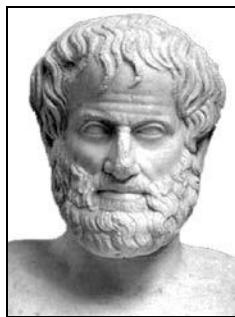
দর্শন: দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটে এসব ভাবতে গ্রিসে দর্শন চর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্য গ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসের যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের বলা হতো সফিস্ট। এরা বিশ্বাস করতেন যে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র এথেনের রাজা পেরিকলিস এদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ চিন্তার দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল- আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।



সক্রেটিস



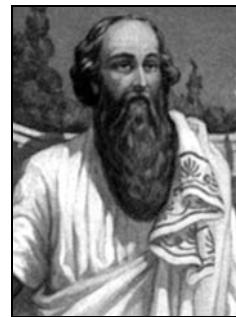
প্লেটো



এরিস্টটল



ইউক্লিড



পিথাগোরাস

বিজ্ঞান: গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞান চর্চা শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অংকন করেন গ্রিক বিজ্ঞানিরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, বজ্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ত্রোধের কারণে নয় প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যামিতি বিষয়ে পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: গ্রিক শিল্পের বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গ্রিক চিত্র শিল্পের নির্দশন মৃৎপাত্রে আঁকা চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। স্থাপত্যের সুন্দর সুন্দর নির্দশন গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত। এসব প্রাসাদের স্তম্ভগুলো অপূর্ব কারুকার্যখচিত থাকত। পার্থেনন মন্দির, দেবী এথেনার মন্দির গ্রিক স্থাপত্য কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন। এথেনের অ্যাক্রোপলিসে স্থাপত্যের সুন্দর নির্দশনের ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে। সে যুগের প্রখ্যাত ভাস্কর শিল্পী ছিলেন মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস। এদের মধ্যে খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন ফিদিয়াস। তিনি তার অপূর্ব দক্ষতায় গড়ে তুলে ছিলেন ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দেবী এথেনার মূর্তি।

সঙ্গীত চর্চায়ও গ্রিকদের উৎসাহ ও দক্ষতার অভাব ছিল না। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে গান গাওয়ার জন্য সঙ্গীত চর্চা করতে যেয়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

খেলাধূলা: গ্রিসে শিশুদের খেলাধূলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো। বিদ্যালয়গুলো ছিল তাদের খেলাধূলা শুরুর স্থান। গ্রিকদের শরীরচর্চার প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। উৎসবের দিনে গ্রিসে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশ নিতো। এতে দৌড়বাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকা নিষ্কেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত। বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডাল-পাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে অলিম্পিক খেলা শুরু হয়। প্রতি চার বছর পর পর এ খেলায় বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিতো। পরম্পরার সঙ্গে যুদ্ধরত নগর রাষ্ট্রগুলোতে তখন শান্তি বিরাজ করত। এই খেলাকে ঘিরে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শক্তির বদলে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠে।



অলিম্পিক খেলা

| | |
|--|--|
|  <p>অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) শিক্ষার্থীর কাজ</p> | <p>১. গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত মণীষীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন।</p> <p>২. যে দুটি মহাকাশের কাহিনীর কারণে গ্রিক সভ্যতার সন্ধান সে কাব্য দুটি এবং এর লেখকের নাম কি?</p> |
|--|--|

 সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক কারণে প্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। রাজনৈতিক অনেক থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। এই হেলেনীয় সংস্কৃতির দাবীদাররা শুধু ইউরোপে নয়, সারা বিশ্বের দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সঙ্গীত, খেলাধূলা চর্চায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে।

পাঠ্যনির্দেশনা-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন কারা?
 ক) মিশনারীয় বিজ্ঞানীরা খ) ছিক বিজ্ঞানীরা গ) সিঙ্ক্লুসভ্যতার ব্যবসায়ীরা ঘ) রোমান ভূগোলবিদরা

২। এখেনের জনগণ—
 i) সামরিক কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত ছিল
 ii) গণতান্ত্রিক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত ছিল
 iii) রাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- କ) i ଖ) ii ଗ) i ଓ ii ସ) i ଓ iii

- ৩। হোমারের মহাকাব্য হিসেবে সমর্থনযোগ্য (প্রয়োগমূলক)
i) দ্যা পেলোপনেসিয়ান ওয়ার ii) ইলিয়ড iii) ওডিসি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্বীপকটি পড়ন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

জমিদার আরমান শাহুর জমিদারিতে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের সন্তানদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো এবং কারিগর ও কৃষকদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু দাস দাসীর সন্তানদের এবং সমাজের মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারতো না।

- ৪। উদ্দীপকে শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা কোন সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
 ক) গ্রিক খ) মিশরীয় গ) ফিনিসীয় ঘ) সিঙ্গু

৫। উক্ত সভ্যতায় কার হাতে শাসনভাব অর্পণ করা আধিক যুক্তিভুক্ত?
 ক) ধর্মীয় গুরু/পুরোহিতের নিকট খ) দার্শনিকের হাতে
 গ) সুশিক্ষিত নাগরিকের কাছে ঘ) গণিতশাস্ত্রবিদের কাছে

উত্তরমালা

পাঠ্টোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ০ ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଲ୍ଯାନ୍ - ୧୯୦୧ ଗ୍ରେ କ୍ଲ୍ଯୁକ୍ସିନ୍ ଏସ୍.୫

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଳ୍ଯାଣନ- ୧.୩ ୦୦ ୧. କ ୧. ଗ ୧.୫ ୧.୫

ପାଠୋତ୍ତର ମଲ୍ୟାଙ୍କନ- ୧.୪ : ୧.ସ ୧.ଗ ୩.ଗ ୪.ଗ ୫.ଖ

পাঠ্যক্রম মন্তব্যন- ১৫০১ ক ২৬ ৩৬ ৪৬ ৫৬

ইউনিট ৩

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তবে আজকের বাংলাদেশ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার একটি বড় অংশ মাত্র। বিশ্ব মানচিত্রে দেশটির অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার (বার্মা)। বাকি তিন দিকের সীমানা ঘিরে আছে ভারত। অবিভক্ত বঙ্গদেশ একটি বদ্ধীপ। আমরা সমগ্র বদ্ধীপকে প্রধানত দুভাগে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমত, মৃতপ্রায় বা প্রাচীন বদ্ধীপ যার অধিকাংশ পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। দ্বিতীয়ত, সক্রিয় বদ্ধীপ যার প্রায় সবটাই পড়েছে পূর্ববঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে। বাংলাদেশে বদ্ধীপ গঠন প্রক্রিয়া এখনও চলমান। নদীই বাংলার ইতিহাস ও সভ্যতার জন্মদাতা। বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছেট-বড় অনেক নদ-নদী ও খাল-বিল। বাংলাদেশের প্রায় সব জনপদই সমতল। কিছু কিছু পাহাড়ি বনাঞ্চলও রয়েছে। চির সবুজে ঘোরা শস্য-শ্যামলা নাতিশীতোষ্ণ দেশটি মানুষের বসবাসের জন্যে এক চমৎকার আবাসভূমি। সামগ্রিক ভৌগোলিক প্রভাবের কারণে এদেশবাসী সাধারণত ভাবুক, শান্ত-কোমল, উদার এবং স্বাধীনচেতা। এই ইউনিটে আমরা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও জনজীবনে এর প্রভাব বিষয়ে জানব।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ
পাঠ-৩.১ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি
পাঠ-৩.২ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও এর প্রভাব



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৩.১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের অবস্থান বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নদ-নদীর বিবরণ দিতে পারবেন।

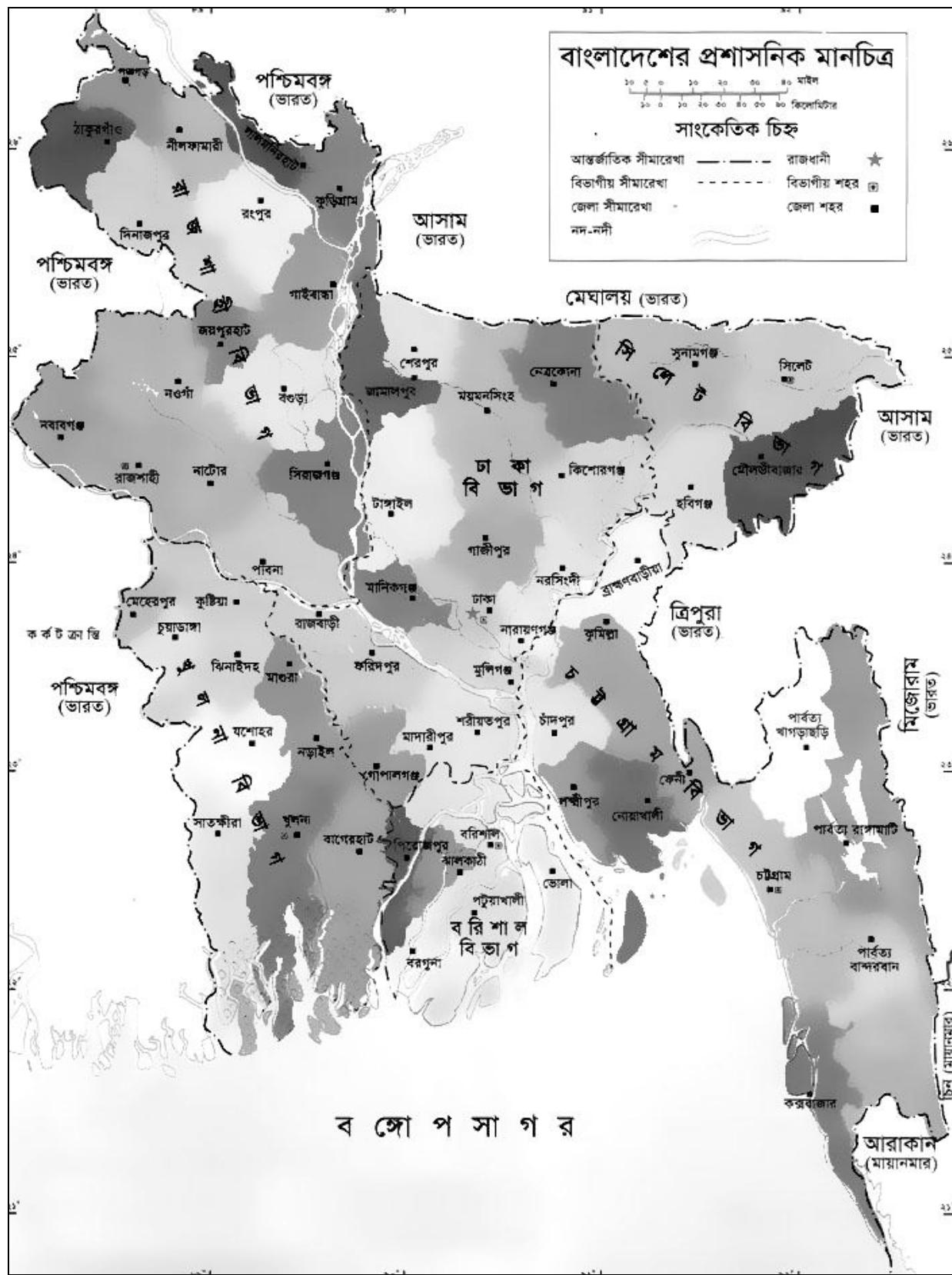


সীমারেখা, স্বাধীন সার্বভৌম, সবুজের আন্তরণ, ম্যানগ্রোভ, সমতট, ঐক্যসূত্র।

মুখ্য শব্দ (Key Words)

বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি

বিশ্ব মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অবস্থান। আজকের যে বাংলাদেশ তার দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে মায়ানমার (বার্মা)। বাকি তিন দিকের সীমানা ঘিরে রেখেছে ভারত।



উত্তর সীমানা

বাংলাদেশের উত্তর সীমার অদূরে রয়েছে হিমালয় পর্বত। উত্তর সীমায় আরো রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরণ্যাচল ও আসাম রাজ্য।

পূর্ব সীমানা

বাংলাদেশের পূর্ব সীমায় রয়েছে ছেট-বড় অনেক পাহাড়। যেমন আসাম ও গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান পর্বতশ্রেণি। পূর্ব-দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বত শ্রেণি বাংলাদেশকে লুসাই জেলা ও মায়ানমার (বার্মা) থেকে পৃথক করেছে।

পশ্চিম সীমানা

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানায় রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও রাজমহলের পাহাড়ি এলাকা। এছাড়াও পশ্চিমের সীমারেখায় সাঁওতাল পরগনা, ঝাড়খণ্ড ও ময়ূরভঙ্গের অরণ্যময় মালভূমি রয়েছে।

দক্ষিণ

বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তার কুল বরাবর সমতট ভূমিতে গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা সবুজের আন্তরণ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে বাংলাদেশের ফুসফুস হিসেবে পরিচিত সুন্দরবন। সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রীষ্ম-অঞ্চলীয় (ম্যানগোভ) বনভূমি।

পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রধানত বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে অনেকবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। কিন্তু, একটি ভৌগোলিক ঐক্যস্ত্র রয়েছে।

নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পরিশেষে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭, ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের প্রধান নদনদী

নদী মাতৃক বাংলাদেশে জালের মতো জড়িয়ে আছে অনেক নদ-নদী। বাংলাদেশে বড় বড় নদ-নদীর উৎস দেশের বাইরে। নিচু অঞ্চল বলে বাংলাদেশের বুক চিরে নদীগুলো বয়ে চলে ক্রমে সাগরে গিয়ে মিশেছে। এখানে বাংলাদেশের প্রধান নদনদী সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হল।

পদ্মা: পদ্মা হচ্ছে গঙ্গা নদীর প্রধান শাখা। গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণবাহি প্রবাহকে বলা হয় পদ্মা। প্রাচীনকালে পদ্মা এত বড় নদী ছিল না, দেখতে খালের মতোই ছিল। তবে পদ্মা দশম শতকেরও প্রাচীন। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) গোয়ালন্দের কাছে এসে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত প্রবাহ চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্দীপের কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। পদ্মার একটি প্রাচীনতম পথ রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া হয়ে চলন বিলের ভেতর দিয়ে ধলেশ্বরীর খাত দিয়ে ঢাকাকে পাশে রেখে মেঘনা খাড়িতে গিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়। তাই ঢাকার পাশের এই নদীটির নাম বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গাই প্রাচীন গঙ্গা-পদ্মার খাত। মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ এখন পদ্মার প্রধান শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্র: বাংলাদেশের প্রধান নদ হলো ব্রহ্মপুত্র। প্রাচীন কালে এর নাম ছিল লৌহিত্য। হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়ে, শেরপুর ও জামালপুরের ভেতর দিয়ে, মধুপুর গড়ের পাশ দিয়ে ময়মনসিংহ জেলাকে দুভাগে ভাগ করে ঢাকা জেলার সোনারগাঁ পর্যন্ত প্রবাহিত। ঢাকা জেলার উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী হলো শীতলক্ষ্মা। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিক দিয়ে ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে শীতলক্ষ্মা বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জের কাছে এসে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আজ এর ধারা ক্ষীণ হলেও উনিশ শতকের গোড়াতেও লক্ষ্মা বেগবতী নদী ছিল।

যমুনা: বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান নদী যমুনা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবল হয়ে ওঠে। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বয়ে এনে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার প্রবাহে ঢেলে দিচ্ছে।

মেঘনা: মেঘনা বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ নদী। মেঘনার উত্তর খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ে। উত্তর প্রবাহে মেঘনার প্রাচীন নাম সুরমা। সুরমা সিলেট জেলার ভেতর দিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্বসীমা স্পর্শ করে সিলেট বিভাগের হিবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ বন্দর ও অদূরবর্তী বানিয়াচঙ্গ গ্রাম বাঁ-তীরে রেখে ভৈরববাজারে এসে ব্ৰহ্মপুত্ৰের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। ভৈরব বাজার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰের যে ধারা তার নাম মেঘনা।

করতোয়া: উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন নদী করতোয়া। করতোয়া প্রাচীনকালে একটি বড় নদী ছিল। ভূটানের উত্তরে হিমালয়ে করতোয়ার জন্ম। এরপর দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে নদীটি তিঙ্গা নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর তিঙ্গার তিনটি স্রোত তিনিকে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব থেকে দক্ষিণে বয়ে যাওয়া স্রোতের নাম করতোয়া। মধ্যবর্তী স্রোতের নাম আত্রাই এবং দক্ষিণ-পশ্চিম স্রোতের নাম পুনর্ভবা নদী।

| | |
|---|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) <i>/শিক্ষার্থীর কাজ</i> | ১. শিক্ষার্থী বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে তার সীমানা পাওয়ার পয়েন্টে দেখাবে। ২. বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীর মানচিত্র এঁকে গতিপথ দেখাবে। |
|---|--|

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর বৃহত্তম বন্ধীপ। দেশটি অবস্থানগত দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। দেশটির তিন দিকে স্থল আর এক দিকে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি একে অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছে। ম্যানচোভ বন নামে পরিচিতি সুন্দরবন, বিভিন্ন নদ-নদী, পাহাড় পর্বত বাংলাদেশকে এক পৃথক পরিচিতি প্রদান করেছে।

পাঠ্যের মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। বাংলাদেশের ফুসফুস হিসেবে কোনটিকে আখ্যায়িত করা হয়?
 - ক) সুন্দরবনকে
 - খ) বঙ্গোপসাগরকে
 - গ) মধুপুরের বনভূমিকে
 - ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়সমূহকে
- ২। পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রধানত যে জনগোষ্ঠীর বাস-
 - ক) উড়িয়া
 - খ) মারাঠী
 - গ) বাঙালি
 - ঘ) বিহারী
- ৩। কোন নদীর প্রাচীনতম পথ বুড়িগঙ্গা?
 - ক) মেঘনা
 - খ) পদ্মা
 - গ) যমুনা
 - ঘ) ব্ৰহ্মপুত্ৰ
- ৪। আন্তনদের বাড়িটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রমত্না পদ্মা নদী। পদ্মা, কোন নদীর প্রধান শাখা। (প্রয়োগ)
 - ক) যমুনা
 - খ) ব্ৰহ্মপুত্ৰ
 - গ) গঙ্গা
 - ঘ) মেঘনা
- ৫। তিঙ্গা নদীর তিনটি স্রোতধারা হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য (উ: দক্ষতা)
 - ক) বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, তুরাগ
 - খ) সুরমা, কুশিয়ারা, সারা
 - গ) করতোয়া, পুনর্ভবা, আত্রাই

পাঠ-৩.২ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং এর প্রভাব



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



ব-দ্বীপ, কীর্তিনাশা, সুজলা, সুফলা, সমতল, নিম্নভূমি, জনপদ, অরণ্য, ভাঙাগড়া।

মুখ্য শব্দ (Key Words)

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

নদনদী দিয়ে বয়ে আসা পলি মাটির স্তর দিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ। উচু জায়গা থেকে নদীর স্রোতে যে অজস্র পলি অবিরাম ভেসে এসেছে তাই দিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলার ব-দ্বীপের নিম্নভূমি। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব বাংলার কিছুকিছু অংশ বাদ দিলে ভূত্তের দিক থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় সবটাই নতুন পলি পড়া মাটি। এই নতুন জমির উপর দিয়ে বাংলার বিভিন্ন নদ-নদী কতবার যে খাত পরিবর্তন করেছে, তার ইয়াতা নেই। আবার এই নদী ভাঙ্গন বা খাত বদলে অনেক জনপদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই বাংলার নদীকে অনেক সময় বলা হয় কীর্তিনাশা। অথচ এই নদীই বাংলাদেশকে সুজলা, সুফলা করেছে; তার দুই তীরে মানুষের বসতি, কৃষি, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুরই বিকাশ। বাঙালি তাই এসব নদীকে যেমন ভয়ভাত্তি করেছে, তেমনই আদর করে তাদের নাম রেখেছে ইছামতী, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, ঘহানন্দা, মেঘনা, সুরমা, লৌহিত্য, কীর্তনখোলা কিংবা কপোতাক্ষ।

ভূ-প্রকৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লার কিছু অঞ্চল, সিলেটের পূর্বাঞ্চল, টাঙ্গাইলের মধ্যপুর গড় ও গাজীপুরের ভাওয়ালের গড় মিলে কিছু পাহাড় আছে। বাংলাদেশের আর সকল ভূমিই নতুনভূমি; এখানে সবত্র খালবিল আর বিরাট জলাভূমি। এই নবভূমির মধ্যে আবার ঢাকা বিভাগ, কুমিল্লা ও সিলেটের বহুলাংশের গঠন পূরনো। প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতির অনেক নির্দশন এসব জায়গায় পাওয়া গেছে। আর খুলনা, বাখেরগঞ্জ, সমতল-নোয়াখালি ও সমতল-চট্টগ্রামের গঠন নতুন।

উর্বর পলল ভূমি, চৰ ও অরণ্য

ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে সব থেকে বেশি ভাঙাগড়া হয়েছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। পদ্মা, ভাগীরথী ও তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় যে বিপুল পলিমাটি ভেসে আসে তার জন্যে নিম্নভূমি বার বার তচ্ছন্দ হয়ে কখনো সেখানে সমৃদ্ধ জনপদ, কখনো গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে, কখনো তা জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে কিংবা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ষষ্ঠ শতকে পানি সরে গিয়ে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া অঞ্চল তখন সবেমাত্র মাথা তুলেছে; তাই তাকে বলা হতো নতুন জেগে ওঠা চৰ। এই জনপদ ছিল প্রায় সমুদ্রের তীরে। আজ যে সুন্দরবন অঞ্চল জনহীন অরণ্য। ছয় শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত সেখানে ছিল মানুষের ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ। নিম্নভূমির এই ভাঙাগড়া আজও একটানা চলছে।

নদ-নদী পরিবেষ্টিত ভূমি

বাংলার মাটিতে যুগ যুগ ধরে অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। নানান প্রাকৃতিক ওলট পালটের ফলে পুরনো মাটি বাতিল হয়ে নতুন মাটি বা নবভূমি জেগে উঠেছে, তাতে ভূ-প্রকৃতির কোনো মৌলিক বদল হয়নি। ‘বাংলা’ এই নামের সঙ্গে বাংলার নদ-নদী জড়িয়ে আছে। এসব নদ-নদীই বাংলার প্রাণ। এসব নদ-নদীই বাংলাকে গড়ে তুলেছে। যুগে যুগে বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে, আজও করছে। বাংলার নদ-নদীর খাত গত একশো বছরেও যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাতে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

বাংলার জলবায়ু বরাবরই নাতিশীলতোষও। তবে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত বীরভূম-বর্ধমানের পশ্চিমাংশে এবং কতকটা মেদিনীপুরেও গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর; অন্যত্র গ্রীষ্মের হাওয়া উষ্ণ জলীয়। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি বেশি হয়। ভারত মহাসাগরের মৌসুমীবায়ু হিমালয়, গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে সমগ্র উত্তর-পূর্ব বাংলাকে বৃষ্টিতে

ভাসিয়ে দেয়। বসন্তকালে আরেকটি বায়ু প্রবাহ দেখা যায়; এই বায়ু প্রবাহ উত্তর-পূর্ববাহি। যেহেতু এই বাতাস মালয় পর্বত স্পর্শ করে আসে সেই জন্য কাব্যসাহিত্যে বসন্তের বাতাসকে বলে মলয় পবন। বর্ষায় অবিরল বৃষ্টিপাত পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জনজীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

কৃষি নির্ভরতা

বাংলাদেশের ভূমি খুবই উর্বর। এজন্যে বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীন কাল থেকে মূলত কৃষিজীবী। সুদূর অতীত থেকে এদেশের কৃষি প্রাচুর্যের জন্যে বিখ্যাত। বাংলাদেশে অন্ত পরিশ্রমে অধিক খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়।

লোক-প্রকৃতি: শান্ত, কর্মঠ ও বিদ্যানুরাগী

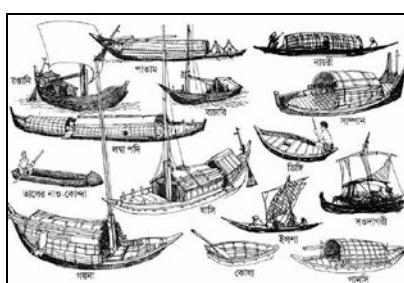
উর্বর ভূমি ও মুদু আবহাওয়া বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে কোমল, শান্ত ও আবেগী স্বভাবের করে গড়ে তুলেছে। সপ্তম শতকে হিউরেন সাঙ এ দেশে এসেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলার লোকেরা স্পষ্ট কথা বলে, এরা গুণবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান। সমতটের লোকেরা কর্মঠ ও সাহসী; কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ভদ্র, সচ্চরিত্র এবং তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী। বিদ্যার্চার প্রতি বাঙালির অনুরাগের খবর অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। বাঙালিরা ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এবং ভারতবর্ষের বাইরেও যাতায়াত করত।

প্রকৃতির বিরঞ্জনে সংগ্রামী

বাংলাদেশের অবস্থানের কারণে এখানে কাল বৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছাস বা বন্যা হয়। প্রকৃতি বাংলাদেশের অধিবাসীকে কিছুটা আয়েসী করে তুললেও নদী ও সমুদ্র এখানকার মানুষকে করেছে বিদ্রোহী এবং দিয়েছে প্রতিরোধ ক্ষমতা। নদীর দু-পাড় জুড়ে তাঁই যুগ যুগ ধরে অনবরত চলছে ভাণ্ডা আর গড়া। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরঞ্জনে লড়াই করে এদেশবাসীর মানসিকতা একদিক থেকে যেমন সহনশীল, অন্যদিক থেকে চিরসংগ্রামী। তারা বিপর্যয়ের মুখে দৈর্ঘ্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে।

নৌ-কুশলী বাঙালি ও সমুদ্র বাণিজ্য

নদ-নদী ও পানিবেষ্টিত থাকার কারণে বাংলাদেশের মানুষ নৌকা নির্মাণ ও পরিচালনায় দক্ষ। নৌ-যুদ্ধে বাংলার অধিবাসীদের সুখ্যাতি ছিল। প্রাচীনকালে ও মুসলিম যুগে এদেশে সু-শৃঙ্খল নৌ-বহর গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনকালে বাংলার মানুষের নদীপথে যেমন দেশের মধ্যে, তেমনই সমুদ্রপথে দেশের বাইরেও যাতায়াত ছিল। উত্তর আসামের রেশমজাতীয় জিনিসপত্র, পান, সুপারি, চন্দনকাঠ, বাঁশ, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-সুরমা-মেঘনা নদীর জলপথ দিয়েই বাংলাদেশে আসত। প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথের যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে।



বাংলাদেশের নানা রকমের নৌকা

রাজনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

উত্তর ও পূর্বদিকে পাহাড়, টিলা এবং দক্ষিণ দিকে সমুদ্র বাংলাদেশকে প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতিকভাবে বেষ্টিত করে রেখেছে। ফলে বাংলাদেশকে খুব একটা বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়নি। বিদেশী শক্তির লোভী দৃষ্টি থেকে প্রকৃতিই বাংলাদেশকে আড়াল করে রেখেছিল এবং প্রাচীনকালে বহু বছর বাংলার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় ছিল। উত্তর ভারত থেকে এদেশে মাত্র দুটি পথ ধরে বাংলায় প্রবেশ করা যেত: একটি ত্রিভুত বা উত্তর বিহারের মধ্য দিয়ে এবং অন্যটি রাজমহলের নিকট তেলিয়াগড়ের সরু পাহাড় পথ ধরে। প্রাকৃতিক কারণে দুটি পথ ধরে বাংলায় প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না বলে ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তি সহজে প্রাচীনকালে সম্পদশালী বাংলাদেশকে সহজে অধিকার করতে পারেনি এবং তাদের অভিযান বেশিরভাগই বিফল হয়েছে। কখনো কখনো সাফল্য এলেও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মৌর্য

ও গুপ্ত শাসকগণ অল্প সময়ের জন্যে বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন একটি নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠতে থাকে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এদেশের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের উপরও পড়েছে। বাংলার অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি, জীবনাচার ইত্যাদি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলার ভূ-প্রকৃতি, তার নদনদীর বিস্তার ও বিপুল পলিমাটি এ দেশটিকে গড়ে তুলেছে মৎ শিল্প চর্চার এক আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির শিল্প এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছিল। বাংলাদেশে আদিমকাল থেকেই জলপথে নৌকার ব্যবহার চলে আসছে। নদীমাতৃক বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এবং আনন্দ উৎসবে নৌকা ও তপ্তোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাঙালির মন যে নৌ-যানের তারে বাঁধা ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এখানকার নগর বন্দরের উত্থান-পতনের সাথেও জড়িত। নদীর গতি পরিবর্তন ও অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে বহু প্রাচীন বন্দরের উত্থান ও বিলুপ্তি ঘটেছে। প্রাচীন যুগে পুঁত্রনগর, গোড়, বিক্রমপুর, দেবপৰ্বত (ময়নামতি) ইত্যাদি শহর নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

| | |
|--|--|
| | বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক মানচিত্র আঁকবেন এবং সেখানে হলুদ রং-এ পাহাড়ি অঞ্চল ও বনভূমি দেখাবেন, সুরজ রং-এ সমগ্র সমতলকে চিহ্নিত করে নীল রং দিয়ে নদনদী ও দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরকে ফুটিয়ে তুলবেন। |
| অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | |

১৫ সারসংক্ষেপ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি গড়ে উঠেছে নদ-নদীকে কেন্দ্র করে। নদী দিয়ে বয়ে আসা পলিতে গড়ে উঠেছে ভূমি, এদেশের জলবায়ু নাতিশীলতার তৈরি বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যে কারণে বাংলাদেশের নদীগুলো জনজীবনের যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলে। নদী-নদী একদিকে করে তোলে মানুষকে সংগ্রামী অপরদিকে খুলে দেয় সম্মুদ্রের দ্বার।

১৬ পাঠ্যনির্দেশন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। কোনটিকে বাংলার প্রাণ বলা হয়?
 - ক) এখানকার চিলা পাহাড়কে
 - খ) বনভূমিকে
 - গ) নদ-নদীকে
 - ঘ) ফসলের মাঠকে
- ২। বিদেশী আক্রমণ থেকে বাংলা মুক্ত ছিল কেন?
 - ক) সুশ্রাব নৌবাহিনীর জন্য
 - খ) প্রাকৃতিক বেষ্টনির কারণে
 - গ) সুউচ্চ পর্বতমালা থাকায়
 - ঘ) রূক্ষ শুক্ষ জলবায়ুর জন্য
- ৩। বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য বাক্যটি?
 - i) বেশি পরিশ্রম কর ফলন
 - ii) অল্প পরিশ্রম বেশি ফলন
 - iii) বেশি পরিশ্রম বেশি ফলন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i
 - খ) ii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii
- ৪। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল
 - ক) বাণিজ্য
 - খ) কৃষি
 - গ) মৎস্যচাষ
 - ঘ) পশুপালন
- ৫। প্রাচীন পুঁথিতে বাঙালির কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়?
 - ক) চরিত্রবান
 - খ) বিদ্যানুরাগী
 - গ) পরিশ্রমী
 - ঘ) সাহসী

১৭ উত্তরমালা

- পাঠ্যনির্দেশন- ৩.১ : ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ
 পাঠ্যনির্দেশন- ৩.২ : ১. গ ২. গ ৩. খ ৪. খ ৫. খ

ইউনিট ৪

প্রাচীন বাংলার জনপদ ও রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল অজয় নদীর তীরে। প্রাচীনকালে বাংলা বলতে সমগ্র দেশকে বোঝানো হতো না। এর বিভিন্ন অংশ একাধিক নামে পরিচিত ছিল এবং এই অংশগুলোর ভৌগোলিক অবস্থিতি বহুলাংশে নির্ধারিত হয়েছিল ভূ-প্রকৃতি তথা নদীর স্তোত্বারার মাধ্যমে। প্রাচীনকালে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এই জনপদবাসীরাই স্ব-স্ব জনপদের নামেই পরিচিতি লাভ করে। পাল আমল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। তবে গুপ্তদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে বাংলাও ছিল একটি প্রদেশ। গুপ্ত শাসনের পর এই দেশে অস্থিতশীল পরিস্থিতির জন্ম হয়। এ অবস্থা চলে প্রায় একশ বছর। গোপাল নামে এক নেতা এ অরাজক অবস্থার অবসান ঘটান এবং পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর প্রায় চারশ বছর পর বাংলায় পাল শাসনের অবসান হয় এবং বার শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয় সেন শাসন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : প্রাচীন বাংলার জনপদ
পাঠ-৪.৩ : পাল বংশ

পাঠ-৪.২ : প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস
পাঠ-৪.৪ : সেন বংশ



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

পাঠ-৪.১ প্রাচীন বাংলার জনপদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

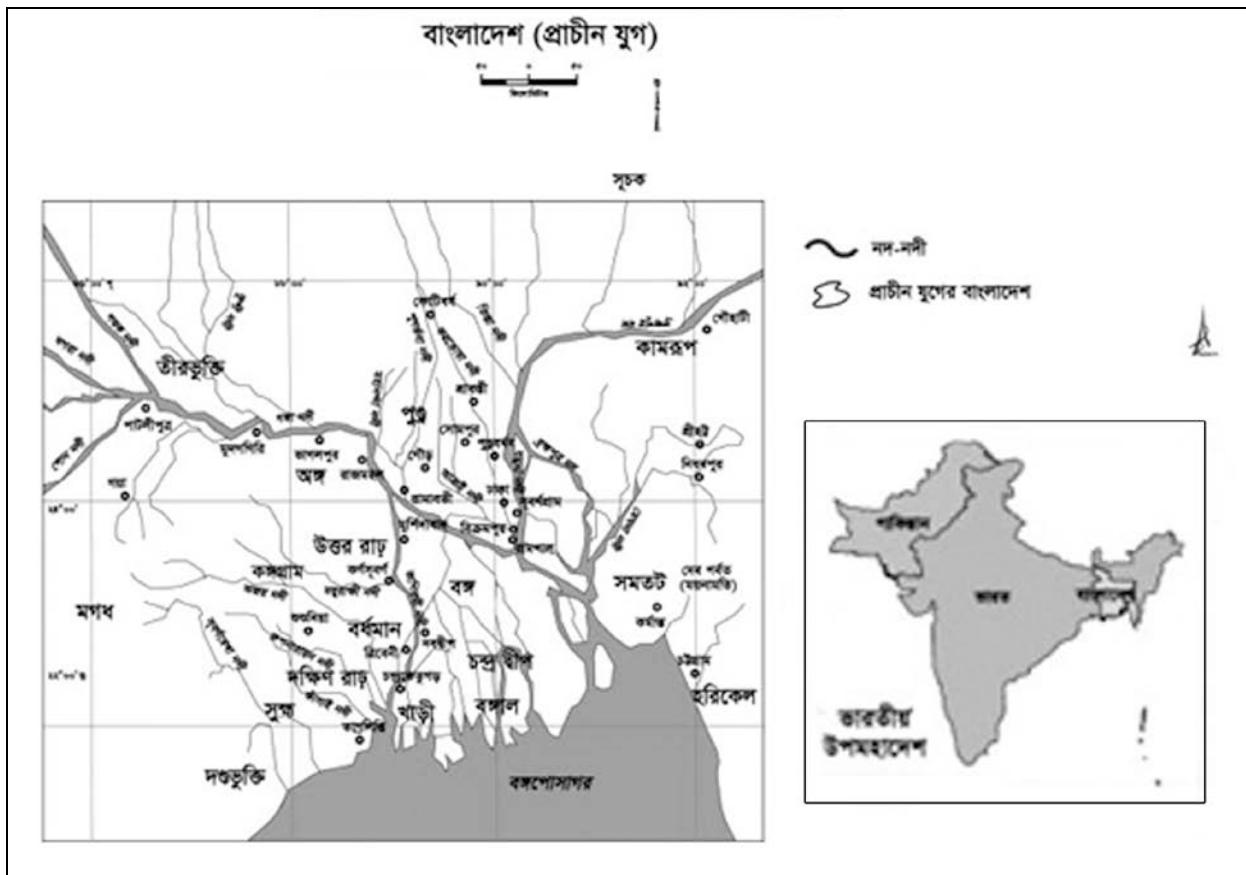
- বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।



জনপদ, পুঁতি, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল

মুখ্য শব্দ (Key Words)

প্রাচীন যুগে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এই জনপদবাসীরাই স্ব-স্ব জনপদের নামেই পরিচিতি লাভ করে। তবে ভৌগোলিক পরিবেশ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের (নদীর ভাঙা-গড়া) সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে ঠিক একইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার বা হ্রাসের মাধ্যমে জনপদগুলোর আয়তনও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এসব পৃথক পৃথক অংশগুলো এককথায় ‘জনপদ’ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জন বা জনগোষ্ঠীর অবস্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এই শব্দটি। অর্থাৎ এই জনপদগুলোর অধিকাংশের নামকরণ হয়েছিল প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নামানুসারে। প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আনুমানিক ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে প্রাচীন বাংলা পুঁতি, গৌড়, রাঢ়, সূক্ষ্ম, তাম্রলিপি, সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত। এই জনপদগুলো স্বতন্ত্র ও পৃথক, মাঝে মাঝে বিরোধ মিলনে একের সাথে অন্যের যোগাযোগের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। তবে প্রত্যেকেই যে স্বতন্ত্র সে বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত।



ପୁଣ୍ଡ ବା ବରେନ୍ଦ୍ରୀ

পুঁজি ছিল পূর্বাঞ্চলের জনপদসমূহের মধ্যে খুব সম্ভবত প্রাচীনতম। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের (আনুমানিক) মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতে উল্লিখিত পুদনগল (পুঁজি নগর) এবং বগুড়া যে অভিন্ন তা একাধিক উৎস থেকে প্রমাণ করা যায়। প্রাচীন এই জনপদের সীমানা চিহ্নিত করে ড. নীহাররঙ্গন রায় লিখেছেন, “পুঁজুবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থানের একটি নতুন নাম পাইতেছি দশম শতক হইতে; এ নাম বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী।” অর্থাৎ এই প্রাচীন জনপদটি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দুটো ভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। কতিপয় লিপি প্রমাণে এ কথা বলা যায় যে, বরেন্দ্র পুঁজুবর্ধনেরই অংশবিশেষ। মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিকরা বরেন্দ্রিকে বলতেন বরীন্দ্র। অবশ্য বরেন্দ্র বলতে প্রাচীন বরেন্দ্রিক মতো বিশাল এলাকাকে বুঝাতো না।

ରାତ୍, ତାମ୍ରଲିଙ୍ଗି

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎস থেকে বলা যায় যে, রাঢ় বলতে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলকেই বুঝানো হতো। এটি গঙ্গা নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। জনপদটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল দক্ষিণ রাঢ় এবং অন্যটি ছিল উভয় রাঢ়। এই উভয় ও দক্ষিণ রাঢ়ই ছিল যথাক্রমে বজ্রভূমি ও সৃষ্টভূমি। রাঢ়ের প্রধান নগর বা রাজধানী ছিল কোটিবর্ধ। রাঢ় বা সৃষ্টদেশের অন্তর্গত তাত্ত্বিকভাবে কথা টলেমির ভূগোলে উল্লিখিত ছিল। অনেক ঐতিহাসিক মেদিনীপুর জেলার পূর্বপাঞ্চ অবস্থিত আধুনিক তমলুককে প্রাচীন তাত্ত্বিকভাবে বলে চিহ্নিত করেছেন। শুধু বাংলা নয় এটি প্রাচীন ভারতেরও পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বন্দর।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ধারণা করা হয় যে, গৌড় উৎপাদনের কেন্দ্র বলে গৌড় নগর ও দেশের নামের উভ্র হয়। আর হয়ত এই গৌড়নগরকে ঘিরেই পরে গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল। ‘গৌড়’ নামটি সুপ্রাচীন হলোও এর অবস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কষ্টসাধ্য। বাংলার প্রাচীন জনপদগুলো যে যুগে যুগে সীমানা সম্প্রসারণ করেছে তার বড় উদাহরণ হলো গৌড়। এই জনপদের খ্যাতি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সমগ্র বাংলাকেই সময়ে গৌড়দেশ বিবেচনা করা হতো।

পূর্ব ভারতীয় দেশসমূহের সামগ্রিক নাম হিসেবে এমনকি উভর ভারতের আর্যবর্তের নাম হিসেবেও কখনো কখনো গৌড়ের ব্যবহার দেখা যায়। সেনবংশীয় রাজারা ‘গৌড়েশ্বর’ উপাধি গ্রহণ করে গৌরববোধ করতেন। ব্যাপক অর্থে ‘গৌড়’ বলতে অনেক সময় বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চলকে বুঝাত। আদি গৌড়ের রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণের ফলে এর সীমানা বৃদ্ধি পেতো।

আদিকালে গৌড় বলতে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদা জেলার দক্ষিণাংশকে বুঝাত। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ দেশের সম্রাট বলেছেন এবং হর্ষচরিত গ্রন্থে শশাঙ্ককে ‘গৌড়াধিপতি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ণসুবর্ণ দেশ ও গৌড়দেশ অভিন্ন। গৌড়ের রাজধানী শহর ছিল কর্ণসুবর্ণ। মধ্যযুগের খ্যাতিমান মুসলিম পণ্ডিত আল বেরুনির বিবরণ অনুযায়ী পূর্বভারতের বিভিন্ন দেশের অর্থাৎ বর্তমান বাংলা, উড়িষ্যা, আসামের আদি মধ্যযুগীয় লিপির প্রকৃত রূপ হলো এই “গৌড়ীয় লিপি”। মুসলিম যুগে অঞ্চলটি কখনো ‘গৌড়’ আবার কখনো লক্ষণাবতী নামে পরিচিত ছিল।

বঙ্গ

বঙ্গ একটি প্রাচীন জনপদ। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে একটি উপজাতির নাম হিসেবে বঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত, রামায়ণ ও হরিবংশেও রয়েছে বঙ্গ প্রসঙ্গ। মহাভারতের আদি অন্যান্য জনপদের সাথে উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গের নাম। মহাকবি কালীদাসের রঘুবংশ কাব্যে আছে বঙ্গের অবস্থান ও সীমানা সম্পর্কিত কিছু তথ্য। তিনি ভাগীরথী ও পদ্মাৱ স্নেত মধ্যবর্তী এলাকায় যে ত্রিভুজাকৃতি ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বঙ্গদের অঞ্চল বলেছেন। আর এ অঞ্চলই সম্ভবত টলেমির ‘গঙ্গরিডাই’। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর বঙ্গ অন্যটি নাব্য বঙ্গ। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গা নেই। অনুমান করা যায় ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল এলাকা নাব্য বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলায় মুসলিমান শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে ‘বঙ্গ’ বলে বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অংশকেই বুঝানো হতো। সুতরাং বঙ্গের এই ভৌগোলিক পরিচিতি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ পেরিয়ে মুসলিম যুগের প্রাথমিক পর্যায়েতো বটেই, সম্ভবত ‘বাঙালাহ’ নামের বিকাশ পর্যন্তই ছিল।

মধ্যযুগের বিখ্যাত মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশের উভকালীন নাম বঙ্গল। কারণ এ দেশের প্রাচীন রাজাগণ সারাদেশে চওড়া ‘আল’ নির্মাণ করতেন। সেজন্যে ‘বঙ্গ’ ও ‘আল’ শব্দ দুটির যোগে ‘বঙ্গল’ নামের উৎপত্তি হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা হয় যে পানি থেকে শস্যক্ষেত রক্ষার জন্য বড় বড় ‘আল’ বাঁধা হতো এবং তার ফলে এ অঞ্চলটি ‘বঙ্গল’ নামে পরিচিত হয়।

সমতট, পট্টিকেরা

দক্ষিণ পূর্ব বাংলার জনপদ সমতট নামটি বর্ণনামূলক এবং এর অর্থ তটের সমান্তরাল। চতুর্থ শতকের সম্রাট সমুদ্রগুণ্ঠের এলাহাবাদ লিপিতে তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমায় সমতটের উল্লেখ রয়েছে। কালীদাসের রঘুবংশ কাব্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, সমতট বঙ্গের পূর্বে অবস্থিত ছিল। সগুম শতকে সমতটে এসেছিলেন হিউয়েন সাঙ। তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলই সমতট। মূলত মেঘনা-পূর্ববর্তী অঞ্চলই সমতট বলে পরিচিত ছিল এবং এ অঞ্চলের কেন্দ্র ছিল কুমিল্লার নিকটবর্তী ‘লালমাই’ এলাকা। একেবারে সঠিকভাবে সমতটের সীমা নির্ধারণ না করা গেলেও ত্রিপুরা (কুমিল্লা) ও নোয়াখালী অঞ্চলই ছিল সম্ভবত প্রাচীন সমতট।

হরিকেল

হরিকেল জনপদের কথা প্রথম জানা যায় প্রথম শতকের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে। চন্দ্রবংশীয় লিপিতেও হরিকেল রাজ্যের কথা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইত্তাগারে সংরক্ষিত দুটি প্রাচীন গ্রন্থের পাত্রলিপিতে হরিকেল (হরিকেল) ও বর্তমান সিলেট বিভাগ অভিন্ন উলিংচথিত হয়েছে। অনেকে ধারণা করেন যে হরিকেল জনপদ ছিল না, এটি বঙ্গের সাথে যুক্ত ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে এ কথা বলা যায় যে, জনপদগুলোর নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা বা যুগে যুগে তাদের সীমার বিস্তার ও সংকোচনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরহ কাজ। তারপরও প্রাপ্ত নানা তথ্যের মাধ্যমে আমরা জনপদগুলোর ভৌগোলিক কাঠামো সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও আংশিক সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। রাজনৈতিক, ভৌগোলিক নানা প্রেক্ষাপটে এসব জনপদগুলোয় সবসময়েই চলেছিল ভাঙ্গ-গড়ার খেলা। ভবিষ্যতে হয়ত আরও নানা তথ্যের আবিষ্কার আমাদের সামনে জনপদগুলোর পূর্ণসংজ্ঞ রূপ তুলে ধরবে।



হিউরেন সাঙ



আল বেরনি



টলেমি

| | |
|--|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | বৃহত্তর বঙ্গদেশের একটি প্রাকৃতিক মানচিত্রে জনপদসমূহকে আলাদা করে চিহ্নিত করবেন। পাওয়ার পয়েন্টে দেখাবেন। |
|--|--|

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকালে বাংলা নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ড নয় বরং বেশ কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো পুঁজি, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ বা বঙ্গল, সমতট ও হরিকেল। এই জনপদগুলো সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন বৎশের শাসনে ছিল। পাল আমলের শাসনের সূচনা পর্যন্ত এ জনপদগুলোর আয়তন বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।

পাঠ্যকাগজ মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। কার বিবরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে লালমাই অঞ্চলই “সমতট” জনপদ?
 ক) পার্শ্বীন খ) কালিদাস গ) আবুল ফজল ঘ) হিউরেন সাঙ
- ২। জনপদের নির্দিষ্ট সীমানা প্রদান কষ্টসাধ্য কেন?
 i) পারস্পারিক সংযুক্তা ii) ভৌগোলিক বিবরণের অপূর্ণতা iii) রাজ্যসীমা বিস্তার বা সংকোচনের ফলে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- ৩। বঙ্গের অবস্থান বলতে বুবায়—
 i) ভাগীরথী ও পদ্মাৰ মধ্যবর্তী এলাকা ii) বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশ iii) মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চল
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
- ৪। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রবার্টসন একজন মুঘল শাসকের সভাকবি ছিলেন। তিনি জানান যে প্রাচীনকালে কৃষকরা জমিকে
 বন্যার ব্যাপকতা থেকে রক্ষার জন্য বাঁধ দিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
 উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিকের প্রদত্ত তথ্যের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঐতিহাসিকের মিল পাওয়া যায়।
 ক) শামস সিরাজ আফীফ খ) জিয়াউদ্দিন বারানী গ) আবুল ফজল ঘ) মিনহাজ উস সিরাজ

সৃজনশীল

শার্লিন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থী। ‘O’ লেভেল পরীক্ষা শেষে মামাৰ বাড়ি কৱতোয়াৰ পাশে বণ্ডার মহাস্থানগড়ে
 যায়। মামা তাকে নিয়ে সেখানে গড়ে ওঠা প্রাচীনকালের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দর্শন দেখায় এবং সে সময়কার উজ্জ্বল শাসনামলের
 ইতিহাস বর্ণনা করেন।

- ক. সর্বপ্রথম বঙ্গের উজ্জ্বল পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
- খ. জনপদ বলতে কী বুবায়? –ব্যাখ্যা করুন।
- গ. উদ্দীপকে শার্লিনের পরিদর্শনকৃত এলাকা কোন জনপদের কথা মনে করিয়ে দেয়? বিবরণ দিন।
- ঘ. উক্ত জনপদের শাসকদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল শাসনকাল – মতামত উল্লেখ করুন।

পাঠ-৪.২ প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মৌর্য, গুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রশাসন

মুক্ত শব্দ (Key Words)



মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা

গুপ্ত যুগের আগে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় না। এ সময়ের ইতিহাস বিষয়ে কিছু উপাদান পাওয়া যায়। যেমন থিক লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে, তখনকার বাংলাদেশে ‘গঙ্গারিডহ’ নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সন্ত্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রিস্টপূর্ব)। এলাকাটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুঁজিগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। সমগ্র বাংলা শাসনকারী প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হলো গুপ্তরা। বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, গুপ্তদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে বাংলাও ছিল একটি প্রদেশ।

শশাঙ্ক : বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম সার্বভৌম রাজা। তিনি বাংলার বাইরেও রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শশাঙ্ক উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও ভূমিকা পালন করেছিলেন। ড. নীহাররঞ্জনের মতে শশাঙ্ক “স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরাপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।”

শশাঙ্কের প্রাথমিক জীবন ও উত্থান: শশাঙ্কের বৎশ বা বাল্যজীবন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, শশাঙ্ক প্রথম জীবনে স্বাধীন রাজা ছিলেন না, গুপ্ত বংশীয় মহাসেন নামক এক রাজার সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্ক কখন এবং কিভাবে গৌড়দেশে সার্বভৌম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তা ও সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে গৌড়ের পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে শশাঙ্ক সপ্তম শতকের শুরুতে আনুমানিক ৬০৬ সালে গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন গৌড়রাজ্য বাংলার উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাংশ ও মগধে বিস্তৃত ছিল। কর্ণসুবর্ণ ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহুমপুরের ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রাঙামাটি নামক স্থানটিই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ।

রাজ্য জয় এবং পৃষ্যভূতি রাজ্যের সাথে দ্঵ন্দ্ব: শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দণ্ডভূক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) নিজ রাজ্যভূক্ত করেন। শশাঙ্কের রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যার চিকা হৃদ পর্যন্ত ছিল। শশাঙ্ক পশ্চিমে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে প্রথমে মগধ ও পরে বারানসী রাজ্য তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে। ফলে উভয় অঞ্চলই শশাঙ্কের রাজ্যভূক্ত হয়।

শশাঙ্ক উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন: তাঁর লক্ষ্য ছিল কনৌজের মৌখীরীরাজাদের আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্যকে রক্ষা করা। উত্তর ভারতে শশাঙ্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হর্ষবর্ধন। তাই হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচিত হর্ষচরিত ও তার সমসাময়িক হিউয়েন সাঙ্গের বর্ণনায় শশাঙ্কের উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিবরণ রয়েছে। শশাঙ্কের সাথে রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। এরপর রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শশাঙ্কের উপর ভীষণ দ্রুদ্ধ হন এবং এক বিশাল বাহিনীসহ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তবে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি তা শশাঙ্কের গঞ্জাম তাম্রশাসন থেকেই প্রমাণিত হয়। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার হাত থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

শশাঙ্কের কৃতিত্ব: শশাঙ্ক সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণেই হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্যের ও বৌদ্ধ ধর্মের নিঃহকারীরাপে চিহ্নিত করেন। শশাঙ্ক সম্পর্কে এ অভিযত সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। কারণ হিউয়েন সাঙ্গ-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, রাজধানী কর্ণসুবর্ণে এবং শশাঙ্কের রাজ্যের অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল।

শশাঙ্ক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি নিজ প্রতিভা বলে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি গৌড় রাজ্যকে ভারতের বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কৌশল ও সামরিক দক্ষতার বলে তিনি তাঁর প্রধান শক্র

ହର୍ଷବର୍ଧନେର ମୋକାବିଲା କରତେ ଗିଯେ ନିଜ କ୍ଷମତା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାଖିତେ ପେରେଛିଲେନ । ଶୁଦ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶେର ଇତିହାସେଇ ନୟ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତକେର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶେର ଇତିହାସେଇ ଶଶାଙ୍କ ଛିଲେନ ଏକଜନ ନାମକରା ରାଜା ।

শশাঙ্ক একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। তার আমলে তাম্রলিপ্ত বন্দর গুরুত্ব লাভ করে। তিনি ৬৩৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে গৌড়ে বিশ্বজ্ঞানা দেখা দেয়। গোটা বাংলায় নেমে আসে অন্ধকারের যুগ। প্রায় একশ বছর বাংলার ইতিহাসে যে অরাজকতা, নেতৃত্বের শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাকে ‘মাঝস্যন্যায়’ বলা হয়ে থাকে।

| | |
|---|--|
|  <p>অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ</p> | <p>শিক্ষার্থীরা শক্তি ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধের একটি কান্তিমুক্ত চিত্র আঁকবে।</p> |
|---|--|

 সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। নিজ প্রতিভা বলে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। গুপ্ত বংশের রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে শশাঙ্ক সপ্তম শতকের শুরুতে রাজ্য গড়ে তোলেন। তবে তার মৃত্যুর পর নেমে আসে অন্ধকারের যুগ। যোগ্য শাসকের অভাবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

 পাঠ্যতের মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

সুজনশীল

কুমিল্লার ইফতেখার সাহেব প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জানতে কিছু বই খরয় করেন। এর মাধ্যমে তিনি জানলেন পাল রাজাদের আমলে যে জনপদটির বেশি নাম ডাক ছিল তার নানা অজানা তথ্য। এখানে পালদের পূর্ববর্তী একজন শাসক শুধু বাংলায় নয় উভর ভারতের রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সফলতা হয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুতে বাংলায় নেমে আসে হতাশার ঘণ্টা। দেখা দেয় অরাজকতা।

ক. শাস্ক কত সালে মত্যবরণ করেন?

খ শশাঙ্ক-কে সশাসক বলা হয় কেন? বাখ্যা করুণ।

ଗ. ଉଦ୍ଦିପକେ ପାଲଶ୍ସକଦେର ପର୍ବତୀ ଶାସକେର ସଫଳ୍ୟେର ସାଥେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟେର କୋଣ ଶାସକେର ମିଳ ଲକ୍ଷ୍ୟାବଧି? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ।

ঘ. দক্ষ শাসকের অবর্তমানে রাজ্যে সঞ্চি হয়ে আরাজকতা - পাঠ্য বইয়ের আলোকে উন্নতির স্পন্দনে ঘৃত্তি দিন।

পাঠ-৪.৩ বাংলায় পাল বংশের শাসন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মপালের শাসনকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- দেবপালের শাসনামলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পাল যুগের গৌরব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

| | |
|--|--|
|  মুখ্য শব্দ (Key Words) | মাত্স্যন্যায়, গোপাল, ধর্মপাল, সোমপুর বিহার, নালন্দা, দেবপাল, মহীপাল |
|--|--|



ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে পাল রাজবংশ দীর্ঘকাল শাসন করেছে। সুশাসন, জনকল্যাণ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, উন্নত জীবনবোধ ইত্যাদি বাংলায় সর্বপ্রথম পালরাই প্রতিষ্ঠিত করে। পাল রাজারা বাংলা ও বিহার অঞ্চলে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় চারশ বছর শাসন করেছেন। নৈরাজ্য ও চরম অরাজকতার হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করে গোপাল নামক এক উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল নামে অনেক পাল রাজারা বাংলা শাসন করেছেন।

মাত্স্যন্যায় ও গোপালের উত্থান

শশাঙ্কের পর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত বাংলায় বিরাজ করছিল এক অন্ধকার যুগ। বাংলার ইতিহাসে এই সময়টি ‘মাত্স্যন্যায়’ নামে খ্যাত। মাত্স্যন্যায় একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হল অরাজক পরিস্থিতি। অরাজকতা এবং রাষ্ট্রহীনতার অবসান ঘটিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাল বংশের শাসন। শত বছরের হানাহানির অবসান ঘটে যখন গোপাল রাজা হলেন।

মাছের রাজত্বে ছোট, দুর্বল মাছ সবসময় বড় মাছগুলোর গ্রাসে পরিণত হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলা যেন পরিণত হয়েছিল মাছের রাজ্যে। শাসকের অভাবে সবল অত্যাচার করে দুর্বলের ওপর। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কে মায়া, মমতা, সৌহার্দ্যের যে স্থান তা দখল করে নেয় হিংসা ও দেষ। লামা তারানাথ লিখেছেন, সমগ্র দেশের কোনো রাজা ছিল না। এক চরম অরাজক পরিস্থিতিতে বাংলার ইতিহাসে অনেকটা ধূমকেতুর মতো গোপালের আবির্ভাব হয়। খালিমপুর তাত্ত্বাসনের বলা হয়েছে যে, মাত্স্যন্যায় দূর করার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিগণ গোপালকে রাজা নির্বাচন করেছিলেন। ‘প্রকৃতি’ শব্দের অর্থ ‘জনগণ’ বা প্রধান ‘কর্মচারী’। সম্ভবত প্রধান কর্মচারীগণ সমবেত হয়ে গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন।

অরাজক পরিস্থিতিতে গোপালের উত্থান প্রসঙ্গে তারানাথ এক রূপকথার অবতারণা করেছেন। বঙ্গ রাজ্য উপর্যুক্ত শাসকের অভাবে জনগণের দুঃখের সীমা ছিল না। এ কারণে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে একজন রাজা নির্বাচিত করেন। তবে নির্বাচিত রাজা সে রাতেই নিহত হন এক কুৎসিত, শক্তিশালী নাগ রমণীর হাতে। এরপর সেখানে যত রাজা নির্বাচিত হতেন প্রত্যেককে এই রাক্ষসীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হতো। যেহেতু একজন রাজা ছাড়া জনসাধারণ তাদের রাজ্য চালাতে পারছিল না, তাই প্রতি সকালে তারা একজন রাজা নির্বাচন করত। এভাবে প্রতিদিন রাজা নির্বাচন ও নিহত হবার ঘটনা ঘটেছিল। অতঃপর চুগাদেবীর আর্শীবাদ পেয়ে এক ব্যক্তি উপস্থিত হন এমন এক বাড়িতে যে বাড়ির লোকজন দুঃখি ছিল। কারণ সেদিন রাজা হবার দায়িত্ব পড়েছিল ঐ বাড়ির এক ছেলের ওপর। অতিথি সবকিছু কথা শুনে নিজে রাজা হবার কথা বলেন। এতে সেই পরিবার খুবই খুশি হয়। তিনি যেদিন রাজা নির্বাচিত

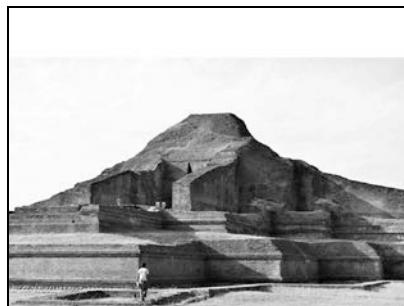
হন সেদিন মধ্যরাতে সেই রাক্ষসী উপস্থিত হলে অতিথির হাতে সেই রাক্ষসীর মৃত্যু ঘটে। পরদিন সকালে লোকেরা তাকে জীবিতবস্থায় দেখে খুবই অবাক হন। তার এ যোগ্যতার জন্যে জনগণ তাকে স্থায়ী রাজারূপে নির্বাচিত করে এবং গোপাল নামে অভিহিত করে।

ধর্মপাল ও উত্তর ভারতে ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ

ধর্মপাল হচ্ছেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন। দীর্ঘ শাসনামলে ধর্মপাল পাল রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্য উন্নত করেন। ধর্মপাল যখন সিংহাসন আরোহণ করেন তার কিছু আগ থেকেই আর্যাবর্ত তথা উত্তর ভারতে রাজনৈতিক দম্ব ও অস্ত্রিতা বিরাজমান ছিল। আর্যাবর্তের কেন্দ্রস্থল কনৌজ-এ কোনো রাজশক্তি ছিল না। এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য অষ্টম শতকের শেষ দিকে পার্শ্ববর্তী শক্তিবর্গের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়। তৎকালীন ভারতের তিনটি প্রধান রাজশক্তি যথা রাজস্থানের প্রতীহার রাজবংশ, বাংলার পাল এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট এক ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ধর্মপাল বেশকিছু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তবে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। যাহোক, বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালই প্রথম রাজা যিনি সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে স্বল্পকালের জন্য হলেও কিছু সাফল্য অর্জন করেন। ধর্মপালের সময়ে বাংলা নতুন শক্তি ও উদ্বীপনার প্রতীক হয়েছিল।



মহাস্থানগড়, বগুড়া



সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর



শালবন বিহার, কুমিল্লা

ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি অনেক বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজশাহী বিভাগের বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত এই বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। এই জন্যে এটি মহাবিহার নামে পরিচিত। ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হলেও তিনি অন্য ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি হিন্দু দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ করার জন্য ভূমিদান করতেন। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।

দেবপাল ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

দেবপাল পালবংশের অন্যতম রাজা ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৮২১ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শুধু পিতা ধর্মপালের সাম্রাজ্য রক্ষাই করেননি, বরং সীমানা বৃদ্ধিও করেন। একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর সৈন্যবাহিনী বিস্তৃত পর্বত ও কঘোজে বিচরণ করেছিল এবং তিনি উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত ভূভাগ শাসন করেন।

দেবপাল গুর্জের রাজাকে পরাজিত করেন, উড়িষ্যাও জয় করেন। জানা যায় যে, দেবপাল দ্রাবিড় রাজার দর্প চূর্ণ করেন। কেউ কেউ দ্রাবিড় রাজ্য বলতে রাষ্ট্রকূট রাজ্যকে ধরে নেন এবং দেবপালের সাথে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সংঘর্ষের কথা মনে করেন। আরব দেশীয় বণিক ও পর্যটক সুলায়মানের মতে, তখন বাংলা অধিক শক্তিশালী ছিল। দেবপাল সুমাত্রা, জাভা ও বোর্নিও রাজ্যের রাজাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। মালয় উপদ্বীপের শৈলবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের খ্যাতির কথা জানতে পেরে তাঁর নিকট দৃত পাঠিয়েছিলেন। বালপুত্রদেব ইতোমধ্যেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি এর স্থায়ী ব্যয় পরিচালনার জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন।

দেবপাল বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর সংস্কার সাধন করেন। তিনি নালন্দায়ও কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় একটি বড় মন্দির নির্মাণ করেন। ইন্দ্রগুপ্ত নামক জনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদকে তিনি নালন্দার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তাঁর শাসনামলে উন্নত ভাবতে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় সঞ্চীবিত হয়ে উঠে। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হলেও দেবপাল অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী কেদারমিশ্র ছিলেন একজন উচ্চবর্গের হিন্দু। দেবপালই ছিলেন যথার্থভাবে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এবং তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও গৌরবের শৈর্ষ-স্থানে উপনীত হয়।

পাল সাম্রাজ্যের অবনতি (৮৬১-৮৯৫ খ্রি.)

দেবপালের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেই পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। তথ্য-প্রমাণের অভাবের কারণে সঠিক ধারণা লাভ কঠিন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় আবিস্কৃত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, দেবপালের পুত্র ছিলেন মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল। তিনি প্রায় ১০ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে। তারপর শাসন করেন নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল। তাদের সময় রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ) পুনরুদ্ধার, অবনতি ও পাল বংশের পতন

পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দুঃসময়ে বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র মহীপাল ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি কম্বোজ এবং চন্দ্রবংশের হাত থেকে ‘অনাধিকৃত বিলুপ্ত’ পিতৃরাজ্য যেমন বিহার, উন্নর বাংলা পুনরুদ্ধার করেন। তিনি বারানসী ও সারনাথ পর্যন্ত শক্তি বৃদ্ধি করেন। তবে সেই সময় দক্ষিণাত্যের চেলরাজ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে বাংলার স্বাধীনতা প্রায় বিপন্ন হতে বসে। তিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি রাজ্য সম্প্রসারণ ও জনহিতকর কাজ এবং বৌদ্ধ তীর্থস্থানে কীর্তি স্থাপনসহ নানা কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নামে ‘মহীপাল গীত’ প্রচলিত ছিল।

মহীপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্যে আবার অশান্তি সৃষ্টি হয়। তখন বাইরের শক্তি ক্রমাগত আক্রমণ করত। ফলে শুধু বাংলা নয় বিহারেও পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের ভেতরেও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেড়ে যায়। রামপালকেই পাল বংশের ‘শেষ মুকুট’ বলে অভিহিত করা হয়। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল কিছু সময় বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য। ফলে বার শতকের শেষ দিকে সেন বংশের উত্থানের ফলে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে।

পাল যুগের গৌরব

পাল যুগে বাংলার রাজনীতি যেমন নৈরাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে চরম উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল তেমনি অর্থনৈতিক জীবনে ধ্বনিত হয়েছিল নবতর স্পন্দন। অন্যদিকে বাংলার ধর্ম, সমাজ এবং সংস্কৃতিতে যে সমন্বয়ের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল তা ছিল এক শাশ্বত অর্জন। এ সময় বাংলার জনজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে বিভাজন, হিংসা-দ্বেষ খুব একটা ছিল না। এ যুগে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়, বাংলার সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে এ সব অঞ্চলে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিকশিত হয় এক নিজস্ব ও অনন্য রীতি। সাহিত্য ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। পালরাই প্রাচীন বাংলার প্রথম দেশজ রাজশক্তি এবং তাঁরাই হচ্ছে আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের প্রাচীনতম সত্তা।

| | |
|--|--|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | শিক্ষার্থীগণ নওগাঁ জেলায় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি একটি বড় আর্ট পেপারে ছবিসহ উপস্থাপন করবেন। অথবা কম্পিউটারে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ পালবংশ ও সোমপুর মহাবিহারের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন। |
|--|--|

সারসংক্ষেপ

শশাক্ষের মৃত্যুর পর বাংলায় যে মাংস্যন্যায় বা মাছের রাজত্ব চলছিল গোপাল সেই শত বছরের অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে রাজা হন এবং পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পাল রাজা ধর্মপাল উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশ নেন। পালযুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রীকরণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীন বাংলার প্রথম দেশজ রাজশাস্ত্র এবং আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের প্রাচীনতম পাল বংশ মহীপালের সময় থেকে দুর্বল হতে থাকে। রামপালকে পাল বংশের শেষ মুকুট বলা হয়।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কোন রাজবংশ প্রায় চারশ বছর বাংলা শাসন করেন?

- | | |
|----------|----------|
| ক) গুপ্ত | খ) মৌর্য |
| গ) পাল | ঘ) সেন |

২। ধর্মপাল কোথায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন?

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক) পাহাড়পুরে | খ) মহাস্থানগড়ে |
| গ) কনৌজে | ঘ) রাজশাহীতে |

৩। কোন শাসককে পালদের মুকুটমনি বলা হয়?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক) দেবপাল | খ) মহীপাল |
| গ) রামপাল | ঘ) মদনপাল |

সূজনশীল প্রশ্ন

উদ্বীপকটি পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন

ওমপুর অঞ্চলের রাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য ভূমি দান করেন। তার মন্ত্রীও ছিলেন অন্য ধর্মের অনুসারী। এমন নানা গুণের অধিকারী তিনি আমাদের কাছে আজও স্মরণীয়।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. মাংস্যন্যায় বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্বীপকের রাজার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে আপনার পঠিত কোন পাল শাসকের কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত শাসকই ছিলেন “পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক” আপনি কী একমত? যুক্তি দিন।

পাঠ-৪.৮ বাংলায় সেন বংশের শাসন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সেন রাজবংশের পরিচয় বলতে পারবেন।
- বিজয় সেনের শাসনকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বল্লাল সেনের রাজত্বকালের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- লক্ষণ সেনের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলায় সেন রাজবংশের পতন সম্পর্কে জানতে পারবেন।



বিজয় সেন, বল্লাল সেন, কোলিন্য প্রথা, লক্ষণ সেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)



ভূমিকা

বাংলার পাল যুগের অবসানের পর বার শতকের দ্বিতীয় ভাগে সেন শাসনের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় তারা এদেশে ছিলেন বহিরাগত। সেনদের পূর্বপুরুষদের আদি বাস ছিল দাক্ষিণ্যাত্যের কর্ণাটে। বাংলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেমন্ত সেন। তিনি শেষ বয়সে কর্ণাট থেকে এসে রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি পাল রাজা রাম পালের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।

বিজয় সেন

বাংলাদেশে বিজয় সেনের সময়ই সেনবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন ১০৯৮ সাল থেকে ১১৬০ সাল পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। বিজয় সেন সম্ভবত পালরাজা রামপালের রাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলে প্রথমে সামন্তরাজা ছিলেন। বিজয় সেন পালরাজা রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। এ সাহায্যের প্রতিদানে তিনি রাঢ়ে স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করেন। পরবর্তীকালে বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলা জয় করে সেনদের ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে একটি বড় রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে বিজয় সেন তাঁর সুদীর্ঘ ৬২ বছরের রাজত্বকালে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে একক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

বিজয় সেন একজন প্রতিভাবান রাজা ছিলেন। সামান্য একজন সামন্তরাজ হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি নিজ প্রতিভা বলে বাংলার সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করেছিলেন এবং প্রায় সারা বাংলাদেশে নিজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া পালবংশের শাসনাবসানে বাংলাদেশে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তা থেকে তিনি বাংলা এবং এর অধিবাসীকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন যার সাহস ছিল অপরিসীম; সামরিক দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। তিনি পরমেশ্বরও ও মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন।

বিজয় সেন শৈব ছিলেন এবং বৈদিক ধর্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদেরকে অকাতরে দান করতেন। কবি উমাপতিধর বিজয় সেনের চারিত্রিক গুণবলির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বল্লাল সেন

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর আনুমানিক ১১৬০ সালে তার পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্য জয়ের চেয়ে দেশের ভেতরে উন্নয়ন, নতুন পথা চালু ও সংস্কারের কাজে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তবে তিনি গোবিন্দপালকে পরাজিত করে মগধের পূর্বাঞ্চল অধিকার করেন। কথিত আছে যে, বল্লাল সেন তাঁর পিতার রাজত্বকালে মিথিলা জয়

করেন। বল্লাল সেন বিদ্যান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তিনি ব্রতসাগর, আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে পাঁচটি ইন্দ্র রচনা করেন।

কৌলিন্য প্রথা ও বল্লাল সেন

কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসেবে বল্লাল সেন ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিচিত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, কৌলিন্য প্রথার সাথে বল্লাল সেনের সম্পর্কের তেমন কোনো যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই। বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায় আঠারো ও উনিশ শতকে। ব্রাহ্মণগণ এ প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এ প্রথার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি দেখানোর জন্য প্রচার করেন যে, সেন আমলে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। যদি বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করতেন, তাহলে তার উল্লেখ সে যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় অবশ্যই থাকত। কিন্তু সেন যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।

তবে সেন রাজাদের আমলে সাধারণত সম্মানীয় ব্রাহ্মণদেরকে সমাদর করার উদ্দেশ্যে জমি দান করা হতো। এরূপ জমিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকজনের কথাসহ তত্ত্বাবধান পাওয়া গেছে। বল্লাল সেন তাঁর পিতার ন্যায় শৈব ছিলেন। ধর্মপ্রচারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর পিতার অন্যান্য উপাধির সাথে ‘আরিরাজ নিঃশঙ্খর’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক ১৮ বছর রাজত্ব করার পর বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে রাজ্যভার অপর্ণ করে সন্তোষ প্রিবেণীর কাছে গঙ্গাতীরে বাণপ্রস্তু অবলম্বন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেন ও রমাদেবীর পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৭৯ সালে প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণ সেন গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশীতে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণকালে তিনি আশি বছরের বৃদ্ধ ছিলেন। গৌড় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই পুরোপুরি সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। মগধকে রক্ষা করার জন্যে এবং বাংলাকে আগলে রাখার মানসে লক্ষ্মণ সেন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না।

তবে লক্ষ্মণ সেন নিজ সাম্রাজ্যকে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে খুব একটা সুরক্ষিত রাখতে পারেননি। রাজত্বের শেষের দিকে তিনি বার্ধক্যের কারণে বেশ দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তখন রাজ্যের ভেতরে গোলযোগের বিষয়টি ধরা পড়েছিল।



বখতিয়ার খিলজি

তের শতকের প্রথম দিকে, সম্ভবত ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় অবস্থান করেছিলেন, দুর্বল লক্ষ্মণ সেন কোনো প্রতিরোধ না করে নদীপথে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় চলে যান। এর ফলে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার অধিকার করেন এবং লক্ষ্মণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণ সেনের নদীয়া ত্যাগের মাধ্যমেই বাংলায় হিন্দুশাসনের পতন হয়েছিল বলে ধরা হলেও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় লক্ষ্মণ সেন আরও কয়েক বছর রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণ সেন একজন বিদ্যান ও কবি ছিলেন। তিনি বল্লাল সেনের অসমাপ্ত অদ্ভুতসাগর সমাপ্ত করেছিলেন। তিনি কয়েকটি ইন্দ্র রচনা করেন ও তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়েছে। তাঁর রাজসভায় ডজনী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটেছিল। ভারত প্রসিদ্ধ পঞ্জিত হলায়ুধ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের পিতা ও পিতামহ শৈবধর্মের অনুরাগী হলেও তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পূর্বসূরিদের ‘পরম মাহেশ্বর’ উপাধির পরিবর্তে তিনি ‘পরমবৈষ্ণব’ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজসভায় ভারত বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের অবস্থান ছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং কৌলিন্য প্রথার জন্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল, কৌলিন্যপ্রথা বিস্তারে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। তাঁর এ ধরনের মনোভাব সমাজের অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষেত্রের সংঘর্ষের করে। তবে লক্ষ্মণ

সেনের দানশীলতা ও উদার্য মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজুন্দীনকে আকর্ষণ করেছিল। মিনহাজ তাঁর দানশীলতার সুখ্যাতি ও শাসনরীতির প্রশংসা করে তাঁকে হিন্দুস্থানের ‘খলিফা স্থানীয়’ বলে বর্ণনা করেছেন।

লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করেন। সেন শাসনামলে সর্বক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেখা দেয় অঙ্গীরতা। অনেকের মতে, ধর্ম সম্পর্কে কট্টর মনোভাব সেনদের পতন তরান্তিত করে এবং এরই সুযোগ নেয় মুসলমানেরা।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) <small>/শিক্ষার্থীর কাজ</small> | শিক্ষার্থীগণ একটি বড় আর্ট পেপারে সেন বংশের রাজাদের পরিচিতিমূলক বিষয় উপস্থাপন করবেন। |
|---|---|

৪ সারসংক্ষেপ

বাংলায় পাল যুগের অবসানের পর বার শতকের শেষের দিকে সেন বংশের শাসনের সূচনা হয়। সেন বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হেমন্ত সেন হলেও বিজয় সেনের সময়েই বাংলাদেশে সেন বংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেন বংশের অন্যতম শাসক বল্লাল সেন যিনি কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন বলে মনে করা হলেও সাম্প্রতিক গবেষণায় অনেকটা অঙ্গীর করা হয়েছে। সেন বংশের সর্বশেষ শাসক লক্ষণ সেন ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নদীয়া ত্যাগ করেন এবং বাংলায় সেন বংশের শাসনের পতন হয়।

৫ পাঠ্যের মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক) বিজয় সেন | খ) হেমন্ত সেন |
| গ) বল্লাল সেন | ঘ) বিশ্বরূপ সেন |

২। কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত কোন শাসক?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক) হেমন্ত সেন | খ) বিজয় সেন |
| গ) বল্লাল সেন | ঘ) কেশব সেন |

৩। লক্ষণ সেন নদীয়া ত্যাগ করেন কেন?

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ক) পর্যাপ্ত সৈন্যের অভাবে | খ) বখতিয়ারের সাহসিকতায় |
| গ) জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ায় | ঘ) বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে |

৪। লক্ষণ সেন কেমন শাসক ছিলেন?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক) সুদর্শন | খ) সুঠামদেহী |
| গ) সুপণ্ডিত | ঘ) সুগায়ক |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বৌ বাজারের ভূইয়া বাড়ির লোকেরা শিশুদের খেলার মাঠের খেলাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের পারিবারিক সমস্যায় প্রতিনিয়ত পারম্পরিক ঝগড়া মারামারিতে লিপ্ত ছিল এমতাবস্থায় বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা সমস্যা সমাধানকল্পে একজনকে নেতৃত্ব হিসেবে মেনে নেয় এবং এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। উদ্দীপকের ঘটনাটি পাঠ্য বইয়ে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের মৃত্যুর পর ঘটে?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক) দেবগুপ্ত | খ) গোপাল |
| গ) শশাঙ্ক | ঘ) হর্ষবর্ধন |

৬। উক্ত ঘটনাটি প্রাচীন বাংলার যে ব্যক্তির শাসকের নির্বাচিত হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ-

- | | |
|------------|-----------|
| ক) শশাঙ্ক | খ) গোপাল |
| গ) ধর্মপাল | ঘ) মহীপাল |

৭। প্রাচীন বাংলার সেন শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)

- i) অরাজকতা থেকে বাংলাকে রক্ষা করা
- ii) রাজ্য বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখা
- iii) বিদ্যা ও বিদ্বানের কদর করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i | খ) i ও ii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৮। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ রাজা লক্ষণ সেনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এর যথার্থ কারণ-

- i) তাঁর দানশীলতা
- ii) তাঁর সাহসিকতা
- iii) তাঁর উদার্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

| সেন রাজা | রাজত্বকাল |
|--------------|-----------|
| বিজয় সেন | ১০৯৮-১১৬০ |
| বল্লাল সেন | ১১৬০-১১৭৮ |
| ? | ১১৭৯-১২০৬ |
| বিশ্বরূপ সেন | ১২০৩-১২০৮ |

৯। চিহ্নিত স্থানে কোন সেন শাসক রাজত্ব করেন?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক) হেমন্ত | খ) বিজয় |
| গ) লক্ষণ | ঘ) কেশব সেন |

১০। ছক্কের কোন শাসক অদ্ভুত সাগর ও দানসাগর নামে ২টি গ্রন্থ রচনা করেন-

- | | |
|-----------|-------------|
| ক) বিজয় | খ) বিশ্বরূপ |
| গ) বল্লাল | ঘ) লক্ষণ |

ক্লিপ উত্তরমালা

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. গ ৬. খ

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১. গ ২. ক ৩. গ

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ ৫. গ ৬. খ ৭. গ ৮. খ ৯. গ ১০. গ

ইউনিট ৫

প্রাচীন বাংলার জীবনচর্যা

বাংলায় প্রাচীনকালে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক ঝলকের কিছু ধ্রুব প্রকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন যুগকে তাই রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগের সময় থেকে খ্রিস্টীয় তের শতকের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দুই হাজার বছর সময়কে প্রাচীন যুগ বলা হয়ে থাকে। সেই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কিছু দিক নিয়েই এ ইউনিটে আলোচনা করা হলো।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : প্রাচীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

পাঠ-৫.২ : প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৫.১ প্রাচীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি



এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলায় অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



জনবসতি, বর্ণপথা, নারী, কৃষি অর্থনীতি, ব্যবসায়, শিল্প, মুদ্রা, খনিজ সম্পদ

মুখ্য শব্দ (Key Words)



জনবসতি

বাংলায় জনবসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে। নানা জাতিগোষ্ঠী যেমন, নেগিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, অ্যালোপাইন, আর্য, মঙ্গোলীয়, শক, তুর্কি, আরব, পাঠান, হাবশ, কোচ, রাজবংশী, পতুগিজ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে বাংলার জনস্তোত্রে মিশেছিল। অস্ট্রিকরাই এখানে কৃষি ও পশুপালনের সূচনা করেছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুঞ্চ ইত্যাদি জনগোষ্ঠী অস্ট্রিকদের বংশধর। দ্রাবিড়দের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে।

প্রাচীন জনপদগুলোর সমাজব্যবস্থা

দলবদ্ধ জীবনই সমাজ। প্রাচীন বাংলায় কোম বা গোত্র হচ্ছে সংগঠিত প্রথম দলবদ্ধ সমাজ। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোম জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। কোমগুলো একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ ও আদান-প্রদান তেমন ছিল না। নানা ধরনের বাধা, বিধিনিষেধ ছিল। কোমবদ্ধ সমাজে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল যা ছিল একান্তই আদিম।

আদিতে শিকার, কৌম কৃষি এবং ক্ষুদ্র গৃহশিল্পই ছিল সামাজিক সম্পদের প্রধান উৎস যা কোমের সদস্যরা ভাগাভাগি করে নিত। অবশ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক আদান-প্রদান ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ছোট-বড় কোমের সমবায়ে বৃহত্তর সমাজ যেমন পুঁতি, বঙ্গ, রাঢ় ইত্যাদির উভব ঘটেছে। বাংলায় প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমগোষ্ঠী ক্ষেত্রেই বৃহত্তর শংকর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর উভব ও বিস্তার ঘটায়। প্রাচীন জনপদগুলো ছিল কৃষিপ্রধান। তবে এগুলোতে গৃহশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উভব ঘটেছিল। জনপদগুলোতে রাষ্ট্রের কিছু দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়। কারণ দুর্ভিক্ষ হলে রাজাগণ জনকল্যাণের চিন্তা থেকে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার থেকে ফসল, শস্যবীজ বিলিয়ে দিতেন। তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই বাংলাদেশে কিছুটা উত্তর-ভারতীয় নগরসভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল।

বর্ণ-প্রথা ও প্রাচীন বাংলার সমাজ

কেনো সমাজে বর্ণপ্রথা একেবারে শুরুতে থাকে না। বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তার হিসেবেই বর্ণপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে আর্যপূর্ব ও অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এ বর্ণপ্রথার ভাবাদর্শে পুষ্ট হয়েছিল। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের মতোই বাংলা ভূখণ্ড বর্ণশ্রম এবং বিভক্তির সর্বগাসী ব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র —এ চতুর্বর্ণের প্রথাকে আরো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থের লেখকরা ভূমিকা রাখেন। বিচিত্র সব বর্ণ, উপবর্ণ ও শংকর বর্ণের সামাজিক বিন্যাস এতে গুরুত্ব পায়। এভাবে বর্ণভেদ প্রথা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারে প্রতিষ্ঠা পায়। নিম্নবর্ণের ডোমদের বাস ছিল গ্রামের বাইরে। উচ্চবর্ণের লোকেরা এঁদের ছুঁতেন না।

সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান

আজও বাংলার গ্রামদেশের মেয়েদের মধ্যে যে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও কামনা-বাসনা দেখা যায়, প্রাচীন যুগের বাংলায় মোটামুটি সেই আদর্শই পালিত হতো। পাল ও সেন আমলের লিপি দেখে মনে হয় লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুন্ধরার মতো সর্বসহা, পাতিব্রত্যে অচঞ্চল নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালি নারীর আদর্শ। স্ত্রী হবেন বস্তুর মতো এবং স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় নারী পুরুষের বৈষম্য একটি সাধারণ বিষয় ছিল। তবে ধনী পরিবারের নারীদের অবস্থান গরীবদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। বর্ণপ্রথার কারণে অসর্বণ বিবাহ সমাদৃত ছিল না। পাল ও সেন আমলে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মা ও স্ত্রীদের সম্মান বেশ উঁচুতে ছিল। সুতা কাটা, তাঁত বুনা, অন্যান্য গৃহশিল্পকর্মে নিয়োজিত হতো দরিদ্র পরিবারের নারীরা। সমাজের সাধারণ নিয়ম ছিল নারীপুরুষ নির্বিশেষে একটি মাত্র বিয়ে করা। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কিন্তু বিধবাজীবন নারীদের জন্য প্রাচীন বাংলায় অভিশাপ হিসেবে ছিল। এ কারণে সহমরণ উৎসাহিত হয়। অভিজাত পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া করত। রাজপরিবারেও নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত না, ঘোমটা বা অবগুণ্ঠন সেখানেও অবধারিত ছিল। কিন্তু হতদরিদ্র ঘরের মেয়েদের শারীরিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হতো, তাই তাদের মধ্যে অবগুণ্ঠনের প্রচলন ছিল না।



তাঁত বোনা

প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি

কৃষি অর্থনীতি

প্রাচীন বাংলার একেবারে গোড়ার দিকে সম্পদের প্রধান উৎস ছিল শিকার, কৌম কৃষি এবং ছোটখাট গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত কিছুটা উন্নত ধরনের চাষবাস এবং গৃহশিল্প ছাড়াও ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে বার শতক অবধি বাঙালিগণ মূলতই কৃষি নির্ভর ছিল। প্রাচীন বাংলায় গ্রামই ছিল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। মূলত ধান, তরিতরকারি, ফলমূল, ফুল, সরিষা ও আখ চাষাবাদ করে

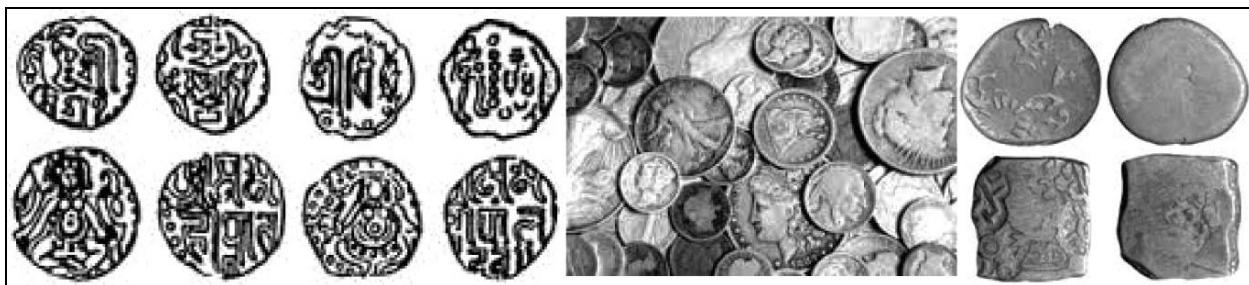
দেশের মানুষকে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। এখানে প্রচুর আখ উৎপাদিত হতো এবং আখ থেকে গুড় উৎপাদন করে বিদেশেও রপ্তানি করা হতো। কাঠ এখানকার মানুষের একটি অর্থকরী সম্পদ ছিল। সুপারি আর নারিকেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে আঁকা ছবিতে কলাগাছ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে অভিজাত ও জমিদার শ্রেণির অবস্থা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ছিল। জমির কর্তৃত্ব ছিল রাজাদের হাতে। বিভিন্ন ধরনের কর প্রদানের মাধ্যমে এসব জমি ইজারা নেওয়া হতো। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্ঘাগে ফসলহানি ঘটলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিত। প্রাচীন বাংলার মানুষ ভাত, মাছ, তরিতরকারি, দুধ, দই, ঘি, খির, মাংস, ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। তখন রানাবানায় প্রচুর মসলা ব্যবহার করা হতো। গ্রামেগঞ্জে উৎসবে পিঠা, মুড়ির প্রচলন ছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প

প্রাচীন বাংলায় শুধু দেশের ভেতরে ব্যবসায়-বাণিজ্য হতো তা নয়, বিদেশের হাটেবাজারেও জিনিসপত্র রফতানি হতো। গ্রামাঞ্চলের হাটে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের কেনাবেচা চলত। দেশের ভেতরে নৌযোগে বেচাকেনা হতো। ফলে গড়ে ওঠে হাট-বাজার, গঞ্জ ও নতুন নতুন শহর। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গা নদীর মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দর ছিল বলে জানা যায়। তৎকালীন সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ), মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রায় সুতি কাপড় ও মুক্তা রফতানি করা হতো। স্থলপথে আসাম, মায়ানমার, চীন, ভূটান, নেপালসহ বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাণিজ্যের কারণে বাংলার সম্পদ প্রাচীন যুগে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন যুগেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পেই ছিল সবচেয়ে বড় শিল্প এবং অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উপায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য চার প্রকারের বস্ত্রের কথা লিখেছেন। মৃৎশিল্পের প্রচলন ছিল। কারণ পাহাড়পুরে ও ময়নামতিতে পোড়ামাটির থালা, পানির পাত্র, দোয়াত ও প্রদীপ পাওয়া গেছে। স্বর্ণ ও মণিমুক্তার প্রচলন ছিল। কাঠ ও নৌকা শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে মাঝি, স্বর্ণকার, সূত্রধর, মণিকার, কর্মকার ইত্যাদি পেশা ও সংঘের সৃষ্টি হয়। হাতির দাঁতের শিল্পও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলায় কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, রথ, গরুর গাড়ি, নৌকা ও জাহাজ তৈরি হতো। মৌলভীবাজার জেলার ভাট্টেরা তাম্রশাসনে গোবিন্দ নামে এক কাঁসারির উল্লেখ থেকে কাঁসাশিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও ধাতুর তৈরি মূর্তি পাওয়া গেছে। লোকজন নৌকা এবং সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ব্যবসায় জড়িত ছিল। যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও নৌবহরের উপর সামরিক শক্তি নির্ভর করত।

প্রাচীন মুদ্রা ও খনিজ সম্পদ

বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ছাপকাটা মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মৌর্য যুগেও মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। কুষাণ যুগের করেকটি মুদ্রাও পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল। দীর্ঘদিন এখানে কড়িরও প্রচলন ছিল। প্রাচীন যুগে বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন পৌরুষেশ্বর একসময় হিরার জন্য বিখ্যাত ছিল। কৌটিল্য বাংলায় হিরার খনির কথা উল্লেখ করেছেন। সম্বৰত সোনারগাও, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর প্রভৃতি নামের সঙ্গে সোনার ইতিহাস জড়িত। ত্রিপুরার যে সব বাণিক ঢাকায় বাণিজ্য করতে আসত, তারা টুকরো টুকরো সোনার বদলে নিয়ে যেত প্রবাল, চুম্বক পাথর ও সামুদ্রিক শঙ্কের মালা। সমুদ্রে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত। গৌড়দেশে তখন রূপাও পাওয়া যেত। একটি পুর্থিতে রাঢ়দেশে লৌহখনির কথা আছে। লোহা দিয়ে দাঁ, কুড়াল, লাঙল, তীর, বর্ণা, তলোয়ার ইত্যাদি তৈরি হতো। তের শতকের গোড়ার দিকে জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক বাংলাদেশে এসে এখানকার দুমুখো ধারালো তলোয়ারের খুব তারিফ করেছেন।



প্রাচীন যুগের মুদ্রা

| | |
|---|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) <small>/শিক্ষার্থীর কাজ</small> | প্রাচীন বাংলার সমাজে বর্ণপ্রথাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর শিক্ষার্থীগণ একটি ছোট নাটিকা তৈরি করে ক্লাসে প্রদর্শন করবে। |
|---|---|



সারসংক্ষেপ

বাংলায় প্রথমদিকে অস্টিক, দাবিড় সহ নানা জাতিগোষ্ঠী বাস করত। এসব জাতিগোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা ছিল কোম বা গোত্র। প্রাচীন জনপদগুলো ছিল কৃষিপ্রধান। এ সমাজে যেমন ছিল উচু-নিচু শ্রেণি, তেমনি ছিল নারী-পুরুষের বৈষম্য। তবে মা ও স্ত্রীদের সম্মান করা হতো। প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক কৃষি নির্ভর ও গ্রামভিত্তিক হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের কথাও জানা যায়। বিভিন্ন যুগে মুদ্রার পাশাপাশি খনিজ সম্পদের কথাও জানা যায় যেমন, সোনা, রূপা ইত্যাদি।



পাঠ্যতার মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। প্রাচীন বাংলায় গ্রাম্য উৎসবে কিসের প্রচলন ছিল?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক) দুধ ও মুড়ি | খ) পিঠা ও পায়েস |
| গ) আম ও চিড়া | ঘ) পিঠা ও মুড়ি |

২। গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দরটির নাম কী?

- | | |
|----------|----------------|
| ক) গঙ্গে | খ) তাম্রলিঙ্গি |
| গ) মংলা | ঘ) নারায়ণগঞ্জ |

৩। প্রাচীন বাংলায় আর্য সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল-

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক) দাসপ্রথা | খ) জাতিভেদ প্রথা |
| গ) সতীদাহ প্রথা | ঘ) বর্ণভেদ প্রথা |

৪। প্রাচীন বাংলার যে শিল্প দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে- (অনুধাবন মূলক)

- | | |
|---------------|-----------------|
| ক) মৎ শিল্প | খ) বস্ত্র শিল্প |
| গ) কারু শিল্প | ঘ) বর্ণ শিল্প |

৫। প্রাচীন পুঁথিতে লোহার খনির উল্লেখ পাওয়া যায়-

- i) রাঢ় ii) বঙ্গ iii) সমতট

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৬। প্রাচীনকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে কোনটি প্রচলিত ছিল?

- | | |
|------------------|--------------------|
| ক) দাস প্রথা | খ) কর প্রথা |
| গ) বিনিময় প্রথা | ঘ) মালজামিনী প্রথা |

৭। বাংলার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কারণ কোনটিকে বলা যায়?

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ক) বাণিজ্যিক প্রসার | খ) কৃষির উন্নতি |
| গ) জীবন মাত্রার মান বৃদ্ধি | ঘ) শিল্পের উৎকর্ষতা |

পাঠ-৫.২ প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন বাংলার ধর্ম সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|-------------------------------|--|
| | ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিল্পকর্ম, ওয়ারী-বটেশ্বর, টেরাকোটা ফলক |
| মুক্ত শব্দ (Key Words) | |

বাংলার আদিবাসী মানুষের ধর্মকর্মের ছবি ফুটিয়ে তোলা কঠিন। তার ওপর একেক বর্ণ, একেক শ্রেণি, একেক কোম, একেক জনপদে ভয়ভক্তি পূজোঅর্চনার একেক রকম রূপ। একের ধারণা আর অভ্যাস কখনও অবিকলভাবে, কখনও বা তাতে রং লাগিয়ে অপরে গ্রহণ করে। এই দেয়া-নেয়ার কাজটা চলে লোকচক্ষুর আড়ালে। অবিরাম এই দেয়া-নেয়ার ফলেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলার ধর্মকর্ম। হিন্দু জন্মান্তরবাদ, পরলোকে বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির অনেক কিছুরই মূলে আছে আদিবাসীদের ধ্যান-ধারণা। গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের আদিমতম ভয়, বিস্ময়, বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদি বাঙালির ধর্মের পুরো ছবি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন যুগের এসব বিশ্বাস ও আচারে বাঙালির ধর্মের জগৎ সম্মুক্ত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার ধর্ম

খ্রিস্টপূর্ব বার শতকের আগে বাংলার লোকালয়ের বাইরে গ্রাম-দেবতার অবস্থিতি ছিল, নানা ধরনের পূজো প্রচলিত ছিল। এ সবই কোম সমাজের পূজো। চাষাবাদের সাথেও নানা ধরণের দেবদেবীর পূজো জড়িত ছিল। রথযাত্রা, স্থানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি আদি যুগেরই অবদান। প্রাক-বৈদিক যুগে কোমদের ধর্মোৎসব ছিল ব্রত যা শিবপূজা যা মধুসংক্রান্তি নামেও পরিচিত। কোমদের দেবতা ছিলেন ধর্মঠাকুর। বাংলার কৃষি সমাজে ভাল ফসলের আশায় হোলি উৎসব পালন করা হতো। এ ছাড়া মনসা পূজা, জাঙুলী দেবীর পূজা, পর্ণশবরী শারবোৎসব, ঘটলক্ষ্মী, ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি আর্যপূর্ব কোম সমাজের অবদান। তবে প্রাক-গুপ্ত যুগে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে বাংলায়। পাল যুগে বৌদ্ধ এবং সেন যুগে ব্রাহ্মণ ধর্মের জয়জয়কার অবস্থা বিরাজ করেছিল। এছাড়া পৌরাণিক ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম (হিন্দু ধর্মের বিশেষ শাখা) ও সহজিয়া ধর্মের প্রভাবও বাংলায় ঘটেছিল।

ব্রাহ্মণবাদ ও হিন্দুধর্ম

আর্যদের বিভিন্ন বিশ্বাস, পূজা-অর্চনাকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মণধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা দেব-দেবীদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রপাঠ করত, বিভিন্ন ফল, দুধ, ঘি, শস্য, রস, মাংস আভৃতি দিত। মূলত দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। পরে বলিদান অনুষ্ঠান পালনের জন্য পুরোহিত সম্প্রদায়ের উত্তর ঘটে এবং সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বড় হয়ে ওঠেন। সেন আমলেই বাংলায় বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণের উত্তর হয়। এই রাজবংশের রাজারা মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণদের আনিয়ে তাদের জমি দান করে পূজোঅর্চনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর্যদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। এটি লিখিত ছিল না। বহুকাল মানুষ মুখে মুখে যা বহন করে আনে। পরে তা খন্দেদ গ্রন্থ লেখা হয়। বেদ মানে হচ্ছে ‘জ্ঞান’। পুরোহিতরা অনেকেই বিশ্বাসের দিক থেকে দেবতার চেয়েও বেশি ক্ষমতার আসন লাভ করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্র দায়িত্বকে সমাজে মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসে স্থান দেয়ার নামই হচ্ছে ব্রাহ্মণবাদ। এটি একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমাজে চারটি শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শ্রেণীভেদ প্রথার ফলে ব্রাহ্মণরা বৈশ্য ও শূদ্রদের হেয় জ্ঞান করে। এর থেকেই এক সময় নিম্ন বর্ণের মানুষেরা জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেন যুগে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের স্থান দখল করে নেয়। তবে হিন্দু ধর্ম কোনো একক ধর্ম নয়, এটি অসংখ্য বিশ্বাস, আচার ও আনুষ্ঠানিকতার সমন্বয়ে গঠিত সনাতন ধর্ম। তবে এতে তিনটি বিষয়ে মিল লক্ষ করা যায়-

(১) গাভী ভঙ্গি, (২) আত্মার পুনর্জন্ম এবং (৩) ব্রাক্ষণদের নেতৃত্ব। হিন্দুধর্ম তিনভাবে দেবতা বিশ্বাস করে- (১) স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা, (২) সংরক্ষক হচ্ছে বিষ্ণু ও (৩) শিব হচ্ছেন ধ্বংসকারী। মানুষ এবং প্রাণির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই বলে বিশ্বাস করা হয়। কেননা, উভয়েরই আত্মা আছে। এ কারণেই গরু, হাতি ও কুমির ইত্যাদি প্রাণিকে হিন্দুধর্মের অনুসারীরা দেবত্তের সম্মান দেন। সেন বংশের রাজত্বকালের রাজারা ছিলেন ব্রাক্ষণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। বর্মণ বংশের রাজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। নানা বিশ্বাস, বিভাজন, আচার, পূজা, দেবদেবী, লৌকিকতা মিলিয়ে বাংলায় হিন্দুধর্ম ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যথেষ্ট স্বকীয়তা নিয়ে প্রাচীন যুগের শেষ বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার হিন্দু সমাজের কাছে দুর্গাপূজা সার্বজনীন পূজোৎসব হয়ে আছে।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর-বাংলায় জৈন ধর্মের প্রসার হয়েছিল। আর মৌর্য সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার বাংলাদেশের হস্তয় জয় করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পুণ্ডুবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনের বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন বাংলায় এসেছিলেন। হিউয়েন সাঙ বাংলায় এসেছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি দেখেছেন, সমতটের ত্রিশটি বিহারে দু-হাজার শ্রমণের বাস। অষ্টম শতকে পাল যুগে বাংলাদেশের বৌদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুখ্যাত বৌদ্ধবিহারগুলো ঐ পর্বের বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে। আচার্যগণ জ্ঞান-সাধনা এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন যার অধিকাংশই তিব্বতি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মেরও রূপ বদলে সহজিয়া পরিচয় লাভ করেছে। বাংলার আউল-বাউলরা বাংলার সেই সহজিয়া ধর্মেরই ধারক-বাহক। সেন-বর্মণ পর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণ্য ধর্মের এই দ্঵ন্দ্ব-সংঘাত অনেক দিনের। ব্রাক্ষণেরা বৌদ্ধদের বলেছেন ‘পাষণ্ড’ যা সংঘর্ষের প্রমাণ। বৌদ্ধধর্ম ব্রাক্ষণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধ বিহারে এর পরেও যা অবশিষ্ট ছিল, বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে তুর্কি আক্রমণের মুখে তাও ধূয়ে মুছে গেল।

শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতি

প্রাচীন বাংলার শিল্পকর্ম

বাংলার শিল্পকলার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। বাংলার শিল্পরীতির প্রাচীন ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ত্র্যায় শতক থেকে। ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিহার। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত বিহারগুলো ছিল মূলত ভিক্ষুসংঘের বাসগ্রহ। প্রত্ন-খননের ফলে মুর্শিদাবাদের রাসামাটির নিকটে, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে এবং কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলে কতকগুলো বিহার আবিস্কৃত হয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত হয়েছে বাংলার অন্যতম প্রাচীন নগর পুঁৰনগর। এখানে বাংলার প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার নানা নির্দর্শন মেলে। প্রাচীনযুগের ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক ও স্থাপত্য নির্দর্শন উৎঘাটিত হয়েছে।

আট শতকে ধর্মপাল বরেন্দ্রীতে এক বিশাল ও সুউচ্চ মন্দির স্থাপনের লক্ষ্যে সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন বলে অনুমান করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ এই বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীতে এ যুগের শৈলিক উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুর বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানায় অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশের সবচেয়ে বড় প্রত্নস্থল ময়নামতি। সাত থেকে এগারো শতকের মধ্যে লালমাই পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বৌদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্র। এখানে রয়েছে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার ও ভোজবিহার। খড়গ, দেব ও চন্দ্ৰবংশীয় রাজাদের কীর্তি আমাদের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। দেব রাজাদের রাজধানী দেবপৰ্বত লালমাই এলাকাতেই অবস্থিত ছিল। ময়নামতির প্রত্নসামগ্রী দক্ষিণ পূর্ব বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে।

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রত্ননির্দর্শনাদি প্রাচীন বন্দরনগরী তাম্রলিঙ্গি বলে সনাক্ত হয়েছে। তাম্রলিঙ্গিকে অনেকেই গ্রিক, লাটিন বিবরণীর “গাঙ্গে” বন্দর বলে মনে করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়িডঙ্গায় আবিস্কৃত হয়েছে রঞ্জমৃতিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ, আর এই ধ্বংসাবশেষের পাশেই ছিল শশাক্ষের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বানগড় বহন করছে অধিষ্ঠান কোটিবর্ষ নগরের চিহ্ন।

তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা : ওয়ারী-বটেশ্বরের আবিষ্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অজয়, কুনুর ও কোপাই বদ্দেশ্বর নদীর তীরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ অঞ্চলে তাম্র যুগের নির্দশন আবিষ্কৃত হয়। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত



ওয়ারী-বটেশ্বর

নির্দর্শনসমূহ থেকে বলা যায় যে,

প্রায় ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে যে সভ্য জাতির বাস ছিল তার সমসাময়িক কালে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলেও উন্নত সভ্যতা ছিল।

বাংলাদেশের নতুন প্রত্নস্থলের নাম ওয়ারী-বটেশ্বর। ঢাকা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে নরসিংহী জেলার বেলাব উপজেলায় ওয়ারী বটেশ্বরের অবস্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদ দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর ভাষ্য অনুসারে সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী কিছু নির্দশন এখানে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায় ওয়ারী বটেশ্বরকে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে মতভেদ থাকলেও সবাই মনে করছেন প্রাচীন সভ্যতার নতুন দিক উন্মোচিত হতে চলেছে। খনন ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস হয়ত ভবিষ্যতে নতুন করে লিখতে হবে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মন্দির ও টেরাকোটা ফলক

বাংলাদেশের শিল্পকলার ঐতিহ্য প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। স্থাপত্য বা স্তুপ হলো বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি নির্দশন। বৌদ্ধগণই স্তুপ-নির্মাণের রীতিকে গ্রহণ করে পৃজা-অর্চনায় এবং ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এ রীতিকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। বৌদ্ধ-প্রধান অঞ্চল ময়নামতিতে দশ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত স্তুপ পাওয়া গেছে। বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট রীতির স্থাপত্য-নির্দশন হল মন্দির। ময়নামতিতে মন্দিরের জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যাচ্ছে। শালবন বিহারের কেন্দ্রিয় মন্দিরটির প্রত্যেক বাহু ১৭০ ফুট দীর্ঘ। প্রাচীন যুগের কয়েকটি মন্দিরই জীর্ণ ও ভগ্ন শরীরের বিদ্যমান।



পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলক

প্রাচীন বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি ভাস্কর্য শিল্পের চর্চাও হতো। মহাস্থান, তমলুক ইত্যাদি স্থানে গুপ্ত যুগের আগের কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরের ভাস্কর্যে রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহিনী খোদিত আছে। প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটির কাজ জনপ্রিয় ছিল। কানামাটি দিয়ে নির্দশন তৈরি করে রোদে শুকিয়ে পোড়ালে পরিবর্তিত যে রূপ তাকে আমরা সাধারণত পোড়ামাটির কাজ বলি। নাগরিক জীবনে এ পোড়ামাটির ল্যাটিন প্রতিশব্দ ‘টেরাকোটা’ শব্দটি ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রচলিত অর্থে টেরাকোটা বলতে মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির পুতুল ও ক্ষুদ্রাকার অস্থাবর ফলক এবং দেয়ালগাঁথে অলংকরণের জন্য পোড়ামাটির ফলককে বুঝানো হয়। ময়নামতি, পাহাড়পুর ও ভাসুবিহারের মতো ধর্মীয় চেতনায় নির্মিত স্থাপত্য দেয়ালের টেরাকোটা ফলকে লোকায়ত জীবনের উপস্থাপনা, মানবিক কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) <small>/শিক্ষার্থীর কাজ</small> | শিক্ষার্থীগণ ওয়ারী-বটেশ্বর এর উপর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট সংগ্রহ করবে এবং নিজেদের মধ্যে এসব বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করবে। |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বাংলায় নানা ধরনের ধর্ম প্রচলিত ছিল। প্রাক-বৈদিক যুগে কোমদের ধর্মোৎসব ছিল শিবপূজা। প্রাক গুপ্ত যুগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটে। পাল যুগে বৌদ্ধ এবং সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার দেখা যায়। এ সময়ের বাংলার শিল্পকর্মে যেমন ভাস্কর্য, টেরাকোটার সন্ধান পাওয়া যায়। তেমন এর মাধ্যমে লোকায়ত জীবনের উপস্থাপনা, কল্পনা, ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। শিল্পকর্মের সবচেয়ে বড় নির্দর্শন মহাস্থানগর। ওয়ারী বটেশ্বরে পাওয়া গেছে আরো প্রাচীন নির্দর্শন।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। পাল যুগে কোন ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে?

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক) ব্রাহ্মণধর্ম | খ) বৌদ্ধধর্ম |
| গ) জৈনধর্ম | ঘ) খ্রিস্টানধর্ম |

২। দেব পর্বত কোথায় অবস্থিত?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক) পুন্ড্রনগরে | খ) চন্দ্রদ্বীপে |
| গ) পাহাড়পুরে | ঘ) ময়নামতিতে |

৩। ওয়ারী বটেশ্বর আবিক্ষার, প্রমাণ করে-

- i) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল গ্রাম কেন্দ্রীক
- ii) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল নগর ভিত্তিক
- iii) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল উন্নত সভ্যতার ধারক

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৪। কুমিল্লা জেলার কোথায় ব্রাঞ্জি নির্মিত স্তূপ পাওয়া গেছে?

- | | |
|------------------|---------------|
| ক) মোহনপুরে | খ) মুরাদনগরে |
| গ) রামচন্দ্রপুরে | ঘ) ময়নামতিতে |

৫। হিউয়েন সাঙ বাংলায় এসেছিলেন কবে?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক) ৬০৬ খ্রি: | খ) ৬১৯ খ্রি: |
| গ) ৬৩৭ খ্রি: | ঘ) ৬৩৯ খ্রি: |

উত্তরমালা

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন- ৫.১ : ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. ক ৬. গ ৭. খ

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন- ৫.২ : ১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ

ইউনিট ৬

মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

ভূমিকা

তের শতক থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল তা ছিল রাজতান্ত্রিক। ১২০৪ সালে ইথতিয়ার উদীন মুহুমদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। যার ফলে বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমাগতভাবে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে তখন সুলতানি বা নবাবি শাসন ইত্যাদি যে নামে বাংলাকে পরিচিত করা হোক না কেন দেশটা চলত একজন শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। এখানে সরকার বলতে সুলতান বা রাজাকে বুবানো হতো। তাদের ছিল একক কর্তৃত্ব। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুলনায় মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক, এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অগণতান্ত্রিকও। রাষ্ট্র শাসনে ধর্মীয় প্রভাব একচ্ছত্র ছিল। তবে পৃথিবীর সব দেশ বা জাতি মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পার হয়েই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পৌঁছেছে। বাংলাকেও আমরা তের শতক থেকে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে দেখেছি। এই ইউনিটে মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ-৬.১ : বখতিয়ার খলজি ও বাংলায় তুর্কি শাসন
- পাঠ-৬.২ : ইলিয়াস শাহ ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন
- পাঠ-৬.৩ : হোসেন শাহী বংশের অধীনে বাংলা
- পাঠ-৬.৪ : বাংলায় মোগল শাসন ও বার ভূঁইয়া



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-৬.১ বখতিয়ার খলজি ও বাংলায় তুর্কি শাসন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বখতিয়ার খলজির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বখতিয়ার পরবর্তী খলজি ও তুর্কি শাসন সম্পর্কে বর্ণনা পারবেন।

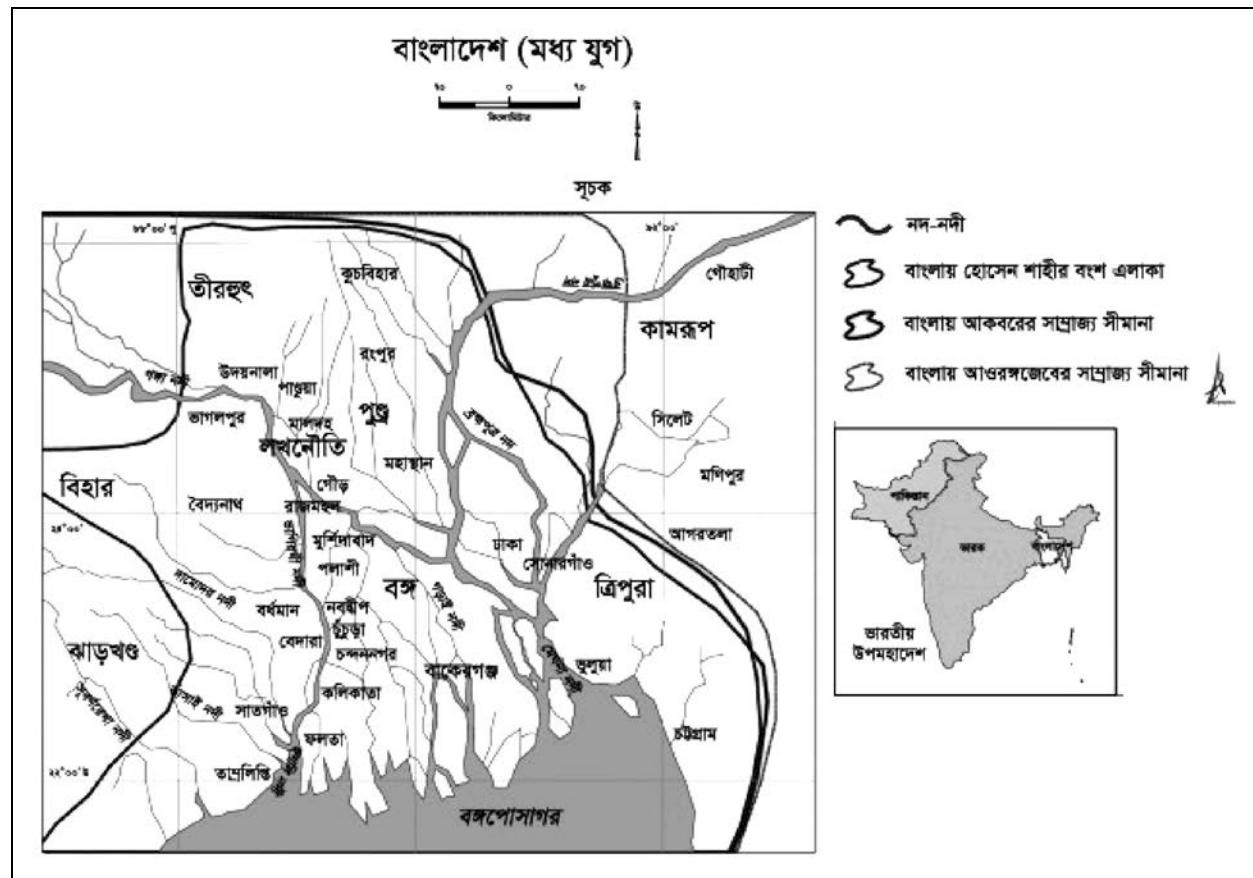


মুখ্য শব্দ (Key Words)

বখতিয়ার খলজি, নদীয়া, লখনৌতি, ইওয়াজ খলজি, গিয়াসউদ্দিন বলবন, তুগ্রিল খান।

বখতিয়ার খলজির জীবন সংগ্রাম ও উত্থান

ইখতিয়ার উদীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি তের শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের একাংশে (প্রধানত নদীয়ায়) মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম ধর্মের মোড়কে বাংলায় মুসলিম সভ্যতার আগমন এ দেশের ঐতিহ্যবাহী সমাজ, সংস্কৃতি তথা সামাজিক জীবনধারায় গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। সৃচিত হয় এক গভীরতর সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সংঘাতের ধারা।



বখতিয়ার খলজি আফগানিস্তানের গরমশীরের (দন্ত-ই-মার্গ) অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে তিনি গজনিতে উপস্থিত হয়ে শিহাবউদ্দীন ঘূরীর অধীনে সৈন্যবিভাগে চাকুরি প্রার্থী হন। তবে শারীরিক কারণে তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়। গজনিতে বিফল হয়ে তিনি দিল্লিতে চলে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীন আইবেকের কাছে চাকুরি প্রার্থী হন। কিন্তু কুতুবউদ্দীন আইবেকও তাঁর কদাকার চেহারার জন্য তাঁকে সৈন্যবিভাগে চাকুরি দিলেন না। অতঃপর বখতিয়ার বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দীন তাঁকে নগদ বেতনে একটি ছেট চাকুরি দেন। তবে অল্প বেতনের এ ছেট চাকুরিতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই তিনি চলে গেলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসামউদ্দীন বখতিয়ার খলজিকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন এবং তাঁকে বিউলী ও ভাগওয়াত নামে দুটি পরগনার জায়গির প্রদান করে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় পাঠিয়ে দেন। মির্জাপুরে জায়গির প্রাপ্তির ফলে বখতিয়ার খলজির জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কারণ, এ অঞ্চলই তাঁর শক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠে। এই সময়ে তাঁর সাহস আর উদ্যমের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে চারদিক থেকে ভাগ্যাব্লেষণকারী মুসলমানগণ বখতিয়ার খলজির সাথে যোগ দিতে থাকে ও তাঁর সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

বিহার আক্রমণ ও নদীয়া বিজয়

বখতিয়ার খলজি শক্তি সম্পর্ক করে আনুমানিক ১২০৩ সালে বৌদ্ধদের একটি আশ্রম ও দন্তপুরি বিহার আক্রমণ করেন। এটি ছিল বৌদ্ধদের বিহার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত থাকায় বখতিয়ার খলজি আশ্রমটিকে দুর্গ মনে

করে অবরোধ করেন এবং বিনা পরিশ্রমেই এটি অধিকার করেন। এ বিহারের নামানুসারেই মুসলমানগণ এ অঞ্চলের নাম দেন বিহার। আজও এ অঞ্চল বিহার নামেই পরিচিত।

বখতিয়ার খলজি বিহার দখল করার পর বাংলার দৃষ্টি দেন। এ সময় বাংলার রাজা ছিলেন সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন। তিনি তখন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। মতভেদের প্রধান কারণ হলো যে, সমসাময়িক সূত্রে নদীয়া আক্রমণের তারিখ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ সবদিক বিচার করে বলছেন বখতিয়ার খলজির ১২০৪-০৫ সালে শীতকালীন সময়ে নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন।

বখতিয়ার খলজি যখন বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তখন বাংলাদেশে প্রবেশ সহজ সাধ্য ছিল না। তখন বাংলাদেশে প্রবেশের তিনটি পথ ছিল যথা : ত্রিভূতের পথ, তেলিয়াগার্হির পথ ও ঝাড়খণ্ডের পথ। ত্রিভূতের পথে কয়েকটি খরচ্ছাতা নদী থাকায় এ পথে কোনো অভিযান পরিচালনা করা খুবই কঠিন ছিল। তেলিয়াগার্হির পথও ছিল বেশ সংকীর্ণ। তবে এ পথেই তখন সাধারণত উত্তর ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করত। ত্রুটীয় পথটি ছিল ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে এবং সবচেয়ে বিপদসঞ্চূল। বাংলাদেশে প্রবেশের পথসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনা করে বাংলাদেশের রাজাগণ তেলিয়াগার্হির পথকেই বিশেষভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতেন। বখতিয়ার খলজি শুধু দুর্ধর্ষ যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি একজন কৌশলী সমরবিদও ছিলেন। তাই তিনি তেলিয়াগার্হির পথে না এসে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। তিনি বিরাট বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে নিজে একটি ছোট দলের অগ্রভাগে ছিলেন। কথিত আছে যে, বখতিয়ার খলজি এতই ক্ষিপ্তার সাথে অগ্রসর হয়েছিলেন যে, তাঁর সাথে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক তাল রেখে আসতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি যখন নদীয়া পৌঁছলেন, তখন লোকেরা ভাবল যে, কিছু ঘোড়াব্যবসায়ী হয়ত রাজ দরবারে যাচ্ছে। বখতিয়ার খলজি কোথাও কোনো বাধা না পেয়ে সোজা রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে গিয়ে উপস্থিত হন। ফলে প্রাসাদ-রক্ষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল এবং যেদিকে পারল ছুটে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে লাগল। ইতোমধ্যে বখতিয়ার খলজির মূল সৈন্যবাহিনীও শহরের ভেতরে পৌঁছে যায়। এ সময় রাজা লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছিলেন। খবর পেয়ে তিনি ধরে নেন যে, তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছে। তাই তিনি খালি পায়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে নদীপথে পূর্ব-বাংলার বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের বিপুল ধন-সম্পদ বখতিয়ার খলজি লাভ করেন। এভাবে নদীয়া অধিকারে করেন বখতিয়ার খলজি।

লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন ও তিব্বত আক্রমণ

নদীয়া দখলের পর বখতিয়ার খলজি গৌড় বা লক্ষণাবতীর দিকে যাত্রা করেন। তিনি লক্ষণাবতী অধিকার করে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এটি মুসলমান আমলে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশে বখতিয়ার খলজি রাজ্য পূর্বে তিঙ্গা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী ও উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর অবধি ছিল। বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ কাজ তিব্বত আক্রমণ। তবে এ অভিযান সফল হয়নি।

বখতিয়ার খলজির একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। অতি সাধারণ অবস্থা থেকেই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নিজ প্রতিভাবলে লখনৌতিতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের বড় কৃতিত্ব। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের মতে, তিনি কর্ম্য, নির্ভীক, সাহসী, বুদ্ধিমান, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিজিত এলাকায় খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন এবং সমগ্র এলাকাকে তাঁর সহকর্মী তুর্কি খলজি আমীরদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

পরবর্তী খলজি শাসন

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর খলজি মালিকদের মধ্যে কলহ শুরু হয়। এরপর তিনজন শাসক স্বল্প সময়ের জন্য বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১২-১২২৭ খ্রি.) বাংলার শাসন, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখেন। তিনি বাংলার মুসলিম রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই নবগঠিত রাজ্যের সীমানা বিস্তারে অবদান রাখেন। নদীমাত্রক বাংলায় যুদ্ধ জয়ের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙালি নাবিকদের সহায়তায় যুদ্ধ জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি সুশাসক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি দিনাজপুরের দেবকোট থেকে লখনৌতিতে আবার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, একই সঙ্গে একটি দুর্গ স্থাপন করে রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি পূর্ববাংলা আক্রমণ করে সেখানে তার আধিপত্য বিস্তৃত

করেন। বলা চলে বাংলায় তিনি দিল্লির সমান্তরাল আর একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন যা দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের পচন্দ হয়নি। ইলতুতমিশ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদকে ইওয়াজ খলজির বিরুদ্ধে লখনোতিতে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে ইওয়াজ খলজি পরাজিত ও পরে নিহত হন। তখন ইলতুতমিশ নাসির উদ্দিন মাহমুদকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এর ফলে ১২২৭ সালে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বাংলায় তুর্কি শাসন

এ সময় থেকে বাংলার শাসনকর্তারা দিল্লির সুলতানদের কাছ থেকে নিয়োগ লাভ করে এখানকার শাসক হতেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই জাতিগত পরিচয়ে তুর্কি ছিলেন। ১২২৭ থেকে ১২৮১ সাল পর্যন্ত তেমন ১৫ জন তুর্কি শাসক বাংলা শাসন করেছিলেন। তবে বাংলায় দিল্লির অনুগত কোনো শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং দিল্লির মনোনীত তুর্কি শাসকরাই একের পর এক বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। দিল্লির শাসকরা যেমন, ইলতুতমিশ, বলবন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাংলার শাসকদেরকে প্রতিহত করতে একের এর এক অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। এর ফলে দিল্লির শাসনকালে বাংলায় বিশ্বঙ্গী ও গোলযোগ লেগেই ছিল। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলার তৎকালীন স্বাধীন শাসক তুগ্রিল খানকে দমনের জন্য নিজেই আক্রমণ (১২৮০-৮১ খ্রি.) করেন। যুদ্ধে তুগ্রিল খান নিহত হন। ফলে বাংলা দিল্লির শাসনাধীন হয়।

১২৮৭ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মারা গেলে বঝরা খান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে ১২৯০ সাল পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩২৫ সালে দিল্লির শাসক গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা অধিকার করেন।

| | |
|--|--|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) <small>/শিক্ষার্থীর কাজ</small> | শিক্ষার্থীগণ বখতিয়ার খলজির সংগ্রামমুখের জীবন এবং তার বাংলা বিজয়ের উপর একটি সচিত্র গল্প রচনা করবেন। |
|--|--|

পাঠ্য সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। যদিও তার জীবনে অনেক প্রতিকূল পথ পেরিয়ে সফল হন। নদীয়া দখল করে লখনোতিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর খলজি বংশের শাসন দুর্বল হতে শুরু করলে ১২২৭ সাল থেকে বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠ্য পাঠ্য মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। (কোন তুর্কি বীর) বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন কে?
 - ক) বখতিয়ার খলজি
 - খ) আলী মর্দান খলজি
 - গ) শিরান খলজি
 - ঘ) ইওয়াজ খলজি
 - ২। বখতিয়ার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
 - ক) পাকিস্তান
 - খ) আফগানিস্তান
 - গ) ইরান
 - ঘ) তুরস্ক
 - ৩। বখতিয়ার কুতুবউদ্দিনের সৈন্য বিভাগে চাকুরি লাভে ব্যর্থ হন কোন অবস্থার জন্য?
 - ক) শারীরিক
 - খ) মানসিক
 - গ) অর্থনৈতিক
 - ঘ) সামাজিক
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আজ ২২ নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস, এদিন চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এলাকায় বেশ কিছু সমরান্তরসহ যুদ্ধ জাহাজ জনগণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়। আয়েশা দাদুর সাথে নৌবাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ঘুরে ঘুরে দেখে। এসময় তার মধ্য যুগের এক খলজি শাসকের কথা মনে পড়ে যিনি নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছিলেন।

৪। উদীপকের আয়শার কোন খলজি শাসকের কথা মনে পড়ে?

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ক) বখতিয়ার খলজ | খ) শিরান খলজ |
| গ) গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজ | ঘ) আলী মর্দান খলজ |

৫। উক্ত শাসকের নীতি ছিল-

- | | |
|------------------------------|----------------|
| i) রাজ্য সম্প্রসারণ | খ) ii ও iii |
| ii) রাজ্যের নিরাপত্তা | |
| iii) ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি | ঘ) i, ii ও iii |
- নিচের কোনটি সঠিক?
- | | |
|------------|-------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
| গ) i ও iii | |

সূজনশীল প্রশ্ন

হোমারের ইলিয়ড মহাকাব্য থেকে নেওয়া গল্পে নির্মিত চলচিত্রে, ট্রয় নগরীর ধ্বংস দেখছিল আকরাম, এক পর্যায়ে দেখা গেল যুদ্ধের কৌশল হিসেবে একজন সেনাপতি তাঁর যোদ্ধাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন। অতঃপর নিজে ১টি ছোট দল নিয়ে জঙ্গলপথে অগ্রসর হয়ে বিপক্ষ দলের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও দখল করে নেয় যদিও বাকি দলগুলো পেছনেই ছিল।

ক. কোন অভিযান ছিল বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ সমর অভিযান?

খ. ইওয়াজ খলজি তার রাজধানী লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন কেন?

গ. উদীপকের সেনাপতির যে কৌশল গ্রহণ করেছেন তা পাঠ্য বইয়ের কোন সেনাপতির কর্মের প্রতিফলন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. আপনি কী মনে করেন, উক্ত সেনাপতি প্রথম জীবনে ব্যর্থ হলেও ভাগ্য নয় কর্মগুণই তাকে সাফল্য এনে দেয়? যুক্তি দেখান।

পাঠ-৬.২ ইলিয়াস শাহ্ ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহ্ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইলিয়াস শাহের রাজ্য জয়, সুশাসন ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে উদারনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সিকান্দর শাহ্, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ ও রাজা গণেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

ইলিয়াস শাহ্, ফিরঞ্জ শাহ তুঘলুক, রাজমালা, বাঙালা, সিকান্দর শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, রাজা গণেশ



ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলাদেশে প্রায় ১২২ বছর শাসন করেন। এ বৎশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসুদ্দীন বাংলাদেশকে একত্রো করতে পারেননি। তাই এ আমল থেকেই সমগ্র বাংলাদেশে ‘বাঙালা’ নামে পরিচিত হয় এবং অধিবাসীরা পরিচিত হয় ‘বাঙালি’ নামে। ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ স্থানীয় জনগণের মন জয় করার জন্য উদারনৈতিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁরা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে সবাইকে শাসনকার্যে ও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন। তাঁরা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর এবং দেশীয় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁদের উদার নীতির ফলে বাংলাদেশে সামাজিক জীবনে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ আরবদেশ, চীন ও পারস্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইলিয়াসশাহী আমলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

অবশ্য ইলিয়াস শাহী বৎশের শাসন সূচনার কিছু সময় আগে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগ শুরু হয়। ফখরুন্দিন মুবারক শাহ ১৬৩৮ সালে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী হয় সোনারগাঁও। একই সময় আলাউদ্দীন আলী শাহ পশ্চিম বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫২ সালে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখলের মাধ্যমে দুই বাংলা একত্র করেন।

ইলিয়াস শাহের সিংহাসন লাভ ও রাজ্য বিস্তার

ইলিয়াস শাহ ইরানের অধিবাসী ছিলেন। ইলিয়াস শাহ কীভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। ইলিয়াস লখনৌতির শাসনকর্তা আলী মুবারকের ধাত্রীমাতার পুত্র ছিলেন। পরে আলী মুবারক বাংলাদেশে চলে আসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খানের প্রধান সেনাপতি হন। কদর খান নিহত হওয়ার পর আলী মুবারক লখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করেন এবং ইলিয়াস বাংলাদেশে এসে আলী মুবারকের অধীনে উচ্চ পদে কাজ করেন। কিছুদিন পর ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস আলী মুবারককে হত্যা করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইলিয়াস শাহ যখন সিংহাসনে বসেন তখন পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ তার রাজ্যের বাইরে ছিল। তিনি প্রথমে সাতগাও দখল করেন। এরপর ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করেন ও প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন। ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও অধিকার করে সারা বাংলাদেশের সুলতান হন। তাঁর পূর্বে আর কোনো সুলতান এ গৌরব অর্জন করতে পারেননি। তাই ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাঁকে ‘শাহ-ই-বাঙালাহ’ ও ‘সুলতান-ই-বাঙালাহ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে ইলিয়াসশাহ জাজনগর (ডিঙ্গি) আক্রমণ করেন এবং ৪৪টি হাতিসহ অনেক ধনসম্পদ লাভ করেন। এরপর তিনি বিহার আক্রমণ করেন এবং আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করে তাঁর রাজ্যভূক্ত করেন।

ফিরঞ্জ শাহ তুঘলকের সাথে দ্বন্দ্ব

ইলিয়াস শাহের সামরিক সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হয়েন। কারণ দিল্লির সুলতান ফিরঞ্জ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ সালে বাংলাদেশের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। ইলিয়াস শাহের নৌবাহিনী দিল্লির বাহিনীকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে। তবে সুলতান ফিরঞ্জ শাহ অন্যথে অগ্রসর হয়ে কুশী নদী অতিক্রম করেন। এ খবর পেয়ে ইলিয়াস শাহ রাজধানী

পাঞ্চায় ফিরে একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ দুর্গটি যেমন ছিল দুর্ভেদ্য তেমনি ছিল দুর্গম। এর তিনদিকে ছিল নদী এবং অন্যদিকে ছিল ঘন জঙ্গল। তাই ইলিয়াস শাহ বুঝেছিলেন যে, দিল্লি বাহিনীর পক্ষে একডালা দুর্গ জয় করা সম্ভব হবে না। ফিরুজ শাহ একডালা দুর্গ আক্রমণ করেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেও দুর্গটি অধিকার করতে পারেননি। অবশেষে ফিরুজ শাহ ইলিয়াস শাহের সাথে সন্ধি স্থাপন করে ফিরে যান। সন্ধির শর্তানুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে পরবর্তিকালে প্রতিবছর দৃত ও উপহার বিনিময় হতো। এর ফলে ইলিয়াস শাহের রাজনৈতিক গৌরব বৃদ্ধি পায়।

ত্রিপুরা ও কামরূপ অভিযান

ফিরুজ শাহের প্রত্যাবর্তনের পর ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে মনোনিবেশ করেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত রাজমালা থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরার রাজা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রাত্ত-ফাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। কিন্তু, রাজার মৃত্যুর পর অন্যান্য ভাই রাত্ত-ফাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাড়িয়ে দেন। রাত্ত-ফা বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ইলিয়াস শাহ তাকে পুনরায় ত্রিপুরার সিংহাসন বসান এবং রাত্ত-ফাকে মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন। ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কামরূপের কিছু অংশ জয় করেন।

সুশাসন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার নীতি

ইলিয়াস শাহ সম্ভবত প্রথম সুলতান যিনি স্থানীয় লোকদেরকে অধিক সংখ্যায় সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করেন। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুরা উচ্চপদে নিয়োগ লাভ করে। তিনি মুসলমান সুফি এবং দরবেশদের মতো হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকেও বৃত্তি প্রদান করতেন। শাসনব্যবস্থায় সুলতান সর্বেসর্বী হলেও তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টা ছিল। তাঁরা প্রয়োজনে সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল একত্র করে সারা বাংলাদেশের একচ্ছত্র স্বাধীন সুলতান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল থেকেই সারা বাংলাদেশের নামকরণ হয় বাঙ্গালা এবং এর অধিবাসীরা পরিচিতি হয় বাঙালি নামে। ইলিয়াস শাহ একজন অভিজ্ঞ কুটনীতিবিদও ছিলেন। ইলিয়াস শাহ যখন দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছে তখন তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। আবার সুলতান যখন সন্ধির প্রস্তাব করেছেন তখন তিনি তা উপেক্ষাও করেননি। সন্ধি স্থাপনের পর ইলিয়াস শাহ দৃত ও উপটোকন প্রেরণ করে দিল্লির সুলতানের সাথে মিত্রতা রক্ষা করেন।

সিকান্দর শাহ ও গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ৩৪ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর এ সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সিকান্দর শাহ সুশাসক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি সুফি ও দরবেশদেরকে শুন্দা করতেন। সুফি শেখ আলাউল হক ও শেখ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়ার সাথে সিকান্দর শাহের সৌহার্দ্য ও পত্রালাপ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং তার সময় তৈরি আদিনা মসজিদ মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন।



আদিনা মসজিদ

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ ১৩৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল নাম কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্যাতি ও সাফল্যের বিচারে তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিজে বিদ্঵ান ছিলেন। তিনি বিদ্঵ান, কবি ও সাহিত্যিকদের সমাদর ও শুন্দা করতেন। তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন। ইরানের কবি হাফিজের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্য ইউসুফ জোলেখা রচনা করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর পিতা ও পিতামহের মতই মুসলমান সুফি ও দরবেশদেরকে ভক্তি করতেন। তাঁর সমসাময়িক

সুফিদের মধ্যে শেখ নূর কুতুব আলম প্রসিদ্ধ ছিলেন। চৈনিকসূত্র থেকে জানা যায় যে, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ চীন সম্ভাটের নিকট দৃত ও উপহার পাঠিয়েছিলেন। চীন সম্ভাটও বাংলাদেশের সুলতান ও তাঁর স্ত্রীর জন্য উপচৌকন প্রেরণ করেন।

রাজা গণেশ ও ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন (দ্বিতীয় পর্ব ১৪৩৬-১৪৮৭)

ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম পর্বের শাসনের পর বাংলার সিংহাসনে রাজা গণেশের উত্থান ছিল আকস্মিক ও বিস্ময়কর। একজন জমিদার হিসেবে বাংলার সুলতানের দরবারে তাঁর প্রভাব ও আসা-যাওয়া ছিল। তিনি সুলতানের একজন ঘনিষ্ঠ আমাত্য ছিলেন। শিহাবুদ্দিন নিহত হলে স্থিত শূন্যতার সুযোগে তিনি বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। গণেশের শাসনের শুরুতেই মুসলিম দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। দরবেশদের নেতা নূর কুতুব-উল-আলমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জোনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করেন। রাজা গণেশ নতি স্বীকার করে কুতুব-উল-আলমের সঙ্গে আপস করেন। এরফলে গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি পঞ্চ়য়া থেকে রাজধানী গৌড়ে নিয়ে যান। ১৪৩১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার ছেলে শামসুদ্দিন আহমদ শাহ ক্ষমতায় বসেন। তার ৫ বছর শাসনের ফলে সকলে তার প্রতি হতাশ এবং বীত্তশুল্ক হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় ১৪৩৬ সালে সাদী খান ও নাসির খান নামক সুলতানের দুজন ক্রীতদাস তাকে হত্যা করেন। তারা ক্ষমতা দখল করলে অভিজাত ব্যক্তিরা বিদ্রোহ করেন। সাদী খান ও নাসির খানকেও হত্যা করা হয়। এর ফলে গণেশের বংশধরদের শাসনের ইতি ঘটে। অভিজাতদের গৃহযুদ্ধের এই সংকটকালে ১৪৩৬ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের প্রপোত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। শুরু হয় ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্বের শাসন যা ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

| | |
|---|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) <small>/শিক্ষার্থীর কাজ</small> | শিক্ষার্থীগণ প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের কবিতাংশ সংগ্রহ করবেন এবং এর উপর দলবেঁধে আলোচনা করবেন। |
|---|--|

১৫ সারসংক্ষেপ

এই দেশে শাহ-ই-বাঙালাহ খ্যাত সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাকে একত্র করেন। তার সময় থেকে বাঙালি ও জনগণ বাঙালি হিসেবে পরিচিত হয়। তিনি ছিলেন উদার, সব ধর্মের মানুষের প্রতি তার সম্মান দৃষ্টি ছিল। তার মৃত্যুর পর সিকান্দার শাহ ও গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ সিংহাসনে বসেন। এই সময় বাংলায় রাজা গণেশ নামক এক জমিদার ও আমাত্য স্বল্প সময়ের জন্যে বাংলার শাসক হন।

১৬ পাঠ্যনির্ণয় মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। কোন ঐতিহাসিক ইলিয়াস শাহকে “শাহ-ই-বাঙালাহ” উপাধিতে ভূষিত করেন

| | |
|--------------------|-----------------------|
| ক) মিনহাজ উস সিরাজ | খ) জিয়াউদ্দিন বারানি |
| গ) শামস সিরাজ আফাফ | ঘ) আরুল ফজল |
- ২। শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ কেমন ছিলেন?

| | |
|-----------|------------|
| ক) জ্ঞানী | খ) অদক্ষ |
| গ) অযোগ্য | ঘ) বিচক্ষণ |
- ৩। “গিয়াস উদ্দিন” এই উপাধি গ্রহণ নিচের কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথার্থ?

| | |
|----------------|---------------|
| ক) ইলিয়াস শাহ | খ) আজম শাহ |
| গ) ফিরোজ শাহ | ঘ) মোবারক শাহ |

পাঠ-৬.৩ | হোসেন শাহী বংশের অধীনে বাংলা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- হোসেন শাহী বংশের সময় কেন বাংলার স্বর্ণ যুগ ছিল সে বিষয়ে বলতে পারবেন।
- বাংলায় আফগান শাসন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।



আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, হাবশি, স্বর্ণযুগ, নৃপতি তিলক, শ্রী চৈতন্য

মুখ্য শব্দ (Key Words)



আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

বাংলাদেশের ইতিহাসে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এক উজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে নিজ মোগ্যতায় বাংলাদেশে হাবশি শাসনের অবসান ঘটিয়ে হোসেন শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশের জনস্মৃতিতে বহুকাল ছিল। তিনি আরবদেশীয় ও সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে বাংলাদেশে এসে নিজ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা গুণে হাবশি সুলতান মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে উজীর পদ লাভ করেন। মুজাফফর শাহের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে প্রধান প্রধান অমাত্য ও সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে সবাই মিলিত হয়ে হোসেন শাহকে সুলতান মনোনীত করেন। ১৪৯৩ সালে হোসেন শাহ ‘আলাউদ্দীন হোসেন শাহ’ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে মধ্যযুগের ‘গোপাল’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

শাস্তি প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য জয়

সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি হাবশিদের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাদের পরিবর্তে সৈয়দ, আফগান, মোঙ্গল ও হিন্দুদেরকে উচ্চ রাজ পদে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তিনি অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি রাজধানী দিনাজপুর জেলার একডালায় নিয়ে আসেন।

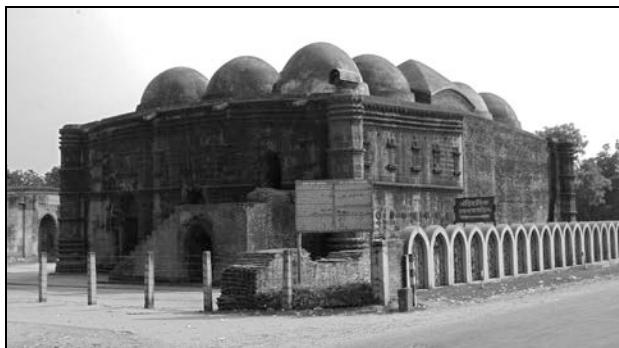
জোনপুরের বিতাড়িত সুলতান হোসেন শকীকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদী ত্রুট্ট হয়ে ১৪৯৫ সালে হোসেন শাহের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ হয়নি। দুপক্ষই সন্ধি স্থাপন করে। সন্ধিতে উভয়পক্ষই প্রতিশ্রূতি দিয়েছিল যে, কেউ কারো শক্রকে আশ্রয় দিবে না। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সমগ্র উত্তর বিহার এবং দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। তিনি ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কামতা রাজ্য আক্রমণ করে দখল করেন। এরপর তিনি কামরূপ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর এ অভিযান বর্থ হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ উড়িষ্যায় অভিযান পরিচালনা করেন। ত্রিপুরার রাজামালা থেকে জানা যায় যে, তিনি ত্রিপুরার কিছু অংশ অর্থাৎ বর্তমান কুমিল্লা জেলা অধিকার করেছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ আরাকান অভিযানেও তিনি সাফল্য লাভ করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও বাংলার স্বর্ণযুগ

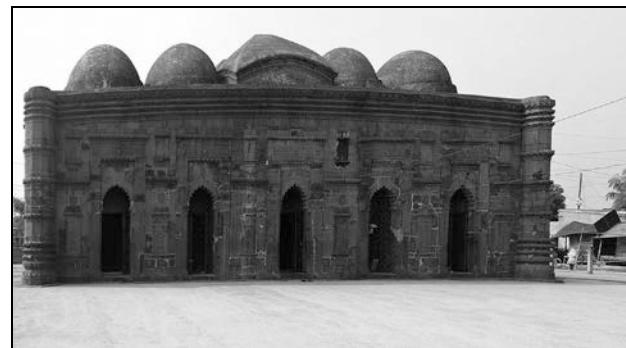
সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রজাদের কল্যাণের জন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতেন। তিনি গরিব-দুঃখীদের জন্যে দেশে অনেক লঙ্ঘনালাভ স্থাপন ও পানির কৃপ খনন করেন। শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি উদার নীতি গ্রহণ করেন।

তিনি মুসলমান ও হিন্দুদেরকে সমান চোখে দেখতেন এবং যোগ্যতানুসারেই সব সম্প্রদায়ের লোককে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন। হিন্দু রাজকর্মচারীদের মধ্যে উজীর পুরন্দর খান, মন্ত্রী রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী, সেনাপতি গৌর মল্লিক, রাজচিকিৎসক মুকন্দ দাস, দেহরক্ষী কেশবছোৰা, টাকশালের অধ্যক্ষ অনুপ-এর নাম জানা যায়। হিন্দু লেখকগণ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সুশাসনে মুঞ্ছ হয়ে তাঁকে ‘ন্যূপতি তিলক’, ‘জগত্ভূষণ’, ‘কৃষ্ণবত্তার’ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি বহু মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকাহ নির্মাণ করেন। তিনি সুফি ও দরবেশদেরকে শুদ্ধা করতেন। তিনি পাঞ্চায়াতে শেখ নূর কুতুব আলমের দরগাতে বহু অর্থ দান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবকে সম্মান করতেন এবং তাঁকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সুবিধা দিয়েছিলেন। হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বহু আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়।



বড় সোনা মসজিদ, গৌড়



ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়

বাংলাভাষায়ও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন রূপ গোস্বামী সুলতানের উৎসাহে বিদঞ্চ মাধব ও ললিত মাধব নামে দুটি বই লেখেন। এ সময়ে বিজয়গুপ্ত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, বিপ্রদাস মনসা বিজয় এবং যশোরাজ খান শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য রচনা করেন। মালাধর বসু শ্রীমত্তাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নামে আর একটি কাব্যও রচনা করেন। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে গৌড়ের ‘ছোট সোনা’ মসজিদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ড. আবু মুহাম্মদ হবিবুল্লাহ-এর মতে মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করার পর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলায় আফগান শাসন

১৫৩৮ সালে শেরখান গৌড় জয় করে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আফগানরা ৩৮ বৎসর বাংলায় শাসন করে, এর মধ্যে মাত্র নয় মাস মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন। তবে শেরখান (শেরশাহ) যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনও অধিকার করেন। অতএব শেরশাহ ও তাঁর ছেলের সময়ে বাংলাদেশ দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তবে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের ছেলে ইসলাম শাহের (সলীম শাহ নামেও পরিচিত) মৃত্যুর পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায় এবং সেই থেকে মোগল বিজয় পর্যন্ত স্বাধীন থাকে।

| | |
|---|--|
| অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | শিক্ষার্থীগণের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে নির্মিত গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের একটি ছবি আঁকতে হবে |
|---|--|

সারসংক্ষেপ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাংলায় হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরাকান ও চট্টগ্রাম দখল করেন। তার সময়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হতো। তিনি বাংলাকে রাজদরবারের ভাষা হিসেবে স্থান দেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজও করেন। যে কারণে তাকে নৃপতি তিলক, জগৎভূষণ, কৃষ্ণবাবতার বলা হতো।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কোন শাসককে নৃপতি তিলক উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ক) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ | খ) আলাউদ্দীন আলী শাহ |
| গ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ | ঘ) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ |

২। হোসেন শাহ কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন কেন? (অনুধাবন)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ক) সুনামের জন্য | খ) খ্যাতি লাভের জন্য |
| গ) উৎসাহ প্রদানের জন্য | ঘ) সম্মান প্রদর্শনের জন্য |

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পুরুর পাড় গামের মাতবর মোশাররফ সাহেব নিজ কাজের জন্য সকলের নিকট প্রিয়। উক্ত গ্রামে হিন্দু মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মবলঘীরা থাকে শাস্তিপূর্ণ সহবস্থানে। মাতবর সাহেব নিজে মুসলমান হলেও যোগ্যতা অনুসারে হিন্দু ধর্মবলঘীদেরও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তার এ ধরনের উদ্যোগের ফলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুবাতাস বইছিল।

৩। উদ্দীপকের মোশাররফ সাহেবের কাজে মধ্যযুগের কোন সুলতানের কাজের প্রতিফলন দেখো যায়-

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ক) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ | খ) সিকান্দর শাহ |
| গ) গিয়াসউদ্দিন আজম | ঘ) আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ |

৪। উক্ত সুলতানের কর্মকাণ্ডের ফলে-

- বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে
- অদূরদর্শী রাজনীতির প্রতিফলন ঘটে
- দক্ষতার সাথে রাজকার্য পরিচালিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i | খ) i ও ii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

পাঠ-৬.৪ বাংলায় মোগল শাসন ও বার ভূইয়া



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় মোগল আক্রমণের সময় এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলার বার ভূইয়াদের সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইসলাম খান চিশতী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

মোগল, সম্রাট আকবর, বার ভূইয়া, ঈসা খান, মানসিংহ, ইসলাম খান চিশতী, নবাবী আমল, বাংলার মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান ও মুর্শিদকুলী খান



স্মাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় মোগল অভিযান

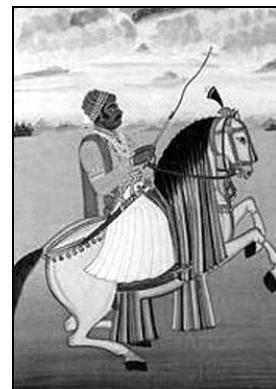
আকবরের সেনাপতি খান জাহান রাজমহলের যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজধানী তাঁড়া অধিকার করেন। তবে সমগ্র বাংলা তখনো মোগল অধিকারের বাইরে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অনেক যুদ্ধ করেও আকবর বাংলাদেশ জয় করতে পারেননি। সমগ্র বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক আফগান এবং হিন্দু জমিদার এবং ভূইয়া ইত্যাদি স্বাধীন হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় শক্তির শাসন অস্থীকার করে। মোগলদের পক্ষে সহজে তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি। একই সময়ে যেহেতু মোগল শক্তি সারা বাংলায় কর্তৃত স্থাপনে ব্যর্থ হয়, সেহেতু এই আমলকে ভূইয়াদের আমলও বলা যেতে পারে। ভূইয়াদের মধ্যে আবার বার ভূইয়া অত্যধিক প্রসিদ্ধ লাভ করে।

মোগল আক্রমণের সময় বাংলার রাজনৈতিক চালচিত্র

মোগল সেনাপতি খান জাহান দাউদ কররানিকে পরাজিত করে মালদহ শহরের প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্বে তাঁড়ায় নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি বর্তমানে ভাগীরথী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে প্রথমদিকে বাংলায় মোগল অধিকার মালদহ-দিনাজপুর হয়ে উভয়ে ঘোড়াঘাট এবং পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত সীমিত ছিল। বাংলায় মোগলদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বড় বাধা ছিল ভাটি এলাকা। ভাটি মানে পূর্ববঙ্গের নিচু এলাকা। এটি পশ্চিমে ইছামতি নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য, উভয়ে ময়মনসিংহ এবং উত্তর-পূর্বে সিলেটের বানিয়াচং।



ঈশা খাঁ



মানসিংহ

অর্থাৎ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেটের নিম্নাঞ্চল নিয়ে ভাটি গঠিত। ভাটির জমিদারদের মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধে আহত কেদার রায় প্রাণত্যাগ করেন। এরপর তার জমিদারি চলে যায় ঈসা খানদের দখলে। ভাটির জমিদারদের মধ্যে ঈসা খান ও তাঁর পুত্র মুসা খান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা উভয়ে মোগলদের দীর্ঘদিন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। ঈসা খান বর্তমান বাক্ষণবাড়িয়ার সরাইলের জমিদার ছিলেন। ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ত্রিপুরার রাজার পক্ষ অবলম্বন করে তিনি বর্তমান সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার তরফের জমিদারের বিবরণে যুদ্ধ করেন। মোগলদের বিবরণে যুদ্ধের জন্য ঈসা খান ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধির পর ঈসা খান দিওয়ান ও মসনদ-ই-আলী উপাধি নেন। ঈসা খান জীবনের শেষ পর্যন্তও মোগলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি। ঈসা খানের রাজধানী ছিল কতরাব। এটা বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদ গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন। সোনারগাঁয়েও ঈসা খানের আরেকটি রাজধানী ছিল। কতরাব থেকে সোনারগাঁয়ের দূরত্ব খুব বেশি নয়। মনে হয়, উভয় স্থানেই তিনি ঘাঁটি এবং রাজধানী স্থাপন করেন।

বাংলায় আকবরের শেষ সুবাদার ছিলেন রাজা মানসিংহ। তিনি ছিলেন রাজপুত এবং একজন দক্ষ সেনাপতি। মানসিংহ তাঁর ছেলে দুর্জন সিংহকে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভাটি আক্রমণ করতে পাঠান। ব্রহ্মপুত্র তীরে এগারসিঙ্গুতে ঈসা খান দুর্জন সিংহকে পরাজিত ও নিহত করেন। কথিত আছে যে, ঈসা খানের সাথে মানসিংহের একক যুদ্ধ হয়। জনশ্রুতি হচ্ছে যে, ঈসা খান মানসিংহকে একক যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধে জয়ী যিনি হবেন তিনিই বাংলার কর্তৃত্ব লাভ করবেন। মানসিংহ এই চালেঞ্জ গ্রহণ করেন। মানসিংহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসেন এবং ঈসা খানের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে মানসিংহের তরবারি ভেঙে গেলে ঈসা খান তাঁকে আঘাত না করে নিজের তরবারি মানসিংহকে দেন। কিন্তু, মানসিংহ তরবারি না নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আসেন। ঈসা খান তখন মানসিংহকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলে তিনি তা গ্রহণ না করে ঈসা খানকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর সাহস ও মহানুভবতায় মুন্দু হয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মানসিংহ শিবিরে ফিরে গেলে তাঁর রাণী তাঁকে গ্রহণ করতে অস্থিকার করেন। তিনি বলেন যে, মানসিংহের কাপুরুষতার জন্য সন্মান মানসিংহকে হত্যা করবেন এবং রাণী বিধবা হয়ে যাবেন। ঈসা খান নিজে এই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি মানসিংহের সাথে সন্মানের দরবারে যেতে রাজি হন। সেখানে সন্মান ঈসা খানকে বন্দী করেন। কিন্তু, মানসিংহের কাছে সকল কথা শুনে সন্মান আকবর ঈসা খানকে উপাধি ও জায়গীর দিয়ে স্বদেশে ফেরৎ পাঠান।

ইসলাম খান চিশতী ও বারভুঁইয়াদের দমন

মোগল সন্মান আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তার পিতার নিয়ুক্ত সুবাদার মানসিংহকে বাংলার সুবাদারি পদে বহাল রাখেন। তবে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দুধ-ভাই কুতুব-উদ-দীন খান কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। কুতুব-উদ-দীন বর্ধমানের ফৌজদার আলীকুলীকে দমন করার জন্য বর্ধমানে গেলে সেখানে আলী কুলী ও কুতুব-উদ-দীন উভয়েই নিহত হন। এই আলী কুলীর পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিলেন মেহের-উন-নিসা। আর এই মেহের-উন-নিসাই পরে জাহাঙ্গীরের স্ত্রীরপে নূরজাহান উপাধি লাভ করেন। এরপর সন্মান ইসলাম খান চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। ইসলাম খান চিশতীর মূল কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে এবং প্রতিবেশী কামরূপ এবং কাছাড়ে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বার ভুঁইয়াদের দমন করেন এবং সকল ভুঁইয়া বা জমিদারকে পরাজিত করলে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়। ইসলাম খান চিশতী ছিলেন ফতেহপুর সিক্রির শয়খ সলীম চিশতীর পৌত্র, তিনি সন্মান জাহাঙ্গীরের সমবয়সী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।



সন্মান আকবর



সন্মান জাহাঙ্গীর



নূরজাহান

ইসলাম খান বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা পর্যালোচনা করে উপলব্ধি করেন যে, রাজধানী রাজমহল থেকে সারা বাংলাদেশের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাজধানী স্থানান্তর করা প্রয়োজন। তিনি বুবতে পারেন যে, নদীমাত্রক বাংলাদেশে সাফল্য লাভ করার জন্য নৌবহরকে শক্তিশালী করা দরকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলাম খান রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন। ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি ইহতিমাম খানের অধীনে শক্তিশালী নৌবহর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্থল ও নৌপথে বিভিন্ন ভূইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনীর সাথে মুসা খান ও তার মিত্রবাহিনীর নৌযুদ্ধ শুরু হয়। মোগল বাহিনী রাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে মুসা খান একাধিকবার পরাজিত হন। তার রাজধানী সোনারগাঁও মোগল বাহিনী দখল করে। এ অবস্থায় মুসা খানও অনন্যোপায় হয়ে সুবাদার ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এরপর চন্দ্রघৌপ্তের রামচন্দ, যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য নিহত হন। অতঃপর ইসলাম খান ভুগ্যো বা নোয়াখালি রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বুকাইনগরের আফগান জমিদার উসমান খান লোহানী মোগলদের সর্বাপেক্ষা বড় শক্ত ছিলেন। মুসা খান কর্তৃক মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করার পরও তিনি মোগলদের আধিপত্য মেনে নেননি। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার হাইল হাওরের সম্মিকটে দৌলম্বপুর (বর্তমান লম্বোদপুর) নামক স্থানে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনীর সাথে উসমান খানের ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উসমান খান পরাজিত ও নিহত হন। ফলে সিলেট মোগল বাহিনীর দখলে আসে। এভাবে ইসলাম খান বাংলার জমিদারদেরকে দমন করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।



সুবেদার ইসলাম খান



মোগলদের কামান, উসমানী উদ্যান

সুবেদার মীর জুমলা

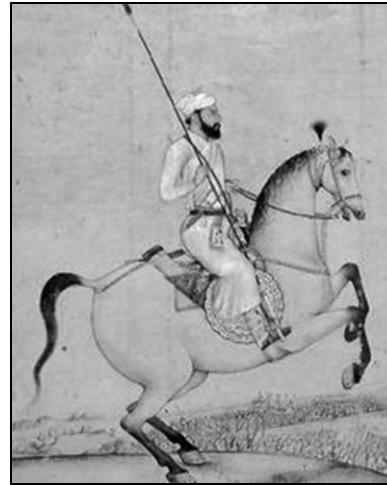
১৬১৩ সালে সুবেদার ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বেশ ক'জন সুবেদার বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তবে সুবেদার মীর জুমলার ক্ষমতা গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত কোন প্রশাসকই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। শাহ সুজাকে দমন করার জন্যে আওরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাপতি মীর জুমলা বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর পর্যন্ত এসেছিলেন। ফলে দিল্লীর সিংহাসনে বসে আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। মাত্র তিনি বছর শাসনকালে মীর জুমলা আসাম ও কুচবিহার বিজয় করেন। তিনি সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার জন্যে সে সময়কার বাংলাদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিল্লীর খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবেদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। অবশেষে সন্তান আওরঙ্গজেব তার মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান।

সুবেদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খানের সুবেদারি আমল দুঅধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। তিনি প্রথম অধ্যায়ে ১৬৬৪ খ্রিঃ থেকে ১৬৭৮ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৬৮০ খ্রিঃ থেকে ১৬৮৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশের সুবেদার ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ও জনপ্রিয় সুবেদার ছিলেন। তার সময়ে আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ (ফিরিসি) জলদস্যুরা মিলিত হয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এলাকায় লুটতরাজ করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা মানুষকে ধরে নিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের নিকট বিক্রি করত। মগরা আবার অনেককে আরাকানে নিয়ে যেত এবং পুরুষদেরকে মজুরের কাজে লাগাত ও মেয়েদেরকে দাসী করে রাখত। তিনি মগ জলদস্যুদের বিতাড়িত করার জন্য বহু রণতরী নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে রণতরী সংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম থেকে মগদের বিতাড়ন ও চট্টগ্রাম জয় শায়েস্তা খানের সুবেদারির কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। মোগল সন্তান আওরঙ্গজেবের ইচ্ছানুযায়ী চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ।



আওরঙ্গজেব



শায়েস্তা খান

শুষ্ক ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে শায়েস্তা খানের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে এবং ইংরেজরা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে তিনি ইংরেজ বণিকদের উদ্ধত্যের সমুচ্চিত জবাব দেন। শায়েস্তা খান রাজস্ব সংক্ষারে বড় ধরনের অবদান রাখেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। তখন বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিল। কথিত আছে যে, তখন এক টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হতো। তবে এটা ঠিক নয় যে, সাধারণ মানুষ ও কৃষকরা ভালো অবস্থায় ছিল। টাকার মান বেশি ছিল তাই চাল ছিল অনেক সস্তা। সাধারণ মানুষ টাকা ব্যবহার করত না। তারা ব্যবহার করত কড়ি। আর টাকা কড়ির ব্যবধান ছিল অনেক অনেক বেশি। শায়েস্তা খান ঢাকায় ছেট কাটরা, হসায়েনী দালান, লালবাগ দুর্গের একাংশ এবং আরও বহু অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ করেন।

মুর্শিদকুলী খান ও নবাবী আমলের সূচনা

স্মাট আওরঙ্গজেবের পর কোনো কোনো সুবা স্বাধীন হয়ে যায়। বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলায় নবাবী আমলের সূচনা হয়। মুর্শিদকুলী খানের প্রাথমিক জীবন খুবই চমকপ্রদ। তিনি ছিলেন একজন বাক্ষণ সন্তান। স্মাট আওরঙ্গজেব তাঁকে করতলব খান উপাধি দিয়ে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করেন। পরে তিনি সুবেদার হন। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল যুগোপযোগী। তিনি অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য না করে সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।



সরফরাজ খান



মুর্শিদকুলী খান



আলীবর্দী খান

মুর্শিদকুলী খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে কল্যাঞ্চ জিনাত-উল-নেসার স্বামী সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন। সুজাউদ্দীন খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান নবাব নিযুক্ত হন। কিন্তু সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে বিহারের নায়েব আলীবর্দী খান বিদ্রোহ করেন। সরফরাজ খান এতে পরাজিত ও নিহত হন। মোগলদের অনুমোদন ছাড়াই আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। নিজের নবাবীর উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর আপন কল্যাই তাঁর মনোনীত নবাব পৌত্র সিরাজকে গ্রহণ করেন। নবাব পরিবারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাই শুধু নয়, গোটা ভারতেরই স্বাধীনতা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

| | |
|--|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | শিক্ষার্থীগণ মোগল সেনাপতি মানসিংহ ও ঈসা খানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের একটি কল্পিত ছবি এঁকে দেখান। |
|--|--|

সারসংক্ষেপ

বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন দক্ষ নেতা বাধার সম্মুখীন হন। আকবরের সময় মানসিংহকে নিয়োগ দেয়া হলেও তিনি ঈসা খানের কাছে পরাজিত হলে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম খান চিশতী সমগ্র বাংলাদেশে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুবেদার শায়েস্তা খান আওরঙ্গজেবের সময় বাংলা শাসনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

পাঠোন্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মানসিংহ কোন ভাটির জমিদারকে পরাজিত করেন-

- | | |
|--------------|---------------|
| ক) চাঁদ রায় | খ) কেদার রায় |
| গ) ঈসা খান | ঘ) মুসা খান |

২। বাংলায় আকবরের শেষ সুবাদার কে ছিলেন?

- | | |
|--------------|------------------|
| ক) মানসিংহ | খ) দুর্জন সিংহ |
| গ) ইসলাম খান | ঘ) শায়েস্তা খান |

৩। কোন সুবাদারের সময় রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় আনা হয়?

- | | |
|--------------------|---------------|
| ক) শায়েস্তা খান | খ) ইসলাম খান |
| গ) মুর্শিদকুলী খান | ঘ) সুজাউদ্দিন |

৪। এগারসিঞ্চুতে দুর্জনসিংহকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে কোন নামটি অধিক উপযোগী?

- | | |
|--------------|----------------|
| ক) ইসলাম খান | খ) সুমা খান |
| গ) ঈসা খান | ঘ) ইহতিমাম খান |

৫। জাহাঙ্গীর নগর নামটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে- (প্রয়োগমূলক)

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) ঢাকার | খ) চট্টগ্রামের |
| গ) বরিশালের | ঘ) কুমিল্লার |

সৃজনশীল প্রশ্ন

মোগল শাসনামলে কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী গোলযোগপূর্ণ এলাকার সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল জনাব *x* এর উপর। তিনি তার রাজধানী স্থানান্তর, নৌবহর গঠন কাজের সুবিধার্থে করেছিলেন। এমনকি নৌযুদ্ধে এলাকার বৃহৎ ভূস্বামীদেরও পরাজিত করেন।

ক. জাহাঙ্গীর কত সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন?

খ. শায়েস্তা খানকে অমরত্ব দিয়েছে তার স্থাপত্য কীর্তি-ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদীপকের জনাব *x* এর কর্মকাণ্ড পাঠ্য বইয়ের পঠিত সুবাদারের কাজের যে দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত সুবাদার জমিদারকে পরাভূত করে বাংলা সম্পূর্ণরূপে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন আপনি কী একমত? মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১. ঘ ২. গ ৩. ক ৪. খ

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. ক

ইউনিট ৭

মধ্যযুগে বাংলার জীবনচর্যা

ভূমিকা

তের শতকে মুসলমানরা বাংলাদেশ জয় করে মুসলিম সমাজ নির্মাণ করে এবং মুসলিম সভ্যতা গড়ে তোলে। সেই থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলা মুসলিম শাসনের অধীন ছিল। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির প্রভাবে মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মিত হয়েছিল। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে বহির্দেশ থেকে আগত মুসলিম প্রভাব। শুধু শাসন ক্ষেত্রেই নয় সমাজজীবনেও যা স্থায়ী আসন লাভ করেছিল। মুসলিম শাসন নিয়ে যেমন সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হয়নি, আবার মুসলিম শাসকগণও হিন্দু ও বৌদ্ধদের স্বাধীনতা দানে কার্পণ্য করেনি। সামন্ত সমাজের নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুদের মধ্যে যারা লেখাপড়া ও আর্থিকভাবে অগ্রসর (ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রিয়) ছিলেন তারাই অভিজাত শ্রেণি হিসেবে সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে গ্রহণ ও ভোগ করেছেন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

পাঠ-৭.২ : মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৭.১ | মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার সমাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মধ্যযুগে বাঙালি জাতিসত্ত্বায় সংমিশ্রণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মধ্যযুগের অর্থনৈতিক আবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মুসলিম শাসন, বাঙালি জাতিসত্ত্বা, কৃষি অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, নগরায়ন, মুদ্রা

মুখ্য শব্দ (Key Words)



মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার সমাজ

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নতুন উপাদান যুক্ত হয় ও বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়। এতদিন পর্যন্ত বাংলার লোকজন ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু। মুসলমানরা নিয়ে আসে একটি নতুন ধর্ম, ইসলাম – যার সঙ্গে বৌদ্ধ বা হিন্দুদের মিলের চেয়ে গরমিলই ছিল বেশি। প্রথম বিজয়ীরা ছিল তুর্কি। তুর্কিরা প্রায় তিনশ বছর ধরে

শাসকের মর্যাদা লাভ করে। ইলিয়াস শাহীরাও তুর্কিই ছিল, তার পরে হাবশী এবং হাবশীদের পরে সৈয়দ বংশের সুলতানরা শাসনক্ষমতা দখল করে। এরপর বাংলায় চলে আফগান ও মুঘল শাসন। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসকদের সহযোগী লোকেরাও যেমন বিদ্বান, পেশাজীবী, স্থপতি, প্রকৌশলি, প্রশাসক এবং কারিগরও এদেশে আসে। মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যও অনেকে দিল্লি বা বাংলাদেশে আসে। অনেক আরব ধর্ম প্রচারের জন্যও আসেন। পারস্য থেকে আগত মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল, তাঁদের ফার্সি ভাষাই মুসলমান আমলে সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। সুফিদের মধ্যে অনেকেই পারস্য থেকে আসেন।

সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আর্থিক ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া মানুষকে অধিকতর শোষিত ও অবহেলিত করে রাখা। বাংলাদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক শোষিত হতো, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত। তবে মধ্যযুগে বাংলাদেশে খাদ্য, পুরুরে মাছ, গোয়াল ভরা গরু থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতানি আমলে দাস পথা প্রচলিত ছিল। দাসরাও শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়ে অভিজাতশ্রেণিতে স্থান পেতেন।

জাতিগত পরিচয় ও বাংলার সামন্ত সমাজ

বাংলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনপদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাজশাসনের ফলে মধ্যযুগের আগেই সংগঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি হতে থাকে। তবে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতিসম্প্রদায়ের ভিত্তিই সবচেয়ে সংগঠিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, যা অন্য উপজাতিগুলো পারেনি। মধ্যযুগের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে চাকমাসহ বিভিন্ন পাহাড়ি উপজাতি পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে এসে পার্বত্যঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর যোগাযোগ তেমন ছিল না। উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল, রাজবংশী, গারো জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির যোগাযোগ ছিল এবং সম্পর্ক প্রতিমূলক ছিল। সুফিসাধক এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রভাবে তের শতকে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে। তখন থেকে নিম্নবর্গের শোষিত মানুষের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে বাঙালি মুসলিম বলে একটি সম্প্রদায়ের সংযোজন ঘটে। মধ্য যুগে তুর্কি, আফগান, মুঘল, ইরানি, আরব, হাবশিসহ মধ্য প্রাচ্যের আরো কিছু জাতিগোষ্ঠীরও আগমন ঘটে। এর আগে এখানে জৈন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বসবাস ছিল। ঘোল শতকে বাংলায় পর্তুগিজ এবং আর্মেনীয়গণেরও বসতি স্থাপিত হয়। চট্টগ্রামে আরাকানি জাতিগোষ্ঠীর বসতি স্থাপিত হয়। ফলে মধ্যযুগে বাঙালি জাতিসত্ত্বায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর আরো মিশ্রণ ঘটেছিল।

দীর্ঘ যে সব রাজশাসন ব্যবস্থা বাংলায় কার্যকর ছিল তাতে ইসলাম ধর্ম, সুফিবাদ, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম, বিদেশী শাসক, বণিক ও সাধারণ মানুষের আগমন বাংলার সমাজ ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। মুঘল আমলে ঢাকা রাজধানী হওয়ার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। ফলে বাংলার পূর্বাঞ্চলে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি বেশি ঘটেছিল। কিন্তু অভিজাত সমাজের ভেতরে টিকে থাকা বর্ণ ও শ্রেণি বৈষম্যের কারণে বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে শ্রেণি বিভেদ মুছে যায়নি। অভিজাত্যের ভিত্তিতে স্বয়ং মুসলিম সমাজই আশরাফ ও আতরাফ নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশীয় ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল হচ্ছিল না। হিন্দুদের মধ্যেও জাতি বা বর্ণভেদ প্রথা প্রবল ছিল। সমাজে প্রশাসন, জমি বন্টন, বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে যারা জড়িত ছিলেন তারা অভিজাত বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। অপেক্ষাকৃত কম দামের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন সমাজের নিম্নবর্ণ, আতরাফ, ত্রীতদাস, চাকরবাকর ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিভাজন সৃষ্টি করে রেখেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে পারম্পরিক আদান প্রদানের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন হিন্দু প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মতোই মুসলমান সমাজে শেখ ও সৈয়দরা কৌলীন্য দাবি করে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেন। হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানরা তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে। কুসংস্কার ও যাদুটোনার বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল প্রায় একই রকমের। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই উভয়ের সামাজিক বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করত। সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যে উদারপন্থী ধারা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সমন্বয় প্রচেষ্টার নির্দেশন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। এ আমলে মুসলমান লেখক হিন্দু পুরাণ, গাঁথা এবং ঐতিহ্যকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলিম আমলে বাংলায় এক ধরনের মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিল। ইবনে বতুতা, বারবোসা, আবুল ফজলসহ বিভিন্নজনের লেখায় বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থনীতির সমৃদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে।

সুলতানি যুগে বাংলা স্বাধীন থাকার কারণে কৃষি, কুটিরশিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি ঘটেছিল। মুঘল যুগে মুদ্রিগুহ বন্ধ হয়ে শাস্তি স্থাপন ও উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থার ফলে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির ব্যাপক উন্নতি হয়। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি—ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংলাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করায় বহু অর্থাগম হতো। ১৬৮০-১৬৮৪ সময়ে কেবল ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ঘোল লাখ টাকার জিনিস ক্রয় করে। ওলন্দাজরাও এর চেয়ে বেশি জিনিস ক্রয় করত। সুতরাং এই দুই কোম্পানির কাছ থেকে প্রতি বছর আট লাখ রূপার টাকা বাংলায় আসত। বর্তমান মূল্যে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকা এই দুটি ইউরোপীয় কোম্পানি দিত। অন্য দেশের সাথে বাণিজ্যতো ছিলই।



ইবনে বতুতা

কৃষি অর্থনীতি

চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, বাংলাদেশে প্রচুর ধান হতো। সতের শতকে বার্গিয়ার লিখেছেন যে, অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর দেশই সর্বাপেক্ষা শস্যময় ; কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্তি। মুসলিম আমলে দীর্ঘ সময়ে কৃষি অর্থনীতিই প্রধান ছিল। তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য, কুটিরশিল্প ও ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল। মধ্যযুগের সকল রাজবংশের শাসনামলে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বাংলাদেশ চিরকালই শস্য-শ্যামলা চিরসুন্দর নয়নাভিরাম বলে দেশী-বিদেশীদের হস্য জড়িয়েছে। এতে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। বছরে তিনবার ফসল উৎপাদন করত বলেই মধ্যযুগে বাংলার দেড় কোটি মানুষকে তিন বেলা ভাত খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বাংলাদেশ। ধানের পাশাপাশি পাট, গম, আম, ঘব, লাক্ষা, তেলবীজ, রসুন, মরিচ, মসলা, রেশম, রবিশস্য, ইক্ষু ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হতো। বাংলা থেকে প্রচুর চাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো।

শিল্প

বাংলার শিল্পের মধ্যে বয়ন শিল্প ছিল অন্যতম। সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের বস্ত্রের নাম ছিল ‘মসলিন’। মসলিন ও রেশম শিল্প মুসলিম শাসক, অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। বাংলায় ইক্ষুর উৎপাদন ছিল ব্যাপক। এই ইক্ষু থেকে চিনি উৎপাদিত হতো। মুসলমান আমলে চিনি উৎপাদন একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। চিনির মতো লবণ ছিল আরেকটি প্রধান শিল্প। সমুদ্রের পানি এবং লবণাক্ত মাটি থেকে লবণ উৎপাদিত হতো। মধ্যযুগের বিভিন্ন শাসনামলে কৃষিভিত্তিক কিছু কুটির শিল্প যেমন বস্ত্র ও রেশম শিল্প বিশ্বজোড়া বাংলার খ্যাতি নিয়ে এসেছিল। বাংলার বেশ কিছু জায়গায় লোহাজাত জিনিসপত্র তৈরি হতো। বাংলায় কাঠের আসবাবপত্র তখন বিশেষ গুরুত্ব পায়। নদ-নদীর দেশে নৌকা ছাড়া চলাফেরা করা যেত না। ফলে এখানে নৌকা ও জাহাজ শিল্প প্রসার লাভ করে। দেশবিদেশে বাণিজ্যের জন্য বড় বড় নৌকা ও জাহাজ তৈরি করা হতো। বাংলার ‘মসলিন’ কাপড়ের চাহিদা দেশের বাইরে তুরক্ষ, খোরাসান, পারস্যসহ বিভিন্ন দেশে ছিল। তখনকার অর্থনীতিতে এর প্রভাবও ব্যাপক ছিল। ইউরোপের বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের জায়গা হিসেবে বাংলার গুরুত্ব ছিল। এর নানা রকমের কাঁচামাল, মসলিন, তাঁতের কাপড় ইত্যাদির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল।

বাণিজ্য, নগরায়ণ এবং মুদ্রা

মধ্যযুগের বাঙালি সওদাগররা ‘সপ্তদিঙ্গা-মধুকর’ ভাসিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতেন বলে অনেক গল্প চালু আছে। তখন বাঙালিরা সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার), মালয়, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীনে পাড়ি দিত। বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রামের নাম তখন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগে গৌড়, পান্তুয়া, সোনারগাঁও, হুগলি, ঢাকাসহ বেশ কিছু শহর গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রবর্তন একটি বড় বিষয়। কারণ এর ফলে বিনিময় প্রথার পরিবর্তন ঘটে। শেরশাহ রৌপ্যমুদ্রা চালু করেন। আকবর স্বর্ণ নির্মিত ‘মোহর’ ও রূপা নির্মিত ‘জালালা’ এক সঙ্গে চালু করেন। খুচরা বাজারে ‘কড়ি’ চলত। সরকার এগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করত। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়। অর্থনীতির এসব সংক্ষার বাংলায় নগর সভ্যতা চাঙ্গা করে, বেনিয়া ইংরেজদের আকৃষ্ট করে, মজুরিভিত্তিক কর্মচারী, চাকরিজীবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন সুলতানই নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করতেন।

মুদ্রাই তখন স্বাধীনতার প্রধান প্রতীক ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেই নিজের নামে মুদ্রা চালু করতেন। এই সব মুদ্রায় তারিখ থাকত। সতের শতকের পর থেকে মুঘল সম্রাটগণের মুদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রার নাম ছিল টক্ষ—এই টক্ষ থেকেই টাকা শব্দের উৎপত্তি। সাধারণ কেনাবেচায় কড়ি ব্যবহৃত হত।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার জীবনযাত্রার মান দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি ‘বঙ্গদেশের আনাচে কানাচে বেহেস্ত’ বি঱াজ করছে বলে তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন। বস্তুত মুঘলদের আগের মামলুক বংশ, ইলিয়াসশাহী বংশ, হুসেনশাহী বংশ, শূর বংশের রাজত্বকালে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধির ধারায় চলেছিল। মুঘলরা ক্ষমতা দখলের পর রাজস্বনীতি, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর সরকারি নীতি-নিয়ম আরোপ করায় অর্থনীতি কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিতে পরিচালিত হতে থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত সুবা-বাংলার সঙ্গে ভারতসহ বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে মুঘল যুগে আধুনিক বাংলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারই প্রবর্তন ঘটেছিল।

| | |
|--|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) | শিক্ষার্থীগণ ‘মসলিন’ কাপড়ের একটি চিত্র অংকন করবেন এবং কয়েকটি গ্রন্থ করে মসলিন বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিবেন। শিক্ষার্থীর কাজ |
|--|---|

১৫ সারসংক্ষেপ

বৌদ্ধ ও হিন্দু অধ্যুষিত বাংলায় তের শতক থেকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। সামন্ত সমাজের বৈষম্যের কারণে ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারিত হয়। তবে মুসলিম সমাজ ও আশরাফ ও আতরাফ নামে ভাগ হয়েছে। তা সঙ্গে মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতির ব্যাপক সমৃদ্ধি হয়। কৃষিতে ধান শিল্পে মসলিন এবং বাণিজ্যে নানা অঞ্চল যেমন ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীনের সাথে বাণিজ্য হতো।

১৬ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে সরকারী ভাষা ছিল— (জ্ঞান)
 - ক) আরবি
 - খ) উর্দু
 - গ) ফার্সি
 - ঘ) ইংরেজি
- ২। কৃষিই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কেননা—
 - i) নদনদীর সমাহার
 - ii) পলি গঠিত সমভূমি
 - iii) রঞ্জনিজাত পণ্যের উৎপাদন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

- ৩। হাফিজুর রহমান স্যার মধ্যযুগের অর্থনীতির উপর বক্তব্য রাখার সময় বলেন যে বর্তমান সময়ের তৈরি পোষাক শিল্পের মতো মধ্যযুগে বন্দরশিল্পে বাংলার অগ্রগতি, দেশে বিদেশে প্রশংসা কৃতিয়েছিল। এছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকাংশ ছিল রঞ্জনি নির্ভর।
 - ক. সম্রাট আকবর প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রার নাম কী?
 - খ. সুলতানি যুগে বাংলার সমৃদ্ধি অর্থনীতির কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।
 - গ. উদ্দীপকে মধ্যযুগের অর্থনীতির যে চিত্র দেখা যায় তা পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
 - ঘ. বর্তমানে পোষাক শিল্পের মতো মধ্যযুগের বয়ন শিল্প বাংলাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়, আপনি কী একমত? মতামত দিন।

পাঠ-৭.২ মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুসলিম আমলে ধর্মীয় বিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলায় ইসলাম ধর্ম বিষ্টারে সুফিবাদের প্রভাব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা-সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশের বর্ণনা দিতে পারবেন।

| | |
|--|--|
|  মুখ্য শব্দ (Key Words) | ধর্ম, সুফিবাদ, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, শিক্ষা, স্থাপত্য, শিল্পকলা |
|--|--|

 সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। আর এ কারণে মুসলিম যুগের সাহিত্যে সমাজের যে প্রতিফলন ঘটেছে তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে ইসলাম প্রচার, আত্মার উৎকর্ষ সাধন, মানব কল্যাণে কাজ করা ইত্যাদি আদর্শ নিয়ে সুফিসাধকগণ বাংলাদেশে আসেন। বাংলার অনেক জায়গায় তাদের প্রতিষ্ঠিত ‘খানকা’ গুলো আধ্যাত্মিক, মানব কল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার প্রসারে বড় অবদান রাখে। ক্রমে তারা বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিকে সমন্বিত করে সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মরমী চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করায় সুফিবাদের প্রতি হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আকৃষ্ণ হয়। ফলে বাংলার সুফিবাদ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অধিকতর উদার ও মানবকেন্দ্রিক চরিত্র অর্জন করে। সুফিবাদের কারণে বাংলার সমাজে দুর্দশ সংঘাত লোপ পায়। মরমী বাউলরা হিন্দু-মুসলিম মিলনের আদর্শই প্রচার করে।

বহিরাগত মুসলিম শাসকরা বাংলার সমাজজীবনের সাথে তাদের শাসন আত্মীকরণ করার ফলে ধর্মীয়ভাবে ইসলাম বৃহত্তর বাঙালি সমাজে ব্যাপক প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী শাসনের সূচনাকাল থেকেই বাঙালি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সমাজ সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করেছিল। মুঘল আমলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠে। ঐ সময়ে লেখা ‘মনসামঙ্গল’ ধর্ম সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল উদাহরণ। ধর্মীয় পরিচয় বাঙালি হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ বা সংকট সৃষ্টি করেনি।

ইসলাম ধর্মের বিষ্টারে সুফিবাদের প্রভাব

চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাংলাদেশে সুফি প্রভাব বিষ্টার লাভ করে। শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজির নাম শেখশুভোদয়ার (শেখের শুভ উদয়) সঙ্গে জড়িত। এ গঠনের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সচিব ছিলেন। শেখশুভোদয়া সুত্রে কারো কারো বিশ্বাস, শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজি লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনোতিতে বাস করতেন। বঙ্গড়ার মহাশূন্যগড়ের শাহ সুলতান মাহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙ্গজেবের সনদসূত্রেও মিলে। ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনে হয় মাহি আসোয়ার (মৎসাকৃতির নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দ শতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্তলপথ জনপ্রিয় হয়। আর মোলো শতকে পর্তুগিজরা নৌপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঙ্গ চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। শাহজালাল নামে বিখ্যাত এই সাধুপুরূষ উন্নত পূর্ব বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন। তার উদ্যম ও নিঃস্বার্থ সেবার ফলে ঐ অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতি বিষ্টার লাভ করে। আদর্শ জীবন ও দৃঢ়স্থ মানুষের প্রতি সেবার জন্য তিনি অমুসলিমদেরও ভক্তি ও শুদ্ধি অর্জন করেছেন। আজও তিনি সাধারণ লোকপ্রবাদে অমর এবং শত শত লোক সংগীতে তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। শেখ আঁখি সিরাজুদ্দিন উসমান নিয়ামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। তিনি পাড়ুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। তিনি চৌদ্দ-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাংলাদেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে শিয়রা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্নেষ যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের

বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা ‘খালিদিয়া’ নামেও অভিহিত হতো। আলাউল হকের পুত্র ছিলেন নূর কুতুব-আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। তাঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানি জোনপুরের সুলতান ইবরাহিম শরকির সমসাময়িক ছিলেন।



শাহজালাল (রাঃ)-এর মাজার, সিলেট

সুফিদের দ্বারা দীক্ষিত অধিকাংশ নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধানের কারণে অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে, তারা ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ও লিখায়, সর্বোপরি সংক্ষার ও চিন্তায়, প্রায় পুরোপুরি বাঞ্ছিলই রয়ে গেল। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির উন্নয়ন হয়। পীর, দরবেশ ছাড়াও বাংলার মুসলমানদের কিছুসংখ্যক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৌরাণিক নায়কের প্রতি বিশেষ আস্তি ছিল। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন খাজা খিজির।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। এই সময়ে বাংলা ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা পায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সুলতানদের দরবারে প্রবেশ করে। প্রথমে সুলতানরা ও তাঁদের আমাত্যেরা হিন্দু কবিদের উৎসাহ দেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অর্থাৎ মুসলিম সুলতানরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশে সহায়তা দান করেন। পরে মুসলিম কবিরাও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। শাহ মুহাম্মদ সঙ্গীর একমাত্র মুসলিম কবি যিনি সুলতানি আমলে কাব্য রচনা করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের আগে বাংলা ভাষার লিপি রচনার গতি বেশ ধীর ছিল। পাল ও সেন যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি থাকায় বাংলা ভাষার তেমন উন্নতি হয়নি। বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নমুনা হল চর্যাপদ। চর্যাপদের ভাষা পুরোপুরি বাংলা নয়, বলা চলে এটি বাংলা-পূর্ববর্তী ভাষা। কিন্তু তারপরও চর্যাপদকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ একে চর্যাগীতি বলেন। কেননা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মুখে মুখে এগুলো গান হিসেবে প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষা নতুন গতি লাভ করে সুলতানি যুগে। ফারসি ও আরবির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ঘটে। সুলতানি যুগে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার প্রসার ঘটে। ইলিয়াসশাহী আমলে মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় ভাবপ্রবণ ও মানবতাবাদী সাহিত্যের উন্নতি ঘটে। বাংলার সুলতান রংকনউদ্দিন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃতিবাস বাংলা ভাষায় ‘রামায়ণ’ রচনা করেন। চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খার সহযোগিতায় কবি পরমেশ্বর ‘মহাভারত’ বাংলায় অনুবাদ করেন। আরো অনেক ইন্দুই তখন রচিত হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক কাব্যের সাহিত্য রচনা হয়। ঘোড়শ শতকে সারিবদ্ধ খাওয়া নামক একজন মুসলমান ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য রচনা করেন। হুসেনশাহী যুগে (১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করে। বাংলার শাসকগণ এ সময়ে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা

সুফি-দরবেশ এবং আলেম-উলামাগণ মুসলমানদের মধ্যে আর পণ্ডিতগণ হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলিম যুগে বাংলায় অসংখ্য মাদরাসা গড়ে ওঠে। মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রকে বলা হতো ‘মকতব’। সাধারণত গ্রামের মসজিদে এ সব মকতব বসত। প্রাথমিক পর্বে আরবি, ফার্সি ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। অন্যদিকে হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা। সাধারণত গ্রামের কোনো শিক্ষিত যুবক এসব পাঠশালা চালাত।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে টোল ও মাদরাসা। সাধারণত প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের থাকা-খাওয়া সবকিছু বিনামূল্যে পরিচালিত হতো। অন্যদিকে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র টোলে সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হতো। এখানে বেদ, পুরাণ ইত্যাদি পড়ানো হতো। নবদ্বীপ ছিল হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র। এখানে বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

মধ্যযুগের বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকরা শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সুফিসাধকগণ ‘থানকাহ’গুলোকে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দেশে মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে মাদরাসা গড়ে তোলা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব বেশি ছিল। সমাট আকবরের শিক্ষানীতিতে পাঠ্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। মকতবেও গদ্য-পদ্য পড়ালেখা ছাড়াও কবিতা মুখস্থ করা ও অংক আবশ্যিক করা হয়। ফার্সি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ যথেষ্ট এগিয়ে আসেন। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, রসায়ন ইত্যাদি পড়ানো হতো। তবে মধ্যযুগে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা তেমন গড়ে উঠেনি। নারীদের শিক্ষা ছিল সীমিত আকারের এবং তা প্রধানত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ছিল।

স্থাপত্য ও শিল্পকলা

মধ্যযুগে যে সব দেশ থেকে শাসকশ্রেণি বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার নির্দর্শন বহন করে এনেছিলেন। এগুলো তাদের ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তবে পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্যের উপকরণ বাংলায় বেশি লক্ষ করা গেছে। মসজিদ নির্মাণে বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও মুঘলরা যতখানি যত্নবান ছিলেন সুলতানি যুগে এই শিল্পের তেমন কদর ছিল না। ফলে বাংলায় চিত্র শিল্প ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ততটা বিকশিত হতে পারেনি। তবে মুঘল আমলে ঢাকাসহ কিছু কিছু জায়গায় মসজিদ, সমাধি, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নির্দর্শন স্থাপিত হয়েছিল। এই ধারা সুবাদারদের আমলেও অব্যাহত ছিল। ঢাকায় নবাবী আমলে জিনজিরা প্রাসাদসহ নির্মিত ইমারতসমূহ এখন দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত।

| | |
|--|--|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) | শিক্ষার্থীগণ সুফি সাধকদের বিশেষ করে হ্যারত শাহজালালের উপর রচিত বিভিন্ন লোকগান সংগ্রহ করবেন এবং কোনো একটি গান শিখে নিজেদের মধ্যে পরিবেশন করবেন। |
| /শিক্ষার্থীর কাজ | |

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে সুফিদের অবদান ছিল অনেক। মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই প্রভাব ছিল। এসময় এ দুই সম্প্রদায়ের নানান গ্রন্থ ও সাহিত্য রচিত হয়। মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে সংকৃত ভাষার প্রভাব বেশি থাকায় বাংলা ভাষার তেমন উন্নতি হয়নি। শিক্ষা কাজে মুসলমানদের জন্য মাদরাসা ও মকতব হিন্দুদের জন্য টেল ও পার্টশালা ব্যবহার হতো।

পাঠ্ঠোভর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। সফিদের প্রতিষ্ঠিত খানকাগুলো ছিল-

- i) বুদ্ধিগতিক চিন্তার প্রসার স্থল ii) আধ্যাত্মিক কর্ম সাধনার স্থান iii) সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন স্থান

ନିଚେର କୋଣଟି ସାଧିକ?

- ২। একমাত্র কোন মুসলিম কবি সুলতানি আমলে বাংলায় কাব্য রচনা করেন?

- ঘ) সৈয়দ আশরাফ সিমনানি

- ৩। সুলতানি যুগে কোন শিল্পের কদর ছিল না?

৩৮ উত্তরমালা

পাঠ্টোন্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১. গ ২. ঘ ৩. ক

পাঠ্যক্রম মুল্যায়ন- ৭.২ ০ ১. খ ২. ক ৩. খ

ইউনিট

৮

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ-বিশেষ করে বাংলা অঞ্চল ছিল ধন সম্পদে পূর্ণ রূপকথার মতো একটি দেশ। এ অঞ্চলের স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুই তখন এসব গ্রামগুলোতে পাওয়া যেত। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র ভরা ফসল, গোলা ভরা ধান, পুরুর ভরা মাছ থাকত। কুটির শিল্পেও এই গ্রামগুলো ছিল সমৃদ্ধ। তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নতমানের ছিল। এর মধ্যে জগৎ বিখ্যাত ছিল মসলিন কাপড়। তাছাড়া উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও নানা ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব পণ্যের আকর্ষণেই অনেকে এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসেছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে এসেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে। পরবর্তী সময়ে তারা এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের আগত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে পরাজিত করে এবং স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে নানা মুখ্য ঘৃণ্যন্ত করে কীভাবে এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূচনা করে বর্তমান ইউনিটে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আরো আলোকপাত করা হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন কীভাবে আনা হয়েছে তার উপর।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

পাঠ-৮.২ : বাংলায় ইংরেজ ক্ষমতা দখল

পাঠ-৮.৩ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-৮.১ বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় ইংরেজ শাসনের পটভূমি বলতে পারবেন;
- পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি ও ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



ABC

মুক্ত শব্দ (Key Words)

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, কুটির শিল্প, মসলিন কাপড়, অটোমান তুর্কি, বাণিজ্য কুঠি, ম্যাগনাকার্টা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ভাস্কো-ডা-গামা



বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন: সাত শতক থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে আরব বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। তারা বাণিজ্য করতো মূলত সমুদ্রপথে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনপোল অটোমান তুর্কিরা দখল করে নেয়। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে জলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলত একারণেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমুদ্র পথে উপমহাদেশে আসার অভিযান শুরু করে।

পর্তুগীজ

পর্তুগীজদের মধ্যে যে দুঃসাহসী নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে ভারতের পশ্চিম-উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন, তিনি ভাস্কো-ডা-গামা। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে তার এ উপমহাদেশে আগমন ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। পর্তুগীজরা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে মূলধন করে এদেশে এলেও ক্রমে তারা সম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি অঞ্চলে কুঠি স্থাপন এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে শুক্রঘাটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। উত্তিয়া ও বাংলার কিছু অঞ্চলেও তারা বসতি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। প্রথম আগত ইউরোপীয়ান বাণিজ্যিক দল হলেও তাদের অপকর্ম ও দস্যুতার কারণে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান পর্তুগীজদের চট্টগ্রাম ও সন্দীপের ঘাঁটি দখল করে, তাদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। তাছাড়া পর্তুগীজরা এদেশে আগত ইউরোপীয় অন্যন্য শক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজ ও দিনেমার

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ বলা হয়। তারা ‘ডাচ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে বাণিজ্যের উদ্দেশে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে আসে। তারা কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুচুড়া, বাকুড়া, বলাসোর, কাশিমবাজার এবং বরানগরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু অপর ইউরোপীয় শক্তি ইংরেজদের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ শুরু হয় এবং একই সঙ্গে তারা বাংলার শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা বিদরার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে শেষ পর্যন্ত সকল বাণিজ্যকেন্দ্র গুটিয়ে তারা এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজদের মতোই দিনেমার বা ডেনমার্কের অধিবাসী একদল বণিক বাণিজ্য করার জন্য ‘ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে তারা দক্ষণ ভারতের ত্রিবাঙ্গুর এবং ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ত্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু এদেশে লাভজনক ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়ে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই দিনেমারারা এদেশ ত্যাগ করে।

ইংরেজ

প্রাচ্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের মতো ইংরেজ বণিকদেরকেও এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করে; ইংল্যান্ডের একদল বণিক ‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ নামে একটি বণিক সংঘ গঠন করে। এই সংঘটি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদপত্র লাভ করে। প্রাচ্যে বাণিজ্য করার সনদপত্রটি নিয়ে বাণিজ্যিক সুবিধা পাবার আশায় প্রথমে সম্ভাট আকবর এবং পরে সম্ভাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে উপস্থিত হয়। জাহাঙ্গীরের অনুমতি লাভ করে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, মসলিপট্টমে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এদেশে তাদের ভিত্তি মজবুত করে ফেলে। এরপর তারা বাংলার বালাসোরে বাণিজ্য কুঠি এবং করম্ভুল (মাদ্রাজ) উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। বাংলার সুবেদার শাহ সুজার অনুমতি নিয়ে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভুগলিতে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাশিমবাজার, ঢাকা, মালদহেও তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আরেক জন ইংরেজ জব চার্শক ১২০০ টাকার বিনিময়ে কোলকাতা, সুতানাটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ত্ব লাভ করে। ভাগীরথী নদীর তীরের এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই পরবর্তিকালে কোলকাতা নগরীর জন্ম হয়। এখানেই কোম্পানি ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে নির্মাণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। ধীরে ধীরে এটি ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দিল্লীর সম্ভাট ফারুখশিয়ার তাদের বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। এই সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও তারা লাভ করে। সম্ভাটের এই ফরমানকে ইংরেজ ঐতিহাসিক ওরমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনা-কার্ট বলে উল্লেখ করেন। এই অধিকার লাভ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

ফরাসি

ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে আগত সর্বশেষ ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক কোম্পানিটি সর্বপ্রথম সুরাটে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে এবং পরের বছর মুসলিপট্টমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমের গড়ে তোলে ফরাসি উপনিবেশ।

১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ফরাসিরা তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলায় সম্প্রসারিত করে। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে কোম্পানি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত চন্দননগর নামক স্থানটি কিনে নেয়। কয়েক বছরের মধ্যে চন্দননগর একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত ফরাসি বাণিজ্য কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী দুর্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া এর আগেই ফরাসি কোম্পানি বাংলা, বিহার, উত্তিয়ায় নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। পরবর্তিকালে তারা কাশিমবাজার ও বালাসোরে কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ফরাসি বণিকরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে ইংরেজ বণিকরা তখন ব্যবসায় বাণিজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ অবস্থায় ফরাসিদের ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইংরেজদের মতো ফরাসিদের এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে এই দুই ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, কৃটকোশল, উন্নত রণ কৌশলের কাছে শেষ পর্যন্ত ফরাসিদের পরাজিত হয়। তাছাড়া বাংলার নবাবের পক্ষ অবলম্বন করায় এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য তাদেরকে আরও পর্যুদন্ত করে ফেলে। স্বাভাবিকভাবে বাংলায় অবস্থিত ফরাসি কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের যুদ্ধসমূহে ফরাসি কোম্পানির পরাজয় তাদের এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। প্রথমে পর্তুগীজ পরে ওলন্দাজ শক্তির পতন, সর্বশেষে ফরাসিদের পরাজয় ভারতে ইংরেজ শক্তির উত্থানের পথ সুগম হয় এবং এ অঞ্চলে তারা অপ্রতিদ্রুতী শক্তিতে পরিণত হয়। একশ বছর অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এদেশে কোম্পানির শাসন চলে।

| | |
|--|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) | <ul style="list-style-type: none"> উপমহাদেশে পতুগিজদের স্থাপিত বাণিজ্য কুঠিগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। যে তিনটি ধারাকে কেন্দ্র করে কোলকাতার জন্ম তার একটি তালিকা তৈরী করুন। |
|--|--|

 সারসংক্ষেপ

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনপোল অটুমান তুর্কিদের দখলে চলে গেলে, উপমহাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভারতবর্ষে আসার ভিন্ন পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই পথ আবিষ্কারে প্রথম সফল হন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। সর্ব প্রথম পর্তুগিজরাই ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আসে। তাদের পথে আসে হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংরেজ এবং ফরাসিস্থান। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে, প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে যায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানি স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে বাংলা পরে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়। একশ বছর অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত চলে এদেশে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন এবং চৰম শোষণ।

 পাঠ্যনির্দেশন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

পাঠ-৮.২ বাংলায় ইংরেজ ক্ষমতা দখল



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পলাশী যুদ্ধের কারণ ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নবাবের পতনের কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বঙ্গারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখলের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

পলাশীযুদ্ধ, আলীবদ্দী খান, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, আলীনগর সঞ্চি, রবার্ট ক্লাইভ, সিন

ক্র

পলাশী যুদ্ধের কারণ

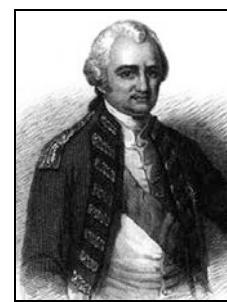
১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব আলীবদ্দী খানের মৃত্যু হলে তার প্রিয় দৌহিত্রি সিরাজউদ্দৌলা ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। এসময় তাকে নানামুখি ষড়যন্ত্র ও সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এর মধ্যে একটি পরিবারিক ষড়যন্ত্র। যা নবাব কৌশলে দমন করতে সক্ষম হন। কিন্তু পরিবারের বাইরেও ষড়যন্ত্রের আরেক জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এর সঙ্গে জড়িত হয় দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি, নবাবের সেনাপতি মীর জাফরসহ আরো অনেকে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশী যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে থাকে। নিম্নে পলাশী যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করা হলো—



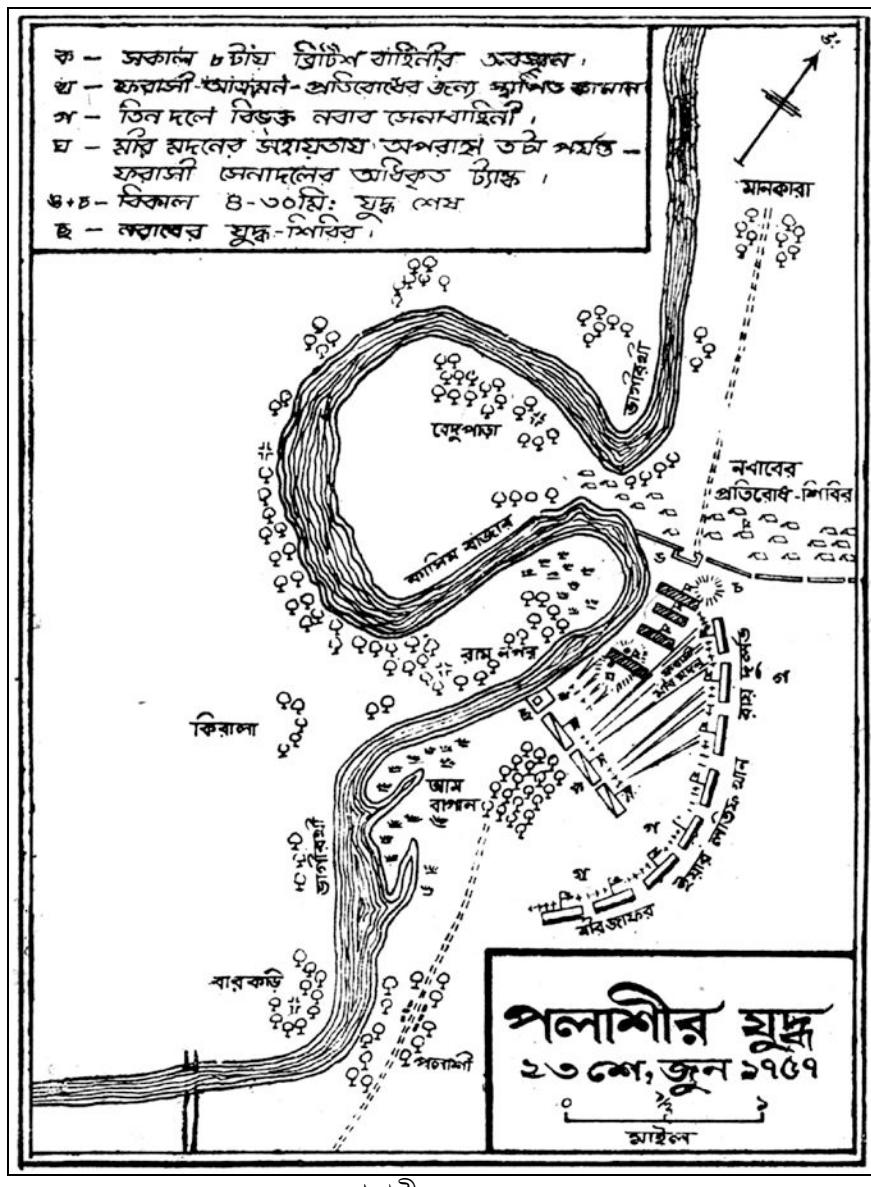
নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজরা সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসার পর নতুন নবাবকে কোনো উপচৌকন পাঠায়নি এবং কোন সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেনি। ইংরেজদের এই ব্যবহারে নবাব ক্ষুণ্ণ হন।
- নবাবের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত রাখে।
- ইংরেজরা বাণিজ্যিক শর্ত ভঙ্গ করে নবাবের আদেশ অগ্রহ্য করে দস্তকের (অনুমতি) অপব্যবহার করে।
- আলীবদ্দী খানের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ইংরেজরা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাছাড়া জনগণকে নির্যাতন করার মতো ধৃষ্টতাও তারা দেখাতে থাকে।
- রাজা রাজবল্লভের পুত্র প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নেয়। নবাবের দৃত তাকে ফেরত চাইতে গলে আপমানিত হন।

ইংরেজ কোম্পানির একের পর এক ধৃষ্টতার জন্য উচিত শিক্ষা দিতে নবাব কোলকাতা ও ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে নেয়। নবাব অতর্কিতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজরা ভয়ে দুর্গ ত্যাগ করে। কিন্তু এ সময় একটি ছোট ঘরের মধ্যে বন্দি অবস্থায় শাসরণ্দৰ হয়ে ১২৩ জনের মতো ইংরেজের মৃত্যুর গুজব মাদ্রাজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন সৈন্যে উপস্থিত হয়ে কোলকাতা পুনরায় দখল করে। এ সময়ে নবাব তাঁর চারিদিকে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে এক অপমানজনক সঞ্চি করতে বাধ্য হন। যে সঞ্চিকে বলা হয় আলীনগর সঞ্চি।



রবার্ট ক্লাইভ



পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র

নবাবের পতনের কারণ

রবার্ট ক্লাইভ আলীনগর সঁদি নবাবের দুর্বলতার প্রকাশ বলে ধরে নেয়। ফলে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয় ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎশেষ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লব, নবাবের সেনাপতি মীরজাফর প্রমুখ। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আমবাগানে নবাবের সঙ্গে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নবাবের পক্ষে ছিলেন দেশপ্রেমিক মীরমদন, মোহন লাল এবং ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে। জেতার সবধরণের সুযোগ সুবিধা এবং এদের প্রাণপাত লড়াইয়ের পরও নবাব পরাজিত হন তার সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। এ যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- নবাবের সেনাপতি মীরজাফরের অসহযোগিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।
- নবাবের সেনাপতি, সভাসদসহ প্রত্যেকে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজ নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন।
- তরুণ নবাবের অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তার অভাব ছিল। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- সেনাপতি মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা জানা সত্ত্বেও তিনি বার বার তার উপর নির্ভর করেছেন।

- ইংরেজদের সম্পর্কে আলীবদ্দী খানের উপদেশ, সতর্কবাণী সিরাজউদ্দৌলার কাছে গুরুত্ব পায়নি।
- নবাবের শক্র পক্ষ ছিল ঐক্যবন্ধ এবং তাদের রণকোশল ছিল উন্নততর।
- রবার্ট ক্লাইভ ছিল দূরদর্শী, সূক্ষ্ম ও কৃট বুদ্ধিসম্পন্ন।

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল

- সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু বাংলায় প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের পথ সুগম করে।
- যুদ্ধের ফলে মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসালেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল রবার্ট ক্লাইভের হাতে।
- পলাশী যুদ্ধের ফলে ইংরেজ বা বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পায়। অপরদিকে ফরাসিরা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।
- এ যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তির স্বার্থে এদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে।
- পলাশী যুদ্ধের সুদূর প্রসারী পরিণতি ছিল সমগ্র উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা। এ ভাবেই এ যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা ভূলুষ্ঠিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পলাশীর যুদ্ধ একটি খন্দযুদ্ধ হলেও বাংলা তথা উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূর প্রসারী।

বক্সারের যুদ্ধের কারণ

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক কোম্পানি মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। কিন্তু যে উদ্দেশে মীর জাফরকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল কোম্পানির সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নতুন নবাব কোম্পানির চাহিদা মতো অর্থ দিতে ব্যর্থ হয়। অপর দিকে রাজকার্যে ক্লাইভের ঘন ঘন হস্তক্ষেপ, নবাবের পছন্দ ছিল না। ফলে নবাব ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য গোপনে ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁতাত করেন। বিষয়টি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে তারা নতুন নবাবের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অক্ষমতা, ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁতাত এবং অযোগ্যতার অভিযোগ তোলে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইংরেজ গভর্নর ভ্যাস্টার্ট ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে শর্ত সাপেক্ষে সিংহাসনে বসান। কিন্তু মীর কাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি চেয়ে ছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করে আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। এ উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ গুলোই শেষ পর্যন্ত বক্সারের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—



মীর জাফর

- মীর কাশিম ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং প্রশাসনকে প্রভাবমুক্ত করার উদ্দেশে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঝেরে স্থানান্তরিত করেন। নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ করেন এবং রাজধানী চারদিকে পরিখা খনন করেন।
- ইংরেজদের সভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা এবং সৈনিকদের ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য দুজন ইউরোপীয় সৈনিককে প্রশিক্ষক হিসেবে রাখেন।
- অস্ত্র গোলাবারণের জন্য যাতে কারো উপর নির্ভর করতে না হয় সেজন্য রাজধানীতে কামান, বন্দুক ইত্যাদি তৈরির ব্যবস্থা করেন।
- বিহারের শাসনকর্তা রাম নারায়ণ ইংরেজদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখালে তাকে পদচুত ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
- ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাটের ফরমানে ইংরেজদের ব্যবসায় করার যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল তারা তার অপব্যবহার করা শুরু করে। দন্তক নামের ছাড়পত্রের অপব্যবহারের ফলে দেশি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ফলে, নবাব সবার জন্য এক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশীয় বণিকদের জন্যও সবধরণের শুল্ক উঠিয়ে দেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া লাভজনক ব্যবসায় অসুবিধা হয়। এ বিষয়ে নবাব কেনোরকম আপোষ করতে না চাইলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।
- নবাবের সকল পদক্ষেপ ছিল দেশ ও জনগণের স্বার্থে, কিন্তু ইংরেজ স্বার্থবিরোধী। ফলে ক্ষুব্ধ ইংরেজরা এর প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

বক্সারের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

নবাবের ইংরেজ স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমে শুরু হয়ে পাটনা কুঠিরের অধ্যক্ষ এলিস ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে পাটনা দখল করে নেয়। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া নবাবের আর কোনো উপায় থাকে না। মীর কাশিম সফল প্রতিরোধের মাধ্যমে এলিসকে পাটনা থেকে বিতাড়িত করেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে নবাব শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ইতোমধ্যে ইংরেজরা মীর জাফরকে আবার বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম পরাজিত হয়েও হতাশ হননি। নবাব ইংরেজদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন যা ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মিলিত বাহিনী, মেজর মনরোর কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়। মীর কাশিমের পরাজয়ের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্বারের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংরেজ শক্তি অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাংলা তথা উপমহাদেশের সর্বত্র ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে থাকে। এ কারণে উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি।

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল

বক্সারের যুদ্ধ উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সুদূর প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- এ যুদ্ধের ফলে মীর কাশিমের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপমহাদেশে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিনা বাধায় তারা উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।
- এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখ্তে পালিয়ে যান। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। মীর কাশিম পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন।
- ইংরেজরা অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে কারা এলাহাবাদ হস্তগত করতে সক্ষম হয়।
- এ যুদ্ধের ফলে শুধু বাংলার নবাবই পরাজিত হননি, তাঁর মিত্র ভারত সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা পরাজিত হন। এই তিন শক্তির একসঙ্গে পরাজয়ের কারণে ইংরেজদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- এ যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লি সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত হয় এবং তারা অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে থাকে।

বক্সারের যুদ্ধ মীর কাশিমের শাসন এবং নবাবী আমলেরই শুধু পরিসমাপ্তি ঘটায়নি, মুঘল সম্রাটের দুর্বলতাও ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে দ্রুতগতিতে ইংরেজদের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে থাকে।

| | |
|---|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <ul style="list-style-type: none"> ● পলাশীযুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এবং তার পক্ষে অবস্থানকারীদের একটি চার্ট তৈরি করতে হবে। ● বক্সারের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম ও তাদের দেশের নাম পাশাপাশি রেখে একটি ছক প্রস্তুত করুন। |
|---|--|

সারসংক্ষেপ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের কারণে বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশংস্ত হয়। তবে পলাশীর বিজয়ে কোম্পানির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হয়নি। সে জন্য তাকে আরো একটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। মীর জাফর ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে তাকে সরিয়ে মীর কাশিমকে সিংহাসনে শর্তসাপেক্ষে বসানো হয়। স্বাধীনচেতা মীর কাশিম ইংরেজদের অনুগত না হয়ে স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাংলার নবাব একা পরাজিত হননি তাঁর সাথে তার মিত্র দিল্লির সম্রাট শাহ আলম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও পরাজিত হন। এই তিন শক্তির এক সঙ্গে পরাজয়ের কারণে ইংরেজদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ সুনিশ্চিত হয়। যার পরিণতিতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একশব্দের অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই উপমহাদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়।

পাঠ্য মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। পলাশীযুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?

- ক) ১৭৫৬, ১৩ জুন
গ) ১৭৬৪, ১২ জুন

খ) ১৭৫৭, ২৩ জুন
ঘ) ১৭৬৩, ৩০ জুন

২। পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারতে-

- ক) বাংলার স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান হয়
গ) মহল সম্পাদনের ক্ষমতা সস্থত হয়

খ) বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়
ঘ) ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসনের পথ প্রশংস্ত হয়

৩। পলাশীর যন্দে নবাবের পক্ষে প্রাণপণ যন্দে পরিচালনা করেন- (অনুধাবন)

- i) মীর জাফর ii) মীর মদন iii) মোহন লাল

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- ক) i ও ii
গ) ii ও iii

খ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

ଚିତ୍ରଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ ୩ ଓ ୪ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦିନ



৪। উপরের চিত্রটি কোন ঘনের সাথে সম্পর্কিত?

- ক) পলাশীর যুদ্ধ
খ) বক্সারের যুদ্ধ^১
গ) গিরিয়ার যুদ্ধ
ঘ) ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ

୫ | ଉକ୍ତ ସନ୍ଦେ ଇଂରେଜରା ଜୟୀ ହୁଏ

- i) ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ii) বীরত্তের সাথে যুদ্ধ করে iii) অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- ক) i ও ii
গ) i ও iii
খ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সজনশীল

৬। 'ক' নামের একটি দেশের সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে জাতি গোষ্ঠী আসতে থাকে। একপর্যায়ে ক দেশের সাথে আগত খ দলের যুদ্ধ হয়। ক দলের সৈন্য রসদ বেশি থাকলেও তাদের দুই জন সেনাপতি রোবটরপী সেনা মোতায়েন করে যাদের মেমোরিতে যুদ্ধ না করার কমান্ড থাকায় তারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চূপ দাঁড়িয়ে থাকে। ফলক্ষণতত্ত্বে ক দলের দাঁধঁখজনক পরাজয় ঘটে ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়।

ক সিরাজউদ্দোলা কবে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন?

খ ঘোড়শ শতকে অনেক ইউরোপীয় জাতি বাংলায এসেছিল কেন?

গুড়ীপকে উল্লিখিত যদ্বাটি পার্শ্ব বইয়ের যে যদ্বের প্রতিষ্ঠাৰি সে যদ্বের মূল কাৰণ বাখ্যা কৰণ।

ঘ. “উক্ত যন্ত্রেই বাংলার স্বাধীনতা সর্বকে দইশত বছরের জন্য ছিনিয়ে নেয়” - মতামত দিন।

পাঠ-৮.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।



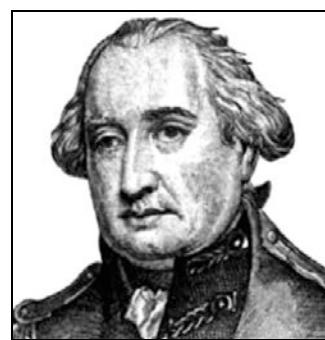
মুখ্য শব্দ (Key Words)

এক সালা বন্দোবস্ত, পাঁচ সালা বন্দোবস্ত, দশ সালা বন্দোবস্ত, জমিদার, অনুপস্থিত জমিদার, প্রজাস্বত্ত্ব আইন, পুঁজি, সূর্যাস্ত আইন

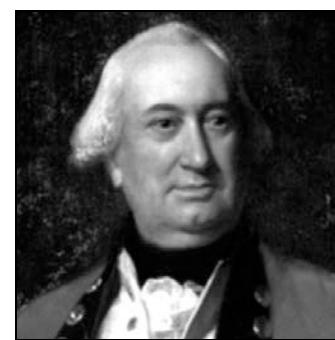
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি:

লর্ড কর্নওয়ালিসকে কোম্পানির শাসন দুর্নীতিমুক্ত ও সুসংগঠিত করতে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনা প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ বছর ২২ মার্চ নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের নিজ নিজ জমির উপর স্থায়ী মালিকানা দান করে যে ভূমি বন্দোবস্ত চালু করা হয় তাকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলা হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। জমি বন্দোবস্তের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকায় জমিদাররা অর্থ আদায়ের জন্য কৃষকদের প্রতি চরম নির্যাতন মূলক ব্যবস্থা নিতে। অথচ কৃষকের বা জমির উন্নয়নের প্রতি তাদের কোনো লক্ষ ছিল না। ফলে নির্যাতনের ভয়ে কৃষকরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যেতো। বছরের পর বছর জমি অনাবাদিথাকায় জমির দাম কমে যেতে থাকে। এ অবস্থায় হেস্টিংস জমিদারদের সঙ্গে এক



লর্ড কর্নওয়ালিস



ওয়ারেন হেস্টিংস

সালা বন্দোবস্ত চালু করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায়ও সরকার, জমিদার, প্রজা কারো কোনো ধরনের উপকার হয়নি। ফলে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব সমস্যা সমাধানের জন্য ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাস্ট পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ জমিদারদের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্তের অনুমতি প্রদান করে। এই অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। একই সঙ্গে এই প্রতিশ্রূতি দেন যে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর অনুমোদন লাভ করে, কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করেন।

বৈশিষ্ট্য

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জমির স্থায়ী মালিকে পরিণত করে এবং জমিদাররা জমির মালিকানা স্বত্ত্ব লাভ করে।
- রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়ার ফলে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমিদার জমিদারী ভোগের চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করে।

- এ প্রথম চালু হওয়ার ফলে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। সরকার স্বয়ং শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- নজরানা ও বিক্রয় ফি সমূহ বাতিল করা হয়।
- খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের ভূমির কিছু অংশ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা ছিল।

ফলাফল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। কর্ণওয়ালিস জমিদার ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও একটি জমিদার শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপ আর উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও তার বিকাশের ধরণ এক ছিল না। ফলে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া এ ব্যবস্থায় সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হয়েছিল বেশি।

সুবিধা

- এ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে সরকারের রাজস্ব আয় সুনির্দিষ্ট হওয়ার ফলে সরকার তার আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্টি জমিদার শ্রেণি কোম্পানির একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠে। ফলে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়করণ এবং দীর্ঘায়িতকরণে জমিদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।
- জমিদাররা জমির মালিক হওয়ার কারণে উৎসাহিত হয়ে পতিত জমি, জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির রাজস্বের উন্নতি হয়।

অসুবিধা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। তারা ধীরে ধীরে ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। কিন্তু অপর দিকে জমিতে প্রজাদের পুরোনো স্বত্ত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ফলে জমিদার ইচ্ছে করলেই যেকোনো সময় তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। প্রথম দিকে প্রজাসত্ত্ব আইন না থাকায় তাদের ভাগ্যের জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করতো।

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির সঠিক জরিপের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় নিষ্কর জমির উপর বেশি রাজস্ব ধার্য করা হতো। জমির সীমা নির্ধারিত না থাকায় পরবর্তিকালে মামলা বিবাদ দেখা দিতো।
- সূর্যাস্ত আইনে নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা পরিশোধ করার কঠোর নিয়মের কারণে অনেক বড় বড় জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একমাত্র বর্ধমানের জমিদারী ছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাত বছরের মধ্যে অন্যান্য সব জমিদারী ধ্বংস হয়ে যায়।
- জমিদারি আয় ও স্বত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জমিদাররা নায়েব-গোমস্তার উপর দায়িত্ব দিয়ে শহরে বসবাস শুরু করেন। এইসব অনুপস্থিত জমিদারদের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে জমির উৎপাদন করে যেতে থাকে, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও থারাপ হতে থাকে।
- উপমহাদেশে জমির মালিকানা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। ফলে নিম্নবর্ণের অনেক ব্যক্তি, সাধারণ মানুষ যারা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালিক হন, তারা জমিদারী কিনে আভিজাত্যের মর্যাদালাভে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে দেশীয় পুঁজি, দেশীয় শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনাহাস পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা সরাসরি জমিদার কর্তৃক শোষিত হতে থাকে। আবার এই জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে গ্রামীন সমাজে একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, যারা পরবর্তী সময়ে দেশ জাতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্টি জমিদার শ্রেণি যারা প্রথমদিকে ব্রিটিশ সম্ভাজ্যের শক্ত ভিত ছিল, তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ রাজ উৎখাতের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

| | |
|--|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) / শিক্ষার্থীর কাজ | চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি ও প্রজাদের কী ধরণের ক্ষতি হয়েছিল এবং জমিদারদের কী ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল |
|--|---|

সারসংক্ষেপ

ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্ত এবং একসালা বন্দোবস্ত করে ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। তবে এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে কর্ণওয়ালিস প্রথমে দশসালা পরে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল হলেও বাংলার সাধারণ ক্ষমতা এমনকি অনেক সম্ভাস্ত বনেদি জমিদার সর্বশাস্ত হয়ে যায়। নবসৃষ্ট জমিদার শ্রেণি ইংরেজ শাসন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও এদের পরবর্তী প্রজন্ম, সুশক্ষিত সচেতন শ্রেণি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতারণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা নেতৃত্ব ছিল মুখ্য।

পাঠ্যের মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক কে?

- | | |
|----------------|---------------------|
| ক) লর্ড ক্লাইভ | খ) লর্ড কর্ণওয়ালিস |
| গ) লর্ড রিপন | ঘ) লর্ড ডালহোসি |

২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল-

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ক) ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত | খ) বাণিজ্য সংক্রান্ত বন্দোবস্ত |
| গ) শাসন সংক্রান্ত বন্দোবস্ত | ঘ) শিল্প সংক্রান্ত বন্দোবস্ত |

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে-

- i) জমিদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়
- ii) প্রজাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়
- iii) প্রজাদের পুরানো স্বত্ত্ব বিলুপ্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কে জমির মালিক হয়েছিল- (জ্ঞানমূলক)

- | | |
|-----------|-----------|
| ক) ক্ষমতা | খ) নবাব |
| গ) জমিদার | ঘ) সম্রাট |

৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানি আয় কেমন ছিল (অনুধাবন)

- | | |
|--------------|---------------|
| ক) কম | খ) বেশি |
| গ) নির্দিষ্ট | ঘ) অনির্দিষ্ট |

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

চাপিতলার প্রজাবৎসল জমিদার কাশেম ভুঁইয়া সর্বদা প্রজার পাশে থাকতেন কিন্তু একদিন নির্দিষ্ট দিনে খাজনা জমা দিতে ব্যর্থ হলে তার জমিদারি নিলামে ওঠে, নিলামে জমিদারি কিনে নেন ব্যবসায়ী শক্তর মজুমদার। তিনি প্রজাদের জোর করে হলেও নিয়মিত খাজনা আদায় করতেন।

৬। কাশেম সাহেবের জমিদারি নিলামে ওঠে কোন আইনের বলে-

- | | |
|------------------|----------------|
| ক) সূর্যাস্ত আইন | খ) ইলবার্ট বিল |
| গ) রওলাট আইন | ঘ) নিয়ামক আইন |

৭। কাশেম সাহেব যে আইনের বলে জমিদারি হারান সে আইনের উদ্যোগ কে?

- | | |
|---------------------|----------------|
| ক) ওয়ারেন হেষ্টিংস | খ) জন কাটিয়ার |
| গ) লর্ড কর্ণওয়ালিস | ঘ) লর্ড ক্লাইভ |

সৃজনশীল

হাবীব সাহেব তাঁর মেডিকো নামের উষধের দোকানটিতে যতাযথভাবে সময় না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাই তিনি ১টি চুক্তি পত্রের মাধ্যমে ইকবাল সাহেবের নিকট দোকানটি হস্তান্তর করেন। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলো। উক্ত চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাড়ার অর্থ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু ইকবাল সাহেব নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে দোকানটি হাতছাড়া হয়ে যায়। কর্ম হারিয়ে তিনি হন সর্বস্বান্ত।

ক. একসালা বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন?

খ. পাঁচসালা বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদীপকের গৃহিত পদক্ষেপ লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত কোন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত ব্যবস্থায় যে নতুন জমিদার শ্রেণির উভব ঘটে তারা ইংরেজদের ক্ষমতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল – মতামত দিন।

ক্লিয়ে উত্তরমালা

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ক

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. গ

পাঠোন্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. গ

ইউনিট ৯

বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রভাব

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে ইংরেজরা শুধু এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাই দখল করেনি; শুরু করে চরম অর্থনৈতিক শোষণ। বঙ্গারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়ে, এ শোষণের পথ আরো প্রস্তুত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের আগেই ঘৃষ, ভেট, ব্যক্তিগত পারিতোষক, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি আদায়ের নামে নবাব, নবাবের পরিবার এবং সদ্ব্যবস্থা মুসলিম পরিবার গুলোকে প্রায় নিঃস্ব করে ফেলে। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক কোম্পানি হিসেবে নিজেদের বাণিজ্যের স্বার্থে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করে, এদেশের বন্দু শিল্প, কুঠির শিল্প, চিনি, লবণ শিল্প ইত্যাদিকে। ক্ষমতা লাভের পর দৈত শাসন ব্যবস্থা নামের এই অভিনব ব্যবস্থায় চরম দারিদ্রের শিকার হয় বাংলার কৃষকরা। এই ব্যবস্থার মর্মান্তিক প্রকাশ ঘটেছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। যে দুর্ভিক্ষে বাংলার একত্তীয়াৎ্থ মানুষের মৃত্যু ঘটে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতালাভের পথগুলি বছর পর্যন্ত চলে কান্তজ্ঞানহীন শোষণ।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আইন ও সংস্কারের মাধ্যমে যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়, তাও ছিল ইংরেজ শাসন শোষণের স্বার্থে। সত্যিকার অর্থে প্রায় দুইশ বছর ব্রিটিশ শাসন কালে যা কিছু উন্নতি হয়েছে সব কিছু ব্রিটিশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থে হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : অর্থনৈতিক শোষণ ও দুর্ভিক্ষ

পাঠ-৯.২ : বাংলায় ইংরেজদের সংস্কার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৯.১ অর্থনৈতিক শোষণ ও দুর্ভিক্ষ



এই পাঠ শেষে আপনি

- ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- দৈত শাসন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে পারবেন।



মুক্ত শব্দ (Key Words)

বন্দুশিল্প, চরকা, তাঁত, লবণ শিল্প, কাঁচামাল, মুদ্রা অর্থনীতি, শিল্পবিপ্লব, মহাজন শ্রেণি, দৈত শাসন, ছিয়ান্তরের মন্দত্ব, দেওয়ান



১.১. অর্থনৈতিক শোষণ

মধ্যযুগে বাংলায় যে সম্মত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল তা কোম্পানির শোষণ শাসনের কারণে ভেঙে পড়ে। বাংলার অভিজাত পরিবার থেকে কৃষক পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় বাংলার কুটির শিল্প, বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, নতুন শিল্প গড়ে ওঠার প্রবণতা।

সতেরো এবং আঠারো শতকে যখন ইংরেজ কোম্পানি ধীরে ধীরে এ অঞ্চল গ্রাস করার পাঁয়তারা করছে তখনও বাংলা ছিল বন্দু শিল্প সম্মত এবং বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিযোগ্য অঞ্চল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যবসায়ই ছিল এদেশ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করে প্রচুর লাভের বিনিময়ে এ সমস্ত পণ্য ব্রিটেন অথবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করা। এ সময় বিশেষ করে বাংলা বিহারের চরকা এবং হাতে চালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় ঢিকে থাকার মতো বন্দুশিল্প ইংল্যান্ড কেন, সমগ্র ইউরোপে কোথাও প্রস্তুত হতো না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত এই সমস্ত বন্দু ব্রিটেন ও ইউরোপের বাজার প্লাবিত করে ফেলে। অপর দিকে ইউরোপে প্রস্তুত নিম্নমানের বন্দু বাংলার উন্নতমানের বস্ত্রের কাছে মার খেতে থাকে এই অবস্থায় ব্রিটিশ বন্দু শিল্পের মালিকরা বাংলা তথা ভারতীয় বন্দু আমদানির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে ধীরে ধীরে ব্রিটেনের বাজারে এ অঞ্চলে প্রস্তুত বন্দু প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া বাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকে লুঁঠিত ধন-সম্পদ ব্রিটেনের কলকারখানায় বিনিয়োগের ফলে ব্রিটেনে শুরু হয় অভূতপূর্ব বিপ্লব ইতিহাসে যা শিল্পবিপ্লবের নামে খ্যাত। শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল এবং নিশ্চিত এক বাজারের। আর সে বাজার এমন হবে যা হারাবার শংকা কম। অধিকৃত বাংলা তথা ভারতবর্ষ পরিণত হলো ব্রিটিশ পণ্যের সেই বিশাল নিশ্চিত বাজারে। ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থে বলি হতে হলো বাংলার বন্দুশিল্পকে, বন্ধ হয়ে গেল এর উজ্জ্বলতম সহাবনার দ্বার।

অপরদিকে বাংলার বন্দুশিল্প থেকে লবণ শিল্প পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বাংলার জনগণের কৃষি ছাড়া আর কোনো জীবিকার উপর নির্ভর করার উপায় ছিল না। অথচ আকস্মিক ভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার ফলে বাংলার কৃষক শ্রেণি একদিকে সর্বগ্রাসী জমিদার শ্রেণি এবং অপরদিকে ব্রিটিশ পণ্যের নির্মম শোষণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একটাই- বিশেষ অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যার ফলে এটা প্রায় নিয়ম হয়ে যায় যে ভারতীয় কৃষক কেবল ব্রিটিশ শিল্প কারখানাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করবে আর তাদের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ক্রয় করবে। তাছাড়া মুদ্রা অর্থনীতি চালু এবং শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে হাজার বছরের প্রাচীন গ্রাম সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশ ভারতে কৃষকদের তিন ধরনের শোষকের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন: প্রথম ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি, যারা আদায় করত ভূমি রাজস্ব। দ্বিতীয় জমিদার শ্রেণি; যারা আদায় করত খাজনা এবং তৃতীয় শোষক মহাজন শ্রেণি, যাদের দিতে হতো ঝণের সুদ হিসেবে কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের সবটাই। এভাবে ইংরেজ শাসকদের অর্থনৈতিক শোষণে শিকার হয়ে অভিজাত, কুটিরশিল্প-শ্রমিক, কৃষক নিঃস্ব হয়ে যায়। বাংলা তথা ভারতীয় জনগণ পরিণত হয় বিরাট এক দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে।

১.২ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরাই বাংলার সত্যিকার শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়। মূলত বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাটের পরাজয় ইংরেজ শক্তিকে এই ক্ষমতা লাভের সুযোগ করে দেয়। মুঘল শাসন আমলে বাংলার দেওয়ানের পদ এবং সুবেদারের পদ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদ কুলি খান এই নিয়ম ভেঙে দুটি পদ একাই দখল করে নেন। তার সময় কেন্দ্রে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো হলেও পরবর্তিকালে অনেকেই তা বন্ধ করে দেন। আলীবদ্দী খানের সময় থেকে একবারেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট কোম্পানিকে বাংসরিক উপচৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণের অনুরোধ করেন। তখন কোম্পানি বিষয়টি অগ্রহ্য করে। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পর ক্লাইভ দ্বিতীয়বার (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ভারতবর্ষে এলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

ক্লাইভ দেশ থেকে ফিরে প্রথমেই পরাজিত অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাটের দিকে নজর দেন। তিনি অযোধ্যার পরাজিত নবাবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তার বিনিময়ে আদায় করে নেন কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি। যুদ্ধের

ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অপরদিকে দেওয়ানি শর্ত সম্পর্কিত দুটি চুক্তি করেন। একটি দিল্লির স্মাট শাহ আলমের সঙ্গে, এতে কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি দান করা হয়। এর বিনিময়ে ছাবিশ লক্ষ টাকা নবাব প্রতিবছর স্মাটকে পাঠাবেন। এই টাকা নিয়মিত পাঠাবার জামিনদার হবে কোম্পানি। ইতিহাসে এটি এলাহাবাদ চুক্তি নামে পরিচিত। অপর চুক্তিটি হয় মীর জাফরের নাবালক পুত্র নবাব নাজিম-উদ-দৌলার সঙ্গে। বাংসরিক তেঙ্গান লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাব কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সকল শর্ত মেনে নেন। এই দুটি চুক্তির ফলে যে দেওয়ানি লাভ করা হয় তাতে এ অঞ্চলে কোম্পানির ক্ষমতা একচেটিয়া বৃদ্ধি পায়। ফলে সমস্ত ক্ষমতা চলে যায় কোম্পানির হাতে। অপরদিকে দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানির সমস্ত খরচ কুলিয়ে ব্যবসায়ের সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সুতরাং দেওয়ানির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে-

- দেওয়ানি লাভ কোম্পানির শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশাল বিজয়।
- স্মাট ও নবাব উভয়েই ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে তারা হয়ে যান কোম্পানির পেনশনভোগী কর্মচারী।
- দেওয়ানি লাভের ফলে এবং নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী শুল্কহীন বাণিজ্যের কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের অর্থ লোভ দিনদিন বেড়ে যেতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে দেশীয় বণিক শ্রেণি, সাধারণ মানুষ। তাদের অর্থনৈতিক মেরদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।
- দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। এর পরিমাণ এতটাই ছিল যে এই অর্থের বলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

দ্বৈত শাসন ও দুর্ভিক্ষ

রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানি সনদের নামে বাংলার সম্পদ লুঠনের একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে। দিল্লি কর্তৃক বিদেশি বণিক কোম্পানিকে এই অভিবিত ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। অর্থাৎ যাতে করে কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব পরিণত হন ক্ষমতাহীন শাসকে। অথচ নবাবের দায়িত্ব থেকে যায় শোলানা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। যার চরম মাসুল দিতে হয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

যা ছিয়াতরের মন্ত্রণার নামে পরিচিত। কোম্পানির মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের ভাষায় ‘দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতিসত্য।’ এই দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মৃত্যু বরণ করে। অথচ ইংরেজ সরকার বাংলার জনগণকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরাং ১৭৬৫-৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল, দুর্ভিক্ষের বছরও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় তার কাছাকাছি ছিল। ফলে চরম শোষণ নির্যাতনে বাংলার মানুষ হত দরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। সারাদেশে শুরু হয় সীমাহীন বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান।

| | |
|--|--|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | ইংরেজ শাসনের সূচনায় দেওয়ানি লাভ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিষয়টির উপর একটি দলীয় বিতর্কের আয়োজন করছেন। |
|--|--|

সারসংক্ষেপ

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে উপমহাদেশের তিন শক্তি দিল্লীর স্মাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, বাংলার নবাব মীর কাশিমের পরাজয় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখল এবং অর্থনৈতিক শোষণের পথ খুলে দেয়। কোম্পানির ক্ষমতা লাভের আগেই এ অঞ্চলের ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্পের ক্ষতি করে নিজেদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। দেশীয় শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে কোম্পানির ক্ষমতা দখল, দেওয়ানি লাভ এ অঞ্চলের জনগণের জন্য

চরম দুর্ভাগ্যের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। এর ফলে যে দৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয় তার ফল ভোগ করতে হয় জনগণকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিদেশি কোম্পানির চরম অর্থনৈতিক শোষণে নিঃস্ব হয়ে যায় বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা কৃষি কার্যের সঙ্গে যুক্ত। ফলে ভেঙ্গে পড়ে কৃষি ব্যবস্থা, দেখা দেয় সারা বাংলা ব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মম্বাত্তর নামে পরিচিত। যাতে মৃত্যুবরণ করে বাংলার একত্তীয়াৎশ মানুষ। কোম্পানির শোষণে, কোম্পানির স্বার্থে ধ্বংস করা হয় বাংলার বস্ত্রসহ অন্যান্য শিল্প। এবার কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

ପାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଯନ-୯.୧

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। দৈত শাসন নীতির প্রবর্তক কে? (জ্ঞানমূলক)

- | | |
|------------|----------------|
| ক) বেন্টিক | খ) হেস্টিংস |
| গ) ক্লাইভ | ঘ) কর্ণওয়ালিস |

২। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলায় কত লোকের মৃত্যু ঘটে?

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক) এক-তৃতীয়াৎশ | খ) এক-চতুর্থাংশ |
| গ) এক-পঞ্চমাংশ | ঘ) দুই-তৃতীয়াৎশ |

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আজও চিরশিল্পী জয়নুল আবেদীনের আঁকা দুর্ভিক্ষের চিত্র ১৯৪৩ সকলের নিকট হৃদয়স্পর্শী হয়ে আছে। তার দুর্ভিক্ষের চিত্রগুলোতে অনাহারী মানুষের দৃঢ় কষ্ট আর মৃত্যুর দৃশ্য সে সময়ে ভয়াবহতার এক জলন্ত দৃশ্যপট।

৩। উদ্বীপকের অনুরূপ যে দুর্ভিক্ষ কোম্পানির দৈত শাসনামলে সংগঠিত হয়, তা কী নামে পরিচিত?

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ক) ছেচালিশের দুর্ভিক্ষ | খ) ছিয়াত্তরের মম্বাত্তর |
| গ) নববইয়ের দুর্ভিক্ষ | ঘ) তেতালিশের মম্বাত্তর |

৪। উক্ত দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান কে?

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ক) লর্ড ক্লাইভ | খ) ওয়ারেন হেস্টিংস |
| গ) লর্ড বেন্টিক | ঘ) কর্ণওয়ালিস |

সৃজনশীল প্রশ্ন

আন্তন ও আকরামের পিতার অবর্তমানে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুন ফিশারিজের মালিকানা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বড়ভাই আন্তন নিজে ফিশারিজের পরিচালনার দায়িত্ব নেয় এবং ছোট ভাই আকরামকে সংসারের দেখাশোলার দায়িত্ব অর্পণ করে। কিন্তু ফিশারিজের আয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় সংসারে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা।

ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিক হন কে?

- খ) উদ্বীপকের দায়িত্ব গ্রহণ ও অর্পণের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনা সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।
গ) আপনি কি মনে করেন উক্ত ঘটনার মত ক্ষমতা ভাগাভাগির ঘটনা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-৯.২ বাংলায় ইংরেজদের সংক্ষার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় ইংরেজদের সংক্ষারসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

| | |
|-----------------------------------|---|
| মুখ্য শব্দ (Key Words) | রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব সংক্ষার, কালেক্টর, দেওয়ানি, কাষি, মুফতি, জুড়ি ব্যবস্থা, কমিশনার, চার্লস-উড, ছোট লাট, সিভিল সার্ভিস, সতীদাহ প্রথা |
|-----------------------------------|---|



২.১ বাংলায় ইংরেজদের সংক্ষার: প্রায় দুশ বছর বাংলায় ইংরেজ শাসন আমলে যেমন তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ রাজনৈতিক নিপীড়ণ চলেছে, তেমন বিভিন্ন সংক্ষারের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে একটি আধুনিক সমাজে পরিণত করার ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। তবে সবই করা হয়েছে ইংরেজ শাসকদের প্রয়োজন আর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে।

অর্থনৈতিক সংক্ষার

কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার নামে যে ভাবে রাজস্ব আদায় শুরু করে তার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (১৭৭৬ খ্রি): ফলে নিঃস্ব কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় সম্ভব ছিল না। কোম্পানির স্বার্থে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করে। কোম্পানির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নবাবের বাংসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ১৬ লক্ষ করা হয়। সিতাব রায় ও রেজা খানকে পদচ্যুত করা হয় এবং রাজস্ব বোর্ড গঠন করে রাজস্ব সংক্ষার করা হয়। তাছাড়া কালেক্টরের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং দেওয়ানি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। পাঁচসালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের জমি ইজারা দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের ভূমির মালিক হিসেবে মেনে নেন। এবং তাদের বাংসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদানের নিয়ম চালু করেন। এই ব্যবস্থার দোষগুণ থাকা সত্ত্বেও এর প্রভাব ছিল বাংলার আর্থসামাজিক কাঠামোয় সুদূর প্রসারী। কর্ণওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থে দুর্নীতি এবং অযোগ্য কর্মচারীদের পরিবর্তে দেশী বণিকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের প্রথা চালু করেন।

বিচার ব্যবস্থা

কর্ণওয়ালিসের সময় বিচার ব্যবস্থার সংক্ষার করা হয়, একে ফৌজদারি ও দেওয়ানি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বিচার ব্যবস্থার সংক্ষারের ফলে সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বাংলা বিহার এ উড়িষ্যাকে মোট ১২টি বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগে একটি ভ্রাম্যমান কোর্ট স্থাপন করা হয়। এই আদালতের প্রত্যেকটিতে দুজন ইংরেজ বিচারক এবং আইন ব্যাখ্যার জন্য কাষি ও মুফতি নিযুক্ত করা হয়। লর্ড বেটিঙ্ক সর্ব প্রথম বিচার কাষি ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেশীয়দের ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সর্বপ্রথম জুড়ি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং ভারতীয়দের জুরির সদস্য নিযুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় বিচারকার্য সমাধার নির্দেশ দেন।

প্রশাসনিক সংক্ষার

কর্ণওয়ালিসের সময় থেকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুগঠিত ও সুসংহত করার চেষ্টা চলে। কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কোড বা বিধি প্রণয়ন করেন। কর্ণওয়ালিশ কোডে সরকারী কর্মচারীদের প্রশাসনিক নিয়ম নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে কর্ণওয়ালিস ভারতীয়দের প্রতি সদয় ছিলেন না। তাই তিনি কোনো ভারতীয়কে সরকারের উচ্চ পদে নিয়োগ দেননি। কর্ণওয়ালিস পুলিশ বাহিনীকেও প্রশাসনের শৃঙ্খলা শান্তি রক্ষার স্বার্থে সুগঠিত করেন। তিনি জেলা প্রশাসকের ওপর পুলিশ ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী থাকতেন। কোলকাতার শান্তি শৃঙ্খলার জন্য একজন সুপারিনিটেনডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। পুলিশ প্রশাসনের এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

লর্ড বেন্টিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি প্রশাসন ও বিচার বিভাগের আমূল পরিবর্তন আনেন। তিনি বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ১০টি বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগে একজন কমিশনার নিযুক্ত করেন। পরবর্তিকালে লর্ড ডালহৌসি ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য বাংলায় একজন ছেট লাট নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ স্থাপন, শাসন ব্যবস্থার সুবিন্যাসের জন্য জেলার সৃষ্টি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তাছাড়া সে সময়ে বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। তার সময়ই সর্ব প্রথম ভারতীয়দের জন্য প্রশাসনিক কার্যে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সিভিল সার্ভিস নামক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু করা হয়।

শিক্ষা সংস্কার

বাংলা তথা উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালুর কৃতিত্ব লর্ড বেন্টিকের। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী কোম্পানি শিক্ষার জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। প্রথমে শুধু সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা দান করা হতো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা চালুর সমর্থক ছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সরকারি প্রচেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজি বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় ও আইন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা মেডিকেল কলেজ, ভুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, বহুরমপুর কলেজ। ইংরেজি ভাষা প্রচলনের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে বাংলার শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটে। এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। অপরদিকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থাও চালু করা হয়।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উডের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশ নামা (Education Despatch) প্রণয়ন করা হয়। যার ফসল হিসেবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। যাকে কেন্দ্র করে বাংলায় একটি উচ্চ শিক্ষিত দৃঢ়চেতা স্বাধীনতাকামী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠতে থাকে।

সামাজিক সংস্কার

সংস্কারপন্থী বাঙালি নেতা ও শিক্ষিত শ্রেণির উদারবাদীদের সহযোগিতায় ইংরেজ শাসকরা সামাজিক ধর্মীয় অনেক অমানবিক প্রথা কুসংস্কার দূর করতে সক্ষম হন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক রাজা রামমোহন রায় প্রিস দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদারপন্থী হিন্দু নেতৃবর্গ এবং সদর নিজামত আদালতের জজদের অকৃষ্ট সমর্থনে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে সতীদাহ প্রথা রহিত করতে সক্ষম হন। স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে মরতে বাধ্য করলে তা আইনত দণ্ডনীয় বলে আইন জারি করা হয়। লর্ড এলেনবরা-এর সময়ে (১৮৪৩ খ্রিঃ) দাস প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। প্রবর্তী সময়ে দেবতার নামে শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। লর্ড ডালহৌসি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস করে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যোগাযোগ ব্যবস্থার সংক্ষরণ

কোম্পানি শাসনের শেষ দিকে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ‘উন্নয়নের যুগ’ হিসেবে পরিচিত। এ সময় রেলসড়ক নির্মাণ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। তাছাড়া রাস্তাধাট নির্মাণ ও মেরামত করার জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে একটি পূর্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্রিটিশ পণ্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণের কারণে বন্দর উন্মুক্ত হয়, ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। এসব সংক্ষরণ এ অঞ্চলের বিদেশী ইংরেজ শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ করেছিল এবং তাদের রাজত্বকে করেছিল দীর্ঘায়িত।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | বাংলায় ইংরেজদের সংক্ষরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করছি। সামাজিক সংক্ষরণে সহযোগিতাকারী দুজন বাঙালির নাম লিখুন। |
|---|---|

১৫ সারসংক্ষেপ

কোম্পানি শাসন আমলে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংক্ষরণগুলো করা হয়েছিল মূলত কোম্পানির স্বার্থে। এদেশে তাদের শাসন শোষণ দৃঢ় করার লক্ষ্যে। সামাজিক সংক্ষরণগুলো বেশিরভাগ হয়েছিল উদার পন্থী বাঙালি নেতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে। যেমন সতীদাহ প্রথা রন্ধ বিধবা বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণেই বাংলায় একটি আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। যারা ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তিকালে দেশবাসীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

১৬ পাঠোভূমি মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে চিকি (✓) চিহ্ন দিন

১। চার্লস উডের নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয় কবে?

- ক) ১৮৩৫
গ) ১৮৫৭

খ) ১৮৫৪

ঘ) ১৮৪৭

২। সতীদাহ প্রথায় সহমরণ কী? (অনুধাবন)

ক) স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে দাহ করা

খ) স্ত্রীর চিতায় স্বামীকে দাহ করা

গ) পিতার মৃত্যুতে কন্যাকে চিতায় দাহ করা

ঘ) প্রবাসে স্বামীর মৃত্যু সংবাদে স্ত্রীকে চিতায় দাহ করা

৩। বিধবা বিবাহ আইন পাস করেন কে?

ক) লর্ড বেনিংক

খ) লর্ড ডালহৌসি

গ) স্ট্রেচন্ড বিদ্যাসাগর

ঘ) রাজা রামমোহন রায়

৪। কী কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা দুর্নীতিপ্রণালী হয়ে ওঠে?

ক) বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির জন্য

খ) শাসনতাত্ত্বিক দুর্বলতার জন্য

গ) আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকায়

ঘ) অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জনের সুযোগ পেয়ে

১৭ উত্তরমালা

পাঠোভূমি মূল্যায়ন-৯.১ : ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. খ

পাঠোভূমি মূল্যায়ন-৯.২ : ১. ক ২. ক ৩. খ ৪. খ

ইউনিট ১০

বাংলার কৃষক বিদ্রোহ

বাংলার কৃষকের জীবনে প্রাচুর্য ছিল না কখনও। জীবন ধারণ করতে পারত কোনভাবে। কিন্তু সে অবস্থারও ব্যাপক পরিবর্তন হতে থাকে সতের শতক থেকে। সতের ও আঠারো শতকে ইংরেজ বণিক শ্রেণির আগ্রাসন কেড়ে নিতে থাকে বাংলার কৃষকের মুখের হাসি, তাদের আনন্দ উৎসব। প্রথমে তারা ধ্বংস করেছিল গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প, তারপর তাদের নজর পড়ে এদেশের উর্বর জমির উপর। অতিরিক্ত অর্থের লোভে ভূমি রাজস্ব আদায়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। যে পরীক্ষার নিষ্ঠুর বলি হয় বাংলার কৃষক, সাধারণ মানুষ। ফলে তীব্র শোষণে অসহায় কৃষক সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এ বিদ্রোহ ক্রমাগত চলতে থাকে আঠারো শতকের শেষাবধি থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। এর সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত ঘটে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের। যা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ-১০.১ : ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
- পাঠ-১০.২ : তিতুমীরের সংগ্রাম
- পাঠ-১০.৩ : নীল বিদ্রোহ
- পাঠ-১০.৪ : ফরায়েজি আন্দোলন



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

পাঠ-১০.১ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)



এই পাঠ শেষে আপনি

- ফকির সন্ন্যাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী বলতে পারবেন;
- নীল চাষীদের উপর চরম নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফরায়েজি মতবাদ হাজী শরিয়ত উল্লাহর সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

ভিক্ষাবৃত্তি মুষ্টি-সংগ্রহ, তীর্থস্থান, মজনুশাহ, ভবানীপাঠক, গেরিলা পদ্ধতি, লেফটেন্যান্ট ব্রেনান



ভূমিকা

ফরিকির-সন্ন্যাসীরা ছিল বাংলার অধিবাসী। এরা ছিল হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক একটি দল। এরা সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সারা বছর দেশের একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াতো। ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উভয় গোষ্ঠী পরিচিত ছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহী হতে এবং অন্ত ধারণ করতে হয়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলতে থাকে।

ফরিকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কারণ

বাংলার ফরিকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ। আঠারো শতকের শেষার্দে এই বিদ্রোহের শুরু। এর আগে নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফরিকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চান। এই তাকে সাড়া দিয়ে ফরিকির-সন্ন্যাসীরা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম পালিয়ে গেলেও ফরিকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা তাদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতে থাকে। বাংলার ফরিকির-সন্ন্যাসীরা তাদের রীতি অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তৈর্যস্থান দর্শন উপলক্ষে সারা বছর তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াতো। তাদের সাথে নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অন্ত থাকত। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতে থাকে।



মজনু শাহের বিদ্রোহ সন্ন্যাসীদের নেতা ভবানী পাঠক



তৈর্যস্থান দর্শনের উপর করারোপ করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদেরকে ডাকাত-দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ক্ষুদ্র হয়ে ফরিকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিদ্রোহী ফরিকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ। আর সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাছাকাছি ও নায়েব-গোমস্তার বাড়ি।

ফরিকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ সারা উত্তর বাংলায় ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ফরিকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছাড়িয়ে পড়ে। তবে এ আন্দোলনের তীব্রতা ছিল উত্তর বঙ্গে। এই সব অঞ্চলে ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী ফরিকির-সন্ন্যাসীদের বহু সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এ সব সংঘর্ষে বিদ্রোহীরা অনেক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে এবং কোম্পানির বহু কুঠি লুঠ করে।

ফরিকির মজনু শাহের যুদ্ধ কৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি, অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবানশাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফরিকির। এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। অপরদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী-পাঠক ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনারের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। ফলে তার মৃত্যুর সঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

ব্যর্থতার কারণ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ফকির সন্ন্যাসীদের ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব। তাছাড়া মজনু শাহর মৃত্যুর পরে ফকিরদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল ক্রমশ আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। ফকির-সন্ন্যাসীরা কোনো এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল না। ফলে বিদ্রোহীরা স্থানীয়দের সহযোগিতা সহানুভূতি পেতে ব্যর্থ হয়। অস্ত্র, রণকৌশল সরদিক দিয়ে তারা ইংরেজ সৈন্যদের সমকক্ষ ছিল না। ফলে ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের উপর, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল, সামরিক প্রযুক্তি এবং বিশাল সেনাবাহিনীর কাছে প্রাণপণ লড়াই করেও হেরে যায়।

| | |
|---|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। |
|---|--|

১৫ সারসংক্ষেপ

ফকির সন্ন্যাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ছিল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বনের উপর কোম্পানি হস্তক্ষেপের কারণে তারা তাদের সনাতন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে লিঙ্গ হয়েছিল। এই সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও, বিদেশী ইংরেজ শাসকদের নির্যাতনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ নিঃস্ব মানুষের পক্ষ থেকে এটাই ছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ।

১৬ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কতদিন ব্যাপি চলেছিল? (সময়কাল অন্যায়ী)
 - ক) ১৭৬০ থেকে ১৭৭১
 - খ) ১৭৬০ থেকে ১৮০০
 - গ) ১৭৭৭ থেকে ১৮০০
 - ঘ) ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ খ্রি:
- ২। ফকিরদের বিদ্রোহী দলের নেতা কে ছিলেন-
 - ক) বলাকি শাহ
 - খ) চেরাগ আলী শাহ
 - গ) মজনুশাহ
 - ঘ) মাদার বকস
- ৩। ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে অবর্তীর্ণ হয়- কারণ ইংরেজেরা-
 - i) তাদেরকে ডাকাত বা দস্যু বলে চিহ্নিত করছিল
 - ii) তাদের তীর্থস্থান দর্শনে কর আরোপ করেছিল
 - iii) তাদের চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতো
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ | তিতুমীরের সংগ্রাম



এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্দোলনের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এ আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|-----------------------------------|--|
| মুখ্য শব্দ (Key Words) | তাহরিক-ই-মুহম্মদিয়া, ওয়াহাবি, মীর নিসার আলী, গোলাম মাসুম, বাঁশের কেল্লা, লাঠিয়াল বাহিনী, মেজর ক্ষট, |
|-----------------------------------|--|



ভূমিকা

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় প্রায় একই সময়ে দুটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়। পূর্ব বাংলার আন্দোলনটি ফরারেজি আন্দোলন নামে পরিচিত। আর পশ্চিম বাংলার আন্দোলনের নাম ওয়াহাবি বা ‘তারিক-ই-মুহম্মদীয়া’। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিতুমীর। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে এ আন্দোলন শুরু এবং শেষ হয় ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের শাহাদৎ বরণের মধ্য দিয়ে।

তিতুমীরের সংগ্রাম

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর চরিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গামে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন ওয়াহাবি আন্দোলনের (তাহরিক-ই-মুহম্মদিয়া) জোয়ার চলছে, তখন পশ্চিম বঙ্গের বারাসাত অঞ্চলে তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের সঠিক পথ নির্দেশ করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার ওয়াহাবিওও তিতুমীরের নেতৃত্বে একই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত ‘তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া’ আন্দোলন বা ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুগ্রামিত। তিতুমীর হজকরার জন্য মক্কা শারিফ ঘান এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের ফিরে তিনি ধর্মীয় সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান, বিশেষ করে চরিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতী স্বতঃসূর্তভাবে সাড়া দেয়। ফলে জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের উপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নানা নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। তিতুমীর এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন ইতিহাস খ্যাত তাঁর বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমীরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে কৃষকদের সংঘবন্ধতা এবং তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শক্তি হয়ে উঠে শাসক-শোষক, জমিদার শ্রেণি।



মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ

জমিদারদের প্ররোচনায় ইংরেজ সরকার তিতুমীর এবং তার অনুসারীদের দমনের জন্য বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তারা তিতুমীরের বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৫ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও বহু আহত হয়। কৃষণগরের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পাঠানো ইংরেজ বাহিনীও তিতুমীরের বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এতে প্রচণ্ড ক্ষুর হন বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনা বাহিনী প্রেরণ করে। মেজর ক্ষটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমীরের নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই

করে পরাজিত হয় তিতুমীরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এ ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। এই যুদ্ধে তিতুমীরের ৫০ জন অনুসারী নিহত হন। গোলাম মাসুমসহ ২৫০ জনকে বন্দি করা হয়। পরে এক প্রহসনমূলক বিচারে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

তিতুমীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুন্দ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিরোধের মুখে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <p>তিতুমীরের বিরুদ্ধে সশন্ত্রযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারি ব্যক্তিদের নাম লিখুন। নারিকেলবাড়িয়ার যুদ্ধে তিতুমীরের পক্ষের কতজন শহীদ, কতজন বন্দি এবং কয়জনের ফাঁসি হয় তার তালিকা তৈরি করুন।</p> |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

তিতুমীরের পরিচালিত তাহরিক-ই-মুহাম্মদীয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার। পরবর্তিতে এটি একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। যা শেষ পর্যন্ত সশন্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। ইংরেজ সরকার, জমিদার নীলকরদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের মুখে তিতুমীর ও তার বাহিনী পরাজিত হয়। এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও পরবর্তিকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সংগ্রাম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এটাই।

পাঠ্যের মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের নাম কী?

ক) তাহরিক-ই-মুহাম্মদীয়া খ) ফরায়েজি

গ) খিলাফত

ঘ) ওয়াহাবি

২। তিতুমীরের দুর্গ কিসের তৈরি ছিল? (অনুধাবন)

ক) ইটের

খ) মাটির

গ) বাঁশের

ঘ) টিনের

৩। বাংলার ওয়াহাবি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল (অনুধাবন)?

i) তিতুমীরের নেতৃত্বে

ii) হাজী শরিয়তউল্লাহর নেতৃত্বে

iii) মজনু শাহের নেতৃত্বে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i

খ) ii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৪। তিতুমীরের প্রকৃত/আসল নাম কী? (জ্ঞান)

ক) আমির আলী

খ) মীর নিসার আলী

গ) মাওলানা মোহাম্মদ আলী

ঘ) মাওলানা শাওকত আলী

সূজনশীল প্রশ্ন

মুক্তিযোদ্ধা মাখন কুদুস ২০১৬ সালে রক্ত ঝাড়া মার্চের এক শিক্ষার্থী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন মুক্তিযোদ্ধারা কর্তৃন আত্মাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। তারা ইতিহাসের একজন বীর যোদ্ধার আত্মাগ থেকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা লাভ করেছে সেই যোদ্ধা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন নিজস্ব চিন্তায় তৈরি কেল্লা তৈরি করে। আর বৃত্তিশ বিরোধী যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বাঙালি শহীদ হিসেবে আজও অমর হয়ে আছেন।

ক. কোন গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন?

খ. তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্বীপকে পাঠ্য বইয়ের কোন যোদ্ধার কথা স্মরণ করা হয়েছে? ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তার সবচাইতে বিখ্যাত দিকটি তুলে ধরুন।

ঘ. সকল স্বাধীনতা সংগ্রামে তার আত্মাগ হবে অনুপ্রেরণার উৎস- আপনি কী একমত? যুক্তি দিন।

পাঠ-১০.৩] নীল বিদ্রোহ



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- নীল চাষের নামে কৃষকদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- নীল চাষের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।

| | |
|-----------------------------------|---|
| মুক্ত শব্দ (Key Words) | খাদ্য ফসল, বাণিজ্য ফসল, নীল চাষ, নীলকর, দাদন, ‘অনারারি’, নীল কমিশন, ‘ইভিগো কন্ট্রাক্টস অ্যাক্ট’ |
|-----------------------------------|---|



ভূমিকা

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে। উপমহাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের শাসক হয়ে উঠে। তবে সব সময় তাদের ব্যবসায়ী বৃদ্ধি ছিল সজাগ। এই সজাগ ব্যবসায়ী বৃদ্ধির কারণেই বাংলার উর্বর ফসলের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর ক্ষেত্রে গুলোতে খাদ্য ফসলের (খাবার ফসল) পরিবর্তে বাণিজ্য ফসল (বাণিজ্যের জন্য যে ফসল) উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে। নীল ছিল তাদের সেই বাণিজ্য ফসল।

নীল চাষের কারণ

আঠারো শতকে নীল ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। বন্দরশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য বিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানে নীল চাষ করা সম্ভব ছিল না। ফলে তাদের বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করতে হয়। বাংলায় নীল চাষ ছিল সেই বিকল্প চিন্তার ফসল। যে কারণে বাংলা হয়ে উঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় ইংরেজ আমলে নীল চাষ শুরু হয়।

কৃষক নীল চাষে বাধ্য হয়

বাংলার কৃষকদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে তাদের নীল চাষে বাধ্য করা। নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকদের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিতো। কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রীম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা খণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশ পরম্পরায় কোনো দিনই খণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো।

জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষের খরচও বৃদ্ধি পায় নীলকররা বিষয়টি বিবেচনায় রাখত না। তাছাড়া প্রথম দিকে তারা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নীল চাষ কৃষকদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারা চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। এসব বখনে আর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। আইন ছিল তাদের নাগালের বাইরে। আইন যারা প্রয়োগ করবেন। সেসব বিচারকদের বেশির ভাগ ছিল নীলকরদের নিজের দেশের লোক বা বন্ধু। আবার নীলকররাও অনেক সময় নিজেরাই অবেতনিক (অনারারি) ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পেতেন। ফলে আইনের আশ্রয় বা সুবিচার পাওয়া কৃষকদের জন্য ছিল অসম্ভব। এ অবস্থায় নীলকর সাহেবো বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীল চাষিকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

নীল চাষিদের বিদ্রোহ

চরম অত্যাচার আর শোষণে বিপর্যস্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবন্ধ হতে থাকে। এই সব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীল চাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেনী মাধব নামে দুই ভাই। হৃগলীতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার।

নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ের এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশেও অগ্রহ্য করে। এদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীল চাষদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা ‘নীলদর্পণ’ নাটকের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কষকদের জয়

প্রথম বারের মতো বাংলার সংগ্রামী বিদ্রোহী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইঙ্গিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। অর্থাৎ কৃষক নীল চাষ করতে না চাইলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। তাছাড়া ‘ইঙ্গিগো কট্টাস্ট অ্যাক্ট’ বাতিল করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তিকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে নীলচাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

| | |
|--|--|
|  <p>অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) শিক্ষার্থীর কাজ</p> | <p>কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপক নীল চাষ হতো? কী আবিষ্কারের ফলে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়?</p> |
|--|--|

সারসংক্ষেপ

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ নীলকরদের সীমাহীন অত্যাচার শোষণ বন্ধনার বিরুদ্ধে নীল চাষিরা যে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে তা-ই ইতিহাসে নীল বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর নেতৃত্ব দিয়েছিল স্থানীয় পর্যায়ের সাধারণ কৃষকরা। ফলে দেখা যায় যে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নেতা স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত করে। এই নেতৃত্ব এতটাই শক্তিশালী এবং সুসংহত ছিল যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে সরকার ইঙ্গিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নীলচাষ করা, না করা কৃষকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয় এবং ‘ইঙ্গিগো কন্ট্রুক্ষন অ্যাকুষ্ট’ বাতিল করা হয়। ফলে নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

 পাঠ্যনির্দেশন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

পাঠ-১০.৮ | ফরায়েজি আন্দোলন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ফরায়েজি আন্দোলন কী, তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফরায়েজি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

ফরজ, ‘দারুল-হারব’, মুন-ভাতের দাবি, মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন আহমদ, সশন্ত্র সংগ্রাম, ওস্তাদ, হলক।



ভূমিকা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখলের ফলে বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষতি রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মতো শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতিতেও বিপর্যয় নেমে আসে। শিক্ষার অভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন নানা ধরনের অনাচার কুসংস্কারে ভরে যায়। এ অবস্থায় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য উনিশ শতকে বাংলায় যে সংস্কার আন্দোলন হয় তার মধ্যে ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ। তাঁর মৃত্যুর পর দুদু মিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

আন্দোলনের পটভূমি

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়ত উল্লাহ বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলায় ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মুকায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের উপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনেসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। তিনি ইসলাম ধর্মকে এসব কুসংস্কার আর অনেসলামিক অনাচার মুক্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। এই প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজী শরিয়ত উল্লাহর এই সংস্কার আন্দোলনের নামই ফরায়েজি আন্দোলন।

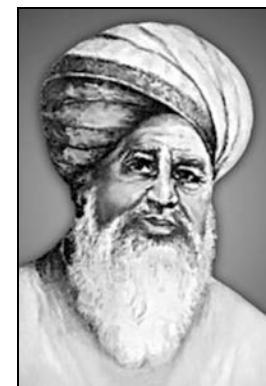
ফরায়েজি মতবাদ

ফরায়েজি শব্দটি আরবি ‘ফরজ’ (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যাঁরা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি। আর বাংলায় যাঁরা হাজী শরিয়ত উল্লাহর অনুসারী ছিলেন, ইতিহাসে শুধু তাদেরকেই ফরায়েজি বলা হয়ে থাকে। শরিয়ত উল্লাহ যে ফরজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্যপালনীয় (ফরজ) মৌলনীতিগুলো হচ্ছে— ঈমান বা আল্লাহর এককত্ব ও রিসালাতে বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান।

তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পরেননি। শরিয়ত উল্লাহ ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে ‘দারুল হারব’ অর্থাৎ বিধর্মীর রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিধর্মী বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফরায়েজি আন্দোলন

হাজী শরিয়ত উল্লাহর আহ্বানে বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শরিয়ত উল্লাহর উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থা, বিশ্বাস এবং তাঁর অসাধারণ সাফল্য নিম্নশ্রেণির



হাজী শরিয়ত উল্লাহ

জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে এবং নানা ধরনের কর আরোপ করে। তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশ জুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি মুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন। জমিদার শ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়েজি প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে শরিয়ত উল্লাহ প্রজাদের রক্ষার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তার উপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফরায়েজি আন্দোলন ও দুদু মিয়া

হাজী শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পরে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর যোগ্যপুত্র মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মতো পদ্ধতি না হলেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক শ্রেণির শোষণ মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হয়। যার ফলে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শুধু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ইংরেজ শাসকদের চরম অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণবিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবর্তীর্ণ হলো। হাজার হাজার কৃষক জমিদার, নীলকর সাহেবদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ফরায়েজি আন্দোলনে যোগদান করে। দুদু মিয়া ছিলেন ফরায়েজিদের গুরু বা ওস্তাদ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শাস্তিপ্রিয় নীতি বাদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে লিঙ্গ হন। ফরায়েজিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর পিতার আমলের লাঠিয়াল জালালউদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ্য ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলো নীল চাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এই অঞ্চলগুলোতে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও ছিল দুঃসহ ফলে কৃষকরাও হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী। দুদু মিয়া তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করেছিলেন। কৃষক প্রজাসাধারণকে নিয়ে স্বাধীন সরকারের একটি সেনাবাহিনীও (লাঠিয়াল বাহিনী) তিনি গঠন করেন। ফরায়েজিদের সরকার ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে কতগুলো হলকা বা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। দুদু মিয়া তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী জমিদার, নীলকর এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালিয়ে যান। দেশীয় জমিদাররা বিদেশি ইংরেজ শাসক ও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে থাকে। কিন্তু দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী না পেয়ে তাকে বার বার মুক্তি দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তারতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে ইংরেজ সরকার ভীত সন্তুষ্ট হয়ে উঠে। ভীত ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে কলকাতার কারাগারে আটকে রাখেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তি পান এবং ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে এই দেশ প্রেমিক দুঃসাহসী বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালি মুসলমানদের নৈতিক চেতনা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ফরায়েজি আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে সবধরনের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে এই আন্দোলন। সুতরাং নিসন্দেহে পরাধীন ভারতে বাঙালি মুসলমানের জন্য এই আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | ফরায়েজি শব্দটি কোন আরবি শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ কী? কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি ফরজ উল্লেখ করুন। |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

ইংরেজ শাসন আমলে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে নৈতিক অধঃপতনও ঘটে। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে নানা ধরনের কুসংস্কার অনাচার প্রবেশ করে। এসব থেকে বাঙালি মুসলমানকে উদ্বার এবং ইসলামের বিধান মতো তাদের পরিচালনার জন্যই হাজী শরিয়ত উল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মৃত্যু পর দুদু মিয়ার

নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর সময়ে এটি কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয় এবং বিক্ষুল প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ପାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଯନ-୧୦.୮

୧। কার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে উঠে?

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ক) হাজী শরিয়ত উল্লাহ | খ) মুহসিন উদ্দিন দুদুমিয়া |
| গ) মীর নিসার আলী | ঘ) ফকির মজলু শাহ |

୨। হাজী শরিয়তউল্লাহ প্রদত্ত উপদেশ সমূহের মধ্যে নিচের কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ক) নিয়মিত নামাজ পড়া | খ) ভালো কাজ করা |
| গ) জ্ঞানার্জন করা | ঘ) অবৈধ কর থেকে বিরত থাকা |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রয়োগমূলক)

୩। জনাব মেহবুব উল্লাহ নিজ এলাকার কুপথা ও ইসলাম বিবর্জিত কাজ দূর করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার কার্যকলাপে কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ক) ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের | খ) খিলাফত আন্দোলনের |
| গ) ফরায়েজী আন্দোলনের | ঘ) তিতুমীরের আন্দোলনের |

୪। হিন্দু প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল- (অনুধাবন)

- i) পীরপুজা ii) কবরপুজা iii) মহররম মাসের তাজিয়া প্রথা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

শাফকত সাহেবে চাপিতলা গামে তার সংস্কার কর্মকাণ্ডে জন্য আজও স্মরণীয়। এ গামের শিক্ষার আলো বদ্ধিত মুসলিম গ্রামবাসীর মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতি ছিল প্রবল। তারা পীর ফকিরদের মাজারে যাওয়া তাজিয়া নির্মাণসহ নানা কুসংস্কারে লিঙ্গ ছিল তাছাড়া জমিদারদের জুলুমে তারা অতীষ্ঠ হয়ে উঠে। শাফকত সাহেব তাদের অনেসলামিক কাজ থেকে মুক্ত করতে এবং জুলুম বন্ধে এগিয়ে আসেন। তাঁর এ পদক্ষেপ ঢাকা কুমিল্লাসহ অনেক জায়গায় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ক. হাজী শরিয়ত উল্লাহ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

খ. নীল কমিশন কী? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারকের সাথে পাঠ্য বইয়ে উনিশ শতকে বাংলার কোন সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত সংস্কারকের আন্দোলনই কৃষক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়, আপনার উভরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଯନ- ୧୦.୧ ୧. খ ୨. গ ୩. ঘ

পାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଯନ- ୧୦.୨ ୧. ক ୨. গ ୩. ক ୪. খ

পାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଯନ- ୧୦.୩ ୧. ঘ ୨. গ ୩. গ ୪. খ ୫. ঘ

পାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଯନ- ୧୦.୪ ୧. ক ୨. ঘ ୩. গ ୪. ঘ

ইউনিট ১১

বাংলায় নবযুগ

ভূমিকা

আঠারো শতকের শেষার্দে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে রাত্তক্ষয়ী ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি:) প্রভাব এসে পড়ে এ অঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এ সময়ে বাংলার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরাই বাংলায় ‘রেনেসাঁস’ বা নবজাগরণের সূচনা করেন। এই সময়ে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ নীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। বাংলার সর্ব ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা, যা ইঙ্গিত করে এক নবযুগের। এই নবযুগের জন্য দিয়েছিলেন বাংলার একদল শিক্ষিত তরুণ যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্রবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হতে থাকে। নবজাগরণের প্রভাবেই দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাঙালিকে তথা ভারতীয়দের স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ : নবজাগরণ ও রাজা রামমোহন রায়

পাঠ-১১.২ : ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাঠ-১১.৩ : নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী

পাঠ-১১.৪ : বেগম রোকেয়া



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-১১.১ | নবজাগরণ ও রাজা রাম মোহন রায়



এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলার ‘রেনেসাঁস’ বা নবজাগরণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা ও তাঁর সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

| | |
|--|--|
|  মুখ্য শব্দ (Key Words) | রেনেসাঁ, নবজাগরণ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্রাহ্মধর্ম, আত্মায় সভা, ব্রাহ্মসমাজ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, এ্যাংলো হিন্দু কলেজ, মাদরাসা শিক্ষা |
|--|--|



নবজাগরণ

উনিশ শতকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন কোনো চিন্তা করার, নতুন কোনো আবিক্ষারের যুগ। এই শতকে ইউরোপে যে উদার নৈতিক চিন্তাধারা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ হয়, তার চেতু এসে লাগে বাংলাদেশেও। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা হওয়াতে বাঙালিরাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। ফলে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাধারা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির সঙ্গে বাঙালিদেরই প্রথম পরিচয় ঘটে এর কারণে চিন্তাশীল শিক্ষিত বাঙালিরা এই ভাব ধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ফলে প্রচলিত মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা রীতিনীতি বাদ দিয়ে, বাঙালি শিক্ষিত সমাজে দেখা দেয় যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এই সময় বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এই পরিণতিতে জন্ম হয় নতুন মত (ব্রাহ্মধর্ম ও নব হিন্দুবাদ), নতুন শিক্ষা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতি। এই নতুনের মধ্যেই বাংলায় ‘রেনেসাঁ’ বা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। এ ভাবেই উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলায় প্রথম নবজাগরণ বা ‘রেনেসাঁসের’ উত্তর ঘটে। ফলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে উঠে আধুনিক চিন্তাচেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালি পরিণত হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারকবাহকে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে আধুনিক মানুষে পরিণত হন। এই নব ভাবধারা প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু সংখ্যক উদারচেতনা প্রশাসকেরও অবদান রয়েছে। এরা দেশী ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছেন। হেস্টিংস, এ্যালফিনিস্টোন, ম্যালকম, মনরো, মেটকাফ প্রমুখ ইংরেজ প্রশাসকের অনেকে ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য ভাবধারা, জ্ঞান বিজ্ঞান-দর্শনে উজ্জীবিত করাকে তাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাও আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

রাজা রামমোহন রায়

বাংলার নবজাগরণের স্মৃষ্টি, ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী রামমোহন, বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও ছীক ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সুফি মতবাদে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছেলেন। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী রামমোহন, কিছুকাল তিব্বতে বসবাস করে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে ‘তুহফাত-উল-মোয়াহিদীন’ (একেশ্বরবাদ সৌরভ) ‘মানাজারাতুল আদিয়ান’ (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা)। হিন্দুদিগের পৌত্রলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি ‘সম্বাদ কৌমুদী’, ‘মিরাত-উল-আখবার’ ও ‘ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন’ নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন।



রাজা রামমোহন রায়

আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ‘আত্মায় সভা’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮

খ্রিস্টাদে ২০ আগস্ট তিনি ব্রাক্ষসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তার ব্রাক্ষসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে।

শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষার। এ কারণে তিনি নিজে সংস্কৃত পঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘এ্যাংলো হিন্দু কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ইংরেজি, দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। এদেশবাসীকে সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদরাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য আবেদন করেন।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই মহাপুরূষ, ভারতীয় নবজাগরণের স্বষ্ঠা, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

| | |
|--|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | রাজা রামমোহন রায় কী কী করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিন। |
|--|---|

সারসংক্ষেপ

আর্ঠারো শতকে ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলায় যে নবজাগরণ বা ‘রেনেসাঁসের’ জন্ম হয়, পরবর্তিকালে সেই ভাবধারা সারা ভারতবর্ষে ছাড়িয়ে গড়ে। এর ফলে শুধু বাংলা না সারা ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশাল পরিবর্তন সূচিত হয়। যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব, বাংলার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত বাঙালি সন্তানরা। তাঁদের মধ্যে প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় গোড়ামি, কুসংস্কার আচলন সমাজ, পশ্চাদমুখি শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঙালি সমাজকে আধুনিক যুগের পথে এগিয়ে দেন। তাঁর সময়টাটই বাংলার ইতিহাসে নবজাগরণ বা ‘রেনেসাঁসের’ যুগ নামে পরিচিত।

পাঠ্টোক্তির মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। এ্যাংলো হিন্দু কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞানমূলক)

 - ক) ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
 - খ) রাজা রামমোহন রায়
 - গ) হাজী মুহম্মদ মুহসিন
 - ঘ) স্যার সৈয়দ আহমদ

২। রাজা রামমোহন আতীয়সভা গঠন করেন কেন? (অনুধাবন)

 - ক) পারম্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য
 - খ) সামাজিক সংক্ষার সাধন কল্পে
 - গ) ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের জন্য
 - ঘ) জনগণকে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য

৩। রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে কোনটি গ্রহণযোগ্য- (প্রয়োগমূলক)

 - ক) ভারতীয় হিন্দুদের আদর্শ
 - খ) ভারতীয় নবজাগরণের স্মষ্টা
 - গ) ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নেতা
 - ঘ) ভারতীয় রাজনীতির প্রাণ পুরুষ

৪। ভারতের আধুনিক পুরুষ হিসেবে নিচের কোন ব্যক্তিত্ব অধিক গ্রহণযোগ্য- (উচ্চতর দক্ষতা)

 - ক) রাজা রামমোহন রায়
 - খ) হাজী শরীয়ত উল্লাহ
 - গ) ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর
 - ঘ) মহাত্মা গандী

পাঠ-১১.২ | ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

একাডেমি এ্যাসোসিয়েশন, সনাতনপন্থী হিন্দু, গৌড়াপন্থী খ্রিস্টান, মাইকের মধুসূদন দত্ত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ব্যাকরণ, উপক্রমণিকা, মেট্রোপলিটান ইনসিটিউশন, বহুবিবাহ, কন্যাশিশু হত্যা



ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ছিল রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ধারা। দৃঢ়ভাবে সে ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্রবন্দ ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের মাধ্যমে। যার নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুইস ডিরোজিও। তিনি তাঁর ছাত্র-অনুসারীদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার শিক্ষা দেন।

‘রেনেসাঁস’ যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ‘ইয়াং বেঙ্গল’ আন্দোলনের প্রবক্তা ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে জন্ম প্রাপ্ত করেন। ডিরোজিও তাঁর স্কুল শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্মুখ মানবতাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই শিক্ষকের আদর্শ ধারণ করে রাখার কারণে হতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ডিরোজিওর অনুসারী ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা দেশবাসীকে বার বার এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা বিশিষ্ট কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। তরুণ সমাজের পুরোনো ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিতে ডিরোজিও কর্তৃক ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ‘একাডেমি এ্যাসোসিয়েশন’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাডেমির তরুণদের এই শিক্ষা দেয়া হয় যে যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান। নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবিত তরুণরা সনাতনপন্থী হিন্দু এবং গৌড়াপন্থী খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখ্য হয়ে উঠে। ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রদের প্রকাশিত সাংগ্রহিক এবং দৈনিক পত্রিকাতেও সমাজ, ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক লেখা প্রকাশিত হয়। যে কারণে তারা বক্ষণশীল মহলের আক্রমণের শিকার হতে থাকেন বারবার।

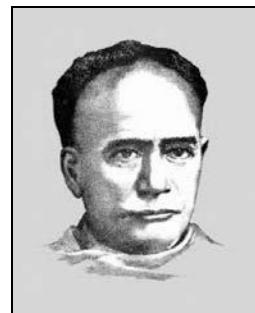
বাংলার ‘রেনেসাঁস’ যুগের এই প্রতিভাবান তরুণ মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর হাতে গড়া অনুসারী, ছাত্রো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন ব্যনার্জি প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর ছাত্র না হলেও তাঁর আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর অনুসারীদের আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাণ্ডিত্য, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, দয়া ও তেজস্বিতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকের বাংলায় একক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ আর হৃদয় ছিল বাংলার কোমলমতি মায়েদের মতো। এই অসাধারণ যুগ প্রবর্তকের জন্ম হয়েছিল ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তিনি তাঁর তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁর দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। আর হৃদয়ের মমত্ববোধ তাঁর মা ভগবতীদেবীর কাছ থেকে। দারিদ্রের কারণে রাতে বাতি জ্বালিয়ে পড়ার ক্ষমতা ছিল না। ফলে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নিচে বসে পড়াশোনা করতেন। তিনি ইংরেজি সংখ্যা গণনা শিখেছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার সময়, রাস্তার পাশের মাইল ফলকে লেখা সংখ্যার হিসেব গুণতে গুণতে।

অসাধারণ মেধা আর অধ্যাবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়েসে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত, স্মৃতি, অলঙ্কার শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ঐ বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাণ্ডিতের দায়িত্ব লাভ করেন। একই সঙ্গে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বও পালন করেন।

কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এ জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়।



সৈয়দুরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ

শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।

শুধু সাহিত্য নয়, শিক্ষা বিজ্ঞারে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা তাঁর কীর্তি। তাছাড়া স্কুল পরিদর্শক থাকাকালে গ্রামে গঞ্জে তিনি ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘মেট্রোপলিটন ইনসিটিউশন’, এখন এটি বিদ্যাসাগর কলেজ নামে খ্যাত।

তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্করণের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। উদার ও সংস্কারমনা বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে প্রচলিত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সতীদাহ প্রথা, কন্যা শিশু হত্যাসহ সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহতকারী, মানবতা বিরোধী সব ধরনের অশুভ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন পরিচলনা করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য ‘সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট’ প্রণয়নে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

বিদ্যাসাগর দান-দাক্ষিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। এ কারণে তাঁকে দয়ার সাগরও বলা হতো। তিনি যথেষ্ট সচ্ছল না হলেও বহু অনাথ ছাত্র তাঁর বাসায় থেকে লেখাপড়া করতো। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরম অর্থকষ্টের সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। কবি নবীনচন্দ্ৰ সেন তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগরের অর্থে লেখাপড়া করেছেন।

তার মাত্তভক্তি ছিল অসাধারণ। মায়ের ইচ্ছায় তিনি গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি একবার ভরা বৰ্ষায় গভীর রাতে ‘দামোদৰ নদ’ সাঁতরিয়ে পার হয়ে বাঢ়ি ঘান। এই সমাজ সেবক মহাজ্ঞানী ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ৭১ বছর বয়েসে মৃত্যু বরণ করেন।

| | |
|--|--|
| অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) <i>/শিক্ষার্থীর কাজ</i> | <ul style="list-style-type: none"> • “একদিকে তিনি বিদ্যাসাগর অপর দিকে দয়ার সাগর”-এর অর্থ কী? • বিদ্যাসাগরের শিক্ষা এবং তাঁর মাত্তভক্তির অসাধারণ কাহিনী উল্লেখ করুন। |
|--|--|

১ সারসংক্ষেপ

বাঙালিদের মধ্যে নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ সৃষ্টিতে যাঁরা অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন সৈয়দুরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। একজন সংস্কৃত পাণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও জনহিতৈষী। সৈয়দুরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর একদিকে ছিলেন বিদ্যাসাগর অপর দিকে দয়ার সাগর। তাঁর মানবিক গুণাবলি তাঁর পাণ্ডিত্যের মতই বাঙালি সমাজে দৃষ্টিত্ব হয়ে আছে। বাংলার শিক্ষা ও সামাজিক নবজাগরণ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য গুরুত্ববহু।

ପାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଯନ-୧୧.୨

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। হেনরি লুই ডিরোজিওর জন্ম সাল কোনটি? (জ্ঞানমূলক)

- | | |
|---------|---------|
| ক) ১৭৭৪ | খ) ১৮০৯ |
| গ) ১৮২২ | ঘ) ১৮৩১ |

২। ডিরোজিও কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞানমূলক)

- | | |
|---------|----------|
| ক) একুশ | খ) বাইশ |
| গ) তেইশ | ঘ) চারিশ |

৩। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে নিচের কোন নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত?

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ক) রাজা রামমোহন রায় | খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর |
| গ) হেনরী লুই ডিরোজিও | ঘ) প্যারিচাদ মিত্র |

৪। জ্ঞাব প্রদীপ শৈক্ষণিক অবস্থায় গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নীচে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করতেন। প্রদীপ-এর কাজের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগমূলক)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ক) হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের | খ) হাজী শরিয়ত উল্লাহর |
| গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের | ঘ) মুহসিনউদ্দিন দুদু মিয়ার |

৫। কর্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে বিষয়ে/কোন বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন?

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ক) ধর্মপ্রচারে | খ) ধর্মচর্চায় |
| গ) রাজনৈতিক জ্ঞান অন্঵েষণে | ঘ) সাহিত্য চর্চায় |

৬। স্কুল পরিদর্শক থাকাকালিন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন?

- | | |
|---------|---------|
| ক) ২০টি | খ) ২৩টি |
| গ) ৩৫টি | ঘ) ৩৭টি |

৭। ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন কেন? (বহুপদী)

- i) মায়ের ইচ্ছার পূর্ণতা দান করতে
- ii) পরিবারের চিকিৎসার জন্য
- iii) মাতৃভক্তি প্রদর্শন স্বরূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

পাঠ-১১.৩ | নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী



এই পাঠ শেষে আপনি

- নওয়াব আবদুল লতিফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুসলিম নবজাগরণে সৈয়দ আমীর আলীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

কলেজিয়েট স্কুল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, লিকপ ইন, প্রিভি কাউপিল, সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন

উনিশ শতক ছিল বাংলা তথ্য ভারতীয় মুসলমানদের জন্য চরম হ্রাশার কাল। মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতা করতে গিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বিমুখ হওয়ার কারণে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে দারিদ্রের নিম্নতম ধাপে নেমে আসে। এই অধঃপতিত অবস্থা ও দুর্দিনে যে সব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আসে নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। এবং পরে কোলকাতা মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন।



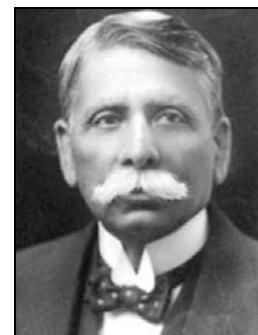
নওয়াব আবদুল লতিফ

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সরকার তাঁকে প্রথমে খান বাহাদুর পরে নওয়াব এবং নওয়াব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে।

আবদুল লতিফ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন এবং এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তাই তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ‘মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল’ শৈর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতা মাদরাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদরাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুহসিন ফান্দের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ও আধুনিক পাশাপাশি শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ।

সৈয়দ আমীর আলী

উনিশ শতকের শেষার্দে বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ছিলেন তিনি হলেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করতে চেয়েছেন।



সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের লিকপ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউপিলের সদস্য হন। বাংলা তথ্য ভারতে তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা

প্রয়োজন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় ‘সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমীর আলী কোলকাতা মাদরাসায় কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন।

মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রদুত আমীর আলী ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে- ‘The spirit of Islam’ এবং ‘A Short History of the Saracens’। এতে ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আধুনিক ভারতের উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জনান। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সৈয়দ আমীর আলী নারী অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রদুত সৈয়দ আমীর আলী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লঙ্ঘনে মৃত্যুবরণ করেন।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর ভূমিকা উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ রচনা করে শিক্ষকের কাছে জমা দিন। |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমান তথা ভারতীয় মুসলমান জনগোষ্ঠি শিক্ষাদীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে ছিল পশ্চাদপদ। চরম দুর্দশাগ্রস্ত এই জনগোষ্ঠি চলমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড থেকে ছিল দূরে। দুর্দশা কবলিত পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজকে সহযোগিতা করতে যেসব মনীয়ী এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। এই দুই মনীয়ীর প্রচেষ্টায় বাঙালি মুসলমান পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার বিষয়ে উৎসাহিত হয়। বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রপথিকদ্বয় যেমন মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন তেমন আমীর আলী তাদের রাজনীতি সচেতন করারও পক্ষে ছিলেন। তাদের প্রভাবে প্রেরণায় মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনার ও জাগরণের।

পাঠ্যতার মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। নওয়াব আবদুল লতিফ কত খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?
 - ক) ১৮২৬
 - খ) ১৮২৭
 - গ) ১৮২৮
 - ঘ) ১৮৪৯
- ২। নওয়াব আবদুল লতিফকে সরকার “খান বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত করেন কেন?
 - ক) তাঁর মানবীয় গুনাবলীর
 - খ) কর্ম জীবনের কৃতিত্বের জন্য
 - গ) তাঁর সাহসিকতার জন্য
 - ঘ) তাঁর সূজনশীলতার জন্য
- ৩। মোহামেডন লিটারারি সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
 - ক) ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ
 - খ) ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ
 - গ) ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ
 - ঘ) ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ
- ৪। নওয়াব আবদুল লতিফের কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল- (উচ্চতর দক্ষতা)
 - i) মুসলমানদের প্রতি সরকারের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব দূর করা
 - ii) শিক্ষায় মুসলমানদের অগ্রগতি সাধন করা
 - iii) হিন্দু মুসলিম মৈত্রী স্থাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii
- ৫। সৈয়দ আমীর আলী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন?
 - ক) লঙ্ঘনের লিঙ্কন ইন
 - খ) ঢাকা ল কলেজ
 - গ) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
 - ঘ) প্রেসিডেন্সি কলেজ
- ৬। ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে যে গ্রন্থে- (উচ্চতর দক্ষতা)
 - i) *The Prophet Mohammad (sm)*
 - ii) *The Spirit of Islam*
 - iii) *A Short History of the Saracens*

নিচের কোনটি সঠিক?

 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) ii ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ | বেগম রোকেয়া



এই পাঠ শেষে আপনি

- বেগম রোকেয়ার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- নারী শিক্ষা বিষয়ে বেগম রোকেয়ার অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

পায়রাবন্দ, অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল, উর্দু প্রাইমারি স্কুল, আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম, মুসলিম মহিলা সমিতি



বেগম রোকেয়া

বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। তারা সব ধরনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধ ছিল। সমাজ ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। মুসলমান মেয়েদের এই বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যিনি আহবান জানান তিনি বেগম রোকেয়া। এই মহীয়সী নারীর জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম জহিরুল্লাহ মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। মায়ের নাম মোসাম্মৎ বাহাতুল্লাসা সাবেরা চৌধুরী। ঐ অঞ্চলে সাবের পরিবার ছিল অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং রক্ষণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশিন। বেগম রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইবরাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুর্রেসার কাছে শিক্ষা লাভ করেন।



বেগম রোকেয়া

তাঁকে পড়াশোনা করতে হতো গভীর রাতে, যাতে বাড়ির লোক টের না পায়। বড় ভাইয়ের একান্ত উৎসাহে তিনি উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। স্কুলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

সাহিত্য চর্চার বিষয়বস্তুও ছিল নারী সমাজকে নিয়ে। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা— বথনার করণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। যা উপলক্ষ করেছেন, তা-ই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করণ দশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা। বেগম রোকেয়ার লিখিত গ্রন্থ অবরোধ বাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতিতে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহিত জীবনে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে জনান চর্চায় উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জীবনের বাকি সময় নারী শিক্ষা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নিত হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনিটেন্ডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বেগম রোকেয়া নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

মুসলমান নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার মনে নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ছিল তীব্র বিদ্রোহের সূর। তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এই মহীয়সী নারী কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।



অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) শিক্ষার্থীর কাজ

বেগম রোকেয়া যে ধর্মীয়, সামাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন তাঁর উপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করুন।

১৫ সারসংক্ষেপ

বাঙালি মুসলিম নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া ছোট বেলা থেকেই নারীকে পর্দা প্রথার নামে বন্দি করে রেখে তার ব্যক্তিত্বের প্রতি অবমাননা তাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে। ধর্মের নামে এই আচরণের ফলে মেয়েরা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বাস্তিত ছিল। এমনকি লেখা পড়া করাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বাঙালি মুসলমান নারী সমাজকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেন। বড় ভাই বোন এবং পরে স্বামীর সহযোগিতায় লেখা পড়া শিখে নারী শিক্ষা নারী জাগরণের জন্য কাজ করে গেছেন। বাঙালি মুসলমান নারী সমাজ তাঁদের আজকের প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং ঝণী, তিনি বেগম রোকেয়া।

১৬ পাঠোভ্র মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দিন

- ১। বেগম রোকেয়া কোন জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
 - ক) ভাগলপুর
 - খ) রংপুর
 - গ) বগুড়া
 - ঘ) দিনাজপুর
- ২। বেগম রোকেয়ার সময়কালে মেয়েরা কেমন ছিল? (অনুধাবন)
 - ক) উগ্র মানসিকতা সম্পন্ন
 - খ) লাজুক প্রকৃতির
 - গ) অত্যন্ত পর্দানশীল
 - ঘ) ভীরু প্রকৃতির

নিচের উদ্দীপকটি পত্রুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
রফিজা সমাজের কুসংস্কার ও অশিক্ষা দূর করতে কাজ করেন। তার স্বামী এতে সহযোগিতা করেন।
- ৩। রফিজার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র-
 - ক) লীলা নাগ
 - খ) লক্ষ্মী বাট
 - গ) বেগম রোকেয়া
 - ঘ) প্রীতিলতা
- ৪। তিনি আমাদের উদ্বৃদ্ধ করেন-
 - ক) পর্দাপ্রথা মানতে
 - খ) নারী মুক্তি আনয়নে
 - গ) গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকতে
 - ঘ) বিলাসিতা করতে
- ৫। মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনের আগ্রদূত কাকে বলা হয়?
 - ক) মাদার তেরেসা
 - খ) বেগম রোকেয়া
 - গ) সুলতানা রাজিয়া
 - ঘ) বেগম ফয়জুল্লেসা
- ৬। বেগম রোকেয়া যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। (অনুধাবন)
 - i) বাংলা ভাষায়
 - ii) ইংরেজি ভাষায়
 - iii) আরবি ভাষায়

নিচের কোনটি সঠিক?

 - ক) i
 - খ) ii
 - গ) i ও ii
 - ঘ) ii ও iii

১৭ উত্তরমালা

- | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১১.১ | ঃ | ১. খ | ২. গ | ৩. খ | ৪. ক | | | |
| পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১১.২ | ঃ | ১. খ | ২. গ | ৩. গ | ৪. গ | ৫. ঘ | ৬. গ | ৭. খ |
| পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১১.৩ | ঃ | ১. গ | ২. খ | ৩. গ | ৪. ক | ৫. ক | ৬. গ | |
| পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১১.৪ | ঃ | ১. খ | ২. গ | ৩. গ | ৪. খ | ৫. খ | ৬. ক | |

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন

ইউনিট
১২

বাঙালিরা কখনই বিদেশি ইংরেজ শাসকদের মেনে নেয়নি। যার প্রমাণ পলাশীর যুদ্ধের পর পর একের পর এক ক্ষক বিদ্রোহ। পরাধীনতার একশ বছর পরেও স্বাধীনতা ঘোষণা করে এ দেশের সৈনিকরা ও দেশীয় রাজরাজারা। পরবর্তী সময়ে স্বাধীকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঞ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ। বাঙালি তরুণরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দলে দলে আত্মান্তিত দিয়ে কাঁপিয়ে তোলে ইংরেজ শাসনের ভিত। উপমহাদেশের স্বাধীকার স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা ছিল বাঙালিদের। এই ইউনিটে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামসহ পরবর্তী আন্দোলন সমূহে বাঙালি তথা তৎকালীন ভারতবাসীর গৌরবের ও আত্মত্যাগের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা আছে ইংরেজ শাসকরা ভারত ছাড়তে বাধ্য জেনে, কীভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে উপমহাদেশকে বিভক্ত করে, দ্বিখণ্ডিত করে বাংলাকে- বাঙালি জনগোষ্ঠীকে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ-১২.১ : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম
- পাঠ-১২.২ : ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন
- পাঠ-১২.৩ : বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন
- পাঠ-১২.৪ : খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন
- পাঠ-১২.৫ : লাহোর প্রস্তাব
- পাঠ-১২.৬ : ব্রিটিশ শাসন অবসান



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ও সপ্তাহ

পাঠ-১২.১ | ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম



এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

| | |
|--|---|
|  মুখ্য শব্দ (Key Words) | মহাবিদ্রোহ, স্বত্ত্ববিলোপনীতি, সাম্রাজ্যবাদী, লাখেরাজ সম্পত্তি, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ধর্মীয় স্বাধীনতা। |
|--|---|



ভূমিকা

পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের নেতৃত্বে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ— এসবই মহাবিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচনা করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক কারণ

গভর্নর জেনারেল ডালহৌসি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ডালহৌসি স্বত্ত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। স্বত্ত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দক্ষক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারতো না। এই নীতি প্রয়োগ করে কর্ণাটের নবাব ও তাঙ্গেরের রাজার দক্ষক পুত্র এবং পেশওয়া দ্বিতীয় রাজা বাজিরাওয়ের দক্ষক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। ব্রিটিশের অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাবও এই আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাননি। অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করা হয়। এসব ঘটনায় দেশীয় রাজন্যবর্গ অত্যন্ত ক্ষুঢ় হন। তাছাড়া ডালহৌসি কর্তৃক দিল্লি সম্রাট পদ থেকে বাস্তিত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও ক্ষুঢ় হন।

অর্থনৈতিক কারণ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বথ্বনা। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরামত। আইন প্রয়োগের ফলে অনেক বনেদি জমিদার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সামাজিকভাবে হেয় হন। তাছাড়া কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের পর এ অধ্যন থেকে যে পরিমাণ অর্থ, সোনা রূপাসহ মূল্যবান সম্পদ ব্রিটেনে পাচার করে তাতে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াষ্টি, সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলন, দেশীয় রাজ্য গ্রাস এবং নতুন চাকুরি আইনের ফলে বহুলোক বেকার কর্মহীন ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানির শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং কোম্পানি শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হতে থাকে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

আঠারো শতকের শেষ ভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যের প্রভাব, কোম্পানির সমাজ সংস্কার জনকল্যাণমূলক হলেও রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমান এসব মেনে নিতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ, খ্রিস্টান ধর্ম্যাজকদের ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন; সবই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানুষকে বিচলিত করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সংগ্রামে অবর্তীর্ণ হয়।

সামরিক ও প্রত্যক্ষ কারণ

সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে পদবি, বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বাস্তিত ছিল। তার উপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত, উদ্বিত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

তবে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল; সমুদ্র পাড়ি দিলে ধর্ম নষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে হিন্দু সিপাহিদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতের বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য ‘এনফিল্ড’ রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে দুই ধর্মের সৈন্যরা ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে উঠে পশ্চিম বঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গলপাড়ে নামে এক সিপাহী। দ্রুত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে মিরাট, কানপুর পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে শামিল হয়।



বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা

বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সিপাহী জনতার এই বিদ্রোহ নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করে। এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িতদের বেশির ভাগ হয় যুদ্ধে শহিদ হন অথবা তাঁদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন, মায়ানমার) নির্বাসিত করা হয়। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে শহীদ হন। নানা সাহেবের পরাজিত হয়ে অন্তর্ধান হন। সাধারণ সৈনিক বিদ্রোহীদের উপর নেমে আসে চরম অমানবিক নির্যাতন। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক সৈনিকের লাশ। এভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ-

১. সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং একক নেতৃত্বের অভাব।
২. সাংগঠনিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও রসদের অভাব।
৩. শিক্ষিত মধ্যবিভক্তশ্রেণি, অধিকাংশ দেশীয় রাজা, জমিদার, সৈন্যদের একটি অংশের অসহযোগিতা।
৪. অপর দিকে ইংরেজদের উল্লত সামরিক কৌশল, উল্লতমানের অস্ত্র, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের জয়ী করেছে।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব

১. এর ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেন্টের হাতে ভারত শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।
২. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বত্ত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণা পত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

এই বিদ্রোহের সুদূর প্রসার গুরুত্ব হচ্ছে, বিদ্রোহের ক্ষেত্র থেমে থাকেনি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সচেতন হয়ে উঠে এবং নানা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

| | |
|---|--|
| <p>অ্যাক্রিটিভিটি (নিজে করি) শিক্ষার্থীর কাজ</p> | <p>১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণসমূহ নিয়ে শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করুন।</p> |
|---|--|

পাঠ-১২.২ ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- উপমহাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

নতুন যুগ, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, জাতীয়তাবাদী চিন্তা, রাজনৈতিক সংগঠন, সিভিল সার্ভিস সর্বহারা বিপ্লব, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা, ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন,



ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল; স্বদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন একদল ভারতীয় নেতৃত্বন্দের আকাঙ্ক্ষা। ঐদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন বাংলার রাজনীতি সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরাই। তাঁদের জাতীয় ঐক্যবোধ দেশপ্রেম বাংলা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। রাজনীতি সচেতন এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তায় উদ্বৃদ্ধকারী সংগঠন গুলোর জন্মও হয়েছিল বাংলায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন’। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক দাবিগুলো মূলত ছিল ‘ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের’ দাবি সমূহের মার্জিত রূপ। নেহরু বাঙালির এই ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনী ভারত সন্ধানে লিখেছেন ‘বাংলাদেশের নেতারা সমগ্র রাজনৈতিক ভারতের নেতা রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।’

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ একটা রাজনৈতিক সংগঠনের অভাব বোধ করছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আহত জাতীয় সম্মেলনে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাৱ উৎপাদিত হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোলকাতায় একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে যখন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যের শেষ ধাপে উপস্থিত। তখনই সরকারি উদ্যোগে কংগ্রেস গঠনের আয়োজন শুরু হয়। বড় লাট ডাফ্রিনের ইচ্ছায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর প্রাপ্ত এ্যালন অস্ট্রেভিয়ান হিউম কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনা করেন। ভারতীয় জাতীয় চেতনায় উদ্বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু প্রমুখ নেতাদের সহযোগিতায় হিউম কংগ্রেস গঠনে সফল হন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন কোলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্রোপাধ্যায়।

মুসলিম লীগ

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও বেশিরভাগ মুসলিম নেতা এতে অংশ গ্রহণ করেননি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার ফলে অবহেলিত পশ্চাদপদ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু কংগ্রেস এবং হিন্দু নেতৃত্ব বঙ্গভঙ্গের চরম বিরোধিতা শুরু করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তারা কংগ্রেস থেকে আরো দূরে সরে যায়। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি আদায়ের জন্য একটি সংগঠন জরুরি ছিল।



নবাব সলিমুল্লাহ

অপরদিকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার নতুনভাবে শাসন সংস্কার চালু করার বিষয়টি বিবেচনায় আনে। এসব কারণে, নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে মুসলমানদের মধ্যে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ দেখা দেয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায়, বড় লাট লর্ড মিট্টের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে বড় লাটের কাছে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা সংক্রান্ত একটি দাবি নামা পেশ করা হয়। এই সাক্ষাৎকারের পর মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ‘নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স’। সম্মেলন শেষে নওয়াব ভিখারিল মুলক-এর সভাপতিত্বে মুসলিম নেতাদের উপস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নবাব সলিমুল্লাহ ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন হাকিম আজমল খান, জাফর আলী খান, মুহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে গঠিত হয় ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল। এভাবে মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল-
এক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যবোধ সৃষ্টি করা। সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের
মধ্যে ভুল ধারণা জন্মালে তা দূর করা।

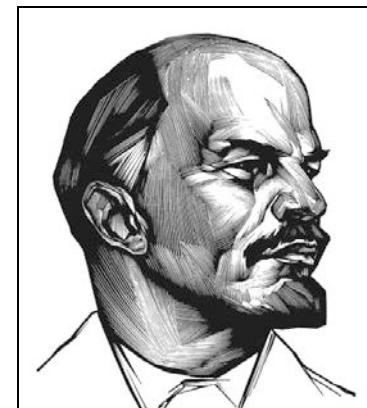
দুই. ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা। মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

তিনি. এসব উদ্দেশ্য ব্যহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

মুসলিম লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন নবাব সলিমুল্লাহ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, জাফর আলী খান, হাকিম আজমল খান ও মুহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন আগা খান।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ অক্টোবর প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেক প্রজাতন্ত্রের তাসখন্দ শহরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যখন রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। একই বছর নভেম্বর মাসে লেনিনের নেতৃত্বে দুনিয়া কাঁপানো সর্বহারা বিপ্লব সফল হয়। ফলে পৃথিবীতে প্রথম সর্বহারা মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার এই সর্বহারা বিপ্লবের খবর যাতে ভারতে আসতে না পারে তার জন্য নানা ধরনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে সময় ভারত জুড়েও চলছিল বিক্ষেপ, ধর্মঘট, হরতাল, উত্তোলণ গণআন্দোলন। এই অবস্থার পটভূমিতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির ভারতীয় দলটির জন্য দেশের বাইরে।



লেনিন

মোট ৭ জন সদস্য নিয়ে তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। মুহম্মদ শফিক এই কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিশেষ করে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ঠেকাতে পারেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম থেকে মুজাফফর আহমদের নেতৃত্বে এবং আব্দুল হালিম, আবদুর রাজাক খাঁ ও শামসুল হুদা প্রযুক্তের প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলায় কোলকাতাকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূত্রপাত ঘটে। কমরেড মুজাফফর আহমদ শুধু বাংলা নয়, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত।

| | |
|---|--|
| অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন। |
|---|--|

৫) সারসংক্ষেপ

যখন বাংলার রাজনীতি সচেতন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভূত সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি একটি রাজনৈতিক দল গঠনে প্রস্তুত; তখনই লর্ড ডাফুরিনের ইচ্ছায় হিউম জাতীয়তাবাদী নেতাদের সহযোগিতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক মুসলিম নেতা এতে যোগদান করেন। তাছাড়া ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী ছিল। এ অবস্থায় তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য একটি সংগঠন প্রয়োজন ছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ তাদের সেই প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগ গঠনের একযুগেরও বেশি সময় পার হয়েছে যখন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় বিদেশের মাটিতে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত পার্টির প্রভাবে বাংলায়, কোলকাতাকে ঘিরে কমরেড মুজাফফর আহমদের উদ্যোগে যাত্রা শুরু হয় বাংলা তথা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা তিনটি রাজনৈতিক দলের।

৬) পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে?

- | | |
|----------|----------|
| (ক) ১৯০৫ | (খ) ১৯০৬ |
| (গ) ১৯০৯ | (ঘ) ১৯১৬ |

২। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?

- | | |
|------------------|------------------|
| (ক) মুজাফফর আহমদ | (খ) আব্দুল হালিম |
| (গ) আবদুর রাজাক | (ঘ) মনি সিং |

৩। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়-

- লর্ড ডাফুরিনের পৃষ্ঠপোষকতায়
- এলান অক্টোভিয়ান হিউমের ঐক্যান্তিকতায়
- কতিপয় শিক্ষিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

কোলকাতার নির্মল সেন এক পর্যায়ে বুবাতে পারলেন যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে দেশ শাসনে তথা দাবী আদায়ের কাজে লাগাতে হলে একটি সংগঠন গড়ে তোলা অপরিহার্য। তখন একাজে কিছু ব্রিটিশ ব্যক্তিবর্গও এগিয়ে এসেছিলেন।

৪। উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির মত উন্নবিংশ শতকে ভারতে গড়ে ওঠা সংগঠনটি কী নামে পরিচিত?

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| (ক) জাতীয় যুক্তফ্রন্ট | (খ) মুসলিম লীগ অব ভারত |
| (গ) ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া | (ঘ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস |

৫। উক্ত সংগঠনটি ভারতীয় উপমহাদেশে গঠিত হয়েছিল-

- জনগণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা লাঘবে
- শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য
- ভারতীয়দের অসন্তোষ প্রশমিত করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

পাঠ-১২.৩ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ও কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

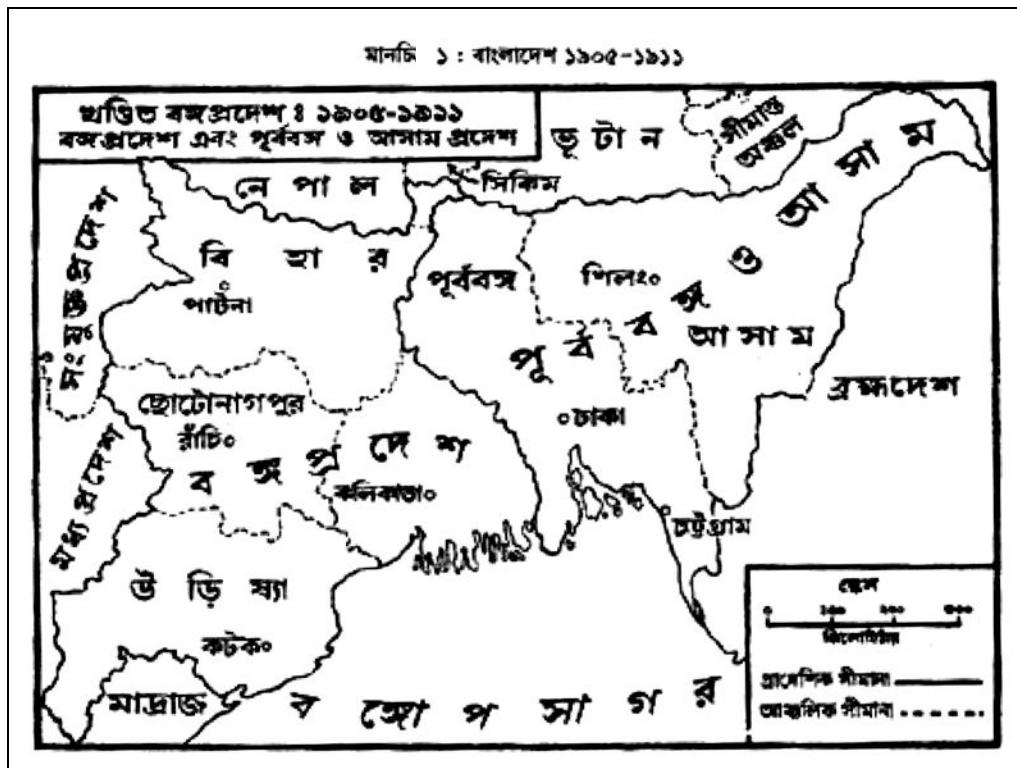


মুখ্য শব্দ (Key Words)

বাংলা ভাগ, ‘বিভেদ ও শাসননীতি’, বাংলা প্রেসিডেন্সি, বঙ্গভঙ্গ রহিত, সাম্প্রদায়িক দাঙা, গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন, সশন্ত্র সংগ্রাম।

বঙ্গভঙ্গের পটভূমি

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভক্তি ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এর বাস্তবায়ন হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদাহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ। প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী করা হয় কোলকাতাকে।



বঙ্গভঙ্গের কারণ

বঙ্গভঙ্গের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. উপমহাদেশের একত্রীয়াৎ লোকের বসবাস বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক কার্যক্রম সুরুভাবে পরিচালনা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

২. রাজধানী হওয়ার কারণে আর্থ-সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণ কেন্দ্র ছিল কোলকাতা। শিল্প কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদোলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতাকে ঘিরে। ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে। পশ্চাদপদ মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলার উন্নতি অগ্রগতির কথা বিবেচনা করে বাংলা ভাগ প্রয়োজন ছিল।
৩. সর্বোপরি কংগ্রেস নেতারা কোলকাতা থেকেই সারা ভারতের আদোলনের নেতৃত্ব দিতেন। মূলত কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবন্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপদ্জনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো অপর দিকে পূর্ব বাংলার উন্নতির নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবে লর্ড কার্জনে ‘বিভেদ ও শাসন নীতি’ প্রয়োগ করে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করে দিল।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। অপর দিকে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রাখিত করে। রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রাদের ঘোষণা দেন।

বঙ্গভঙ্গ রাদে হিন্দু সম্প্রদায় খুশি হয়, অপর দিকে মুসলমান সম্প্রদায় প্রচণ্ড মর্মাহত এবং হতাশ হয়। ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কে ফাটল ধরে। এরপর থেকে শুরু হয় সম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

স্বদেশী আন্দোলন

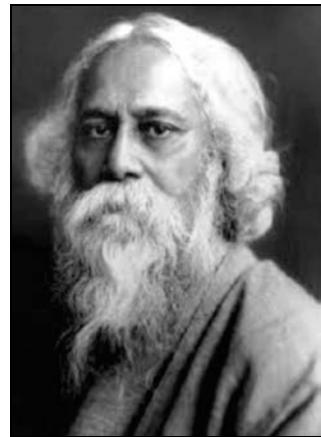
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতাত্ত্বিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, তাকেই স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। পরে বিলেতি শিক্ষা বর্জনও এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলে। একই সঙ্গে দেশী পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করে। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠে বাংলার নিজস্ব তাঁতবন্ত, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা। অপর দিকে বিলেতি শিক্ষা বর্জন এবং আন্দোলনের সাথে যুক্তদের বিভিন্ন সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার ফলে প্রয়োজনে গড়ে উঠে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বৃদ্ধকারী শ্রেষ্ঠ দেশাত্মক গানগুলো রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিজেন্দ্রলাল রায় এবং রঞ্জীকান্ত সেন প্রমুখ। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় রচনা করেন।

আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

মুসলমান সমাজ স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কারণে আন্দোলন জাতীয় রূপলাভে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষ, এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের লোকজন, দারিদ্র সমাজ এই আন্দোলনের মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়। ফলে আন্দোলন সার্বজনীন একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়তে সক্ষম হয়নি।

এ আন্দোলনের মাধ্যমে বিলেতি দ্রব্য বর্জন সফল হয়নি। কারণ কোলকাতার অবাঙালি মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ী এবং বাংলার গ্রাম গঞ্জের ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সর্বোপরি এই আন্দোলন গোপন সশন্ত সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে জনগণ আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। ফলে গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন সফলতার দ্বারে পৌছতে ব্যর্থ হয়। স্বদেশী আন্দোলনের হতাশার দিক হচ্ছে- এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কের তিক্ততা আরো বৃদ্ধি পায়। যার পরিণতি হচ্ছে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রদায় ভিত্তিতে ভারত বিভক্তি।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

| | |
|--|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <p>বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রন্দ বাঙালি জাতির ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল? এর পরিণতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন শিক্ষকের নিকট জমা দিন।</p> |
|--|---|

সারসংক্ষেপ

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার সম্প্রীতিতে চির ধরে; স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। নেতাদের উদার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে মাঝে মাঝে ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিভেদ নীতিরই জয় হয়। উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও শক্রতার পরিণতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যায়।

পাঠোন্নর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

সুজনশীল প্রশ্ন

ରୋହନ ଓ ରାଫସାନ ନ୍ତରୁନ ବହୁରେ ଜନ୍ୟ କେନାକାଟା କରାତେ ବାଜାରେ ଯାଇ । ରୋହନ ତାର ପଚନ୍ଦେର ତାଲିକାଯା ବିଦେଶି ବେଳ୍ଟ ଜୁତା ଇତ୍ୟାଦି ରାଖିଲେ ଓ ରାଫସାନ ବିଦେଶି ପଣ୍ଡ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଦେଶୀୟ ପୋଶାକସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ଡ କେନାର ପକ୍ଷେ ମତ ଦେଇ । ଅବଶେଷେ ରାଫସାନ ଭାଇ ରୋହନକେ ଦେଶୀୟ ପଣ୍ଡ କେନାର ଜନ୍ୟ ରାଜୀ କରାତେ ସକ୍ଷମ ହେଁ ଏବଂ ଉଭୟେ ଦେଶୀ ପଣ୍ଡ କିନେ ବାସାଯ ଆସେ ।

ক. মুসলিম লীগ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. সর্বভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় কেন?

গ. পাঠ্য পুস্তকের কোন আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাপ্তি হয়ে রাফসান দেশীয় পত্র ক্রম করেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. তুমি কী মনে কর রোহনের মানসিকতা নিজ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ? যুক্তি দিন।

পাঠ-১২.৪] খিলাফত, অসহযোগ ও সশন্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন



এই পাঠ শেষে আপনি

- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাঃপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলার সশন্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

জাতীয় ভিত্তিক গণআন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, খলিফা, রাওলাট আইন, সশন্ত্র বিপ্লব, গেরিলা পদ্ধতি, চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী, স্বাধীন চিটাগাং সরকার।



ভূমিকা

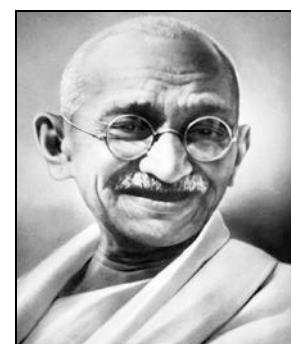
হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণ-আন্দোলন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কঁপিয়ে দেয়। এই ঐক্য স্বল্পকালের হলেও সারা ভারতের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

খিলাফত আন্দোলনের কারণ

ভারতের মুসলমানেরা তুরকের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরকের সুলতান ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষে অবলম্বন করলে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হন। কারণ ধর্মীয় কারণে তাঁরা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। কিন্তু এই যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে জার্মানির পক্ষে যোগদানের কারণে শাস্তি স্বরূপ তুরকের খণ্ড-বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করা হয়। ফলে ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা এবং তুরকের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্বদেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও দুই ভাই মাওলানা শওকত আলী এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী।

অসহযোগ আন্দোলনের কারণ

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু চেম্সফোর্ড সংস্কার আইনের নৈরাশ্যজনক ধারাগুলো ভারতীয়দের মনে গভীর হতাশার সৃষ্টি করে। ঠিক এ সময় একদল ভারতীয় যুবক জার্মানির সহযোগিতায় স্বাধীকার অর্জনের চেষ্টা করে। এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার নির্যাতন ও দমনমূলক রাওলাট আইন পাস করে। কংগ্রেস এই আইনের তীব্র নির্দাও প্রতিবাদ করে। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে হরতাল পালিত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এক কলক্ষময় দিন। এই দিন পাঞ্জাবের অম্তসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গুলি চালায়। ফলে প্রায় ৪০০ সাধারণ মানুষ নিহত হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের উপর হস্তক্ষেপ এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়।



মহাত্মা গান্ধী

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলন সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরা নামক স্থানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সহিংসতায় রূপ নিলে হঠাত করে এই আন্দোলন বন্দের ডাক দেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হলে আন্দোলন স্থিমিত হয়ে যায়। অপর দিকে তুরকের

জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল আতার্তুক বিদেশী বাহিনীকে দেশ থেকে বিতরিত করেন। তুরকে জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে খিলাফত আন্দোলনও থেমে যায়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য

এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো এক্যবন্ধভাবে আন্দোলনে নামে। কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ বিভেদ ও শাসননীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান এক্য ও সম্পূর্ণীর এক রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। অপর দিকে এই এক্য ব্রিটিশ সরকারকে শক্তি করে তোলে। এই আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের নয়, সারা ভারতের জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম এক্য দুই-ই ছিল ক্ষণস্থায়ী। আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

বাংলার সশন্ত্ব বিপ্লবী আন্দোলন

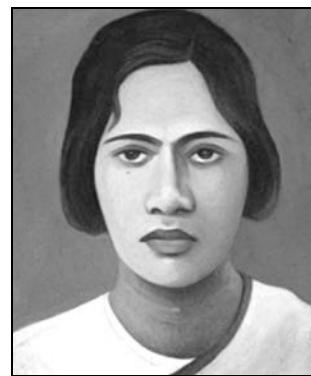
বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক যুব সমাজকে সশন্ত্ব বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। সশন্ত্ব সংগ্রামের মাধ্যমে দেশস্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাকেই বাংলার সশন্ত্ব বিপ্লবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অতক্রিতে বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডিত ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হলেও এর আগেই সংগ্রাম শুরু হয়ে ছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদ্রিরামের বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশন্ত্ব বিপ্লবী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের আগেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশন্ত্ব আন্দোলন কিছুটা স্থিতি হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। এই আন্দোলন কোলকাতা কেন্দ্রিক হলেও ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও। এই সময় বিপ্লবীরা ইংরেজ কর্মকর্তা, ইংরেজদের হত্যা, বোমা হামলার মধ্য দিয়ে ইংরেজ সরকারের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কোলকাতায় গোপনে বোমা তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র আনার পরিকল্পনাও করা হয়।



মাস্টারদা সূর্যসেন



ক্ষুদ্রিরাম



প্রতিলতা

বিপ্লবীদের কোনো কোনো পরিকল্পনা সফল হয়, কোনোটি ব্যর্থ হয়। ইংরেজ প্রশাসনের চরম নির্যাতন মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কোনো কিছুই বিপ্লবীদের তাদের দুঃসাহসী সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের বেঙ্গলঅর্ডিনেন্স জারির কারণে বহু বিপ্লবী কারারূদ্ধ হয়। ফলে আন্দোলন কিছুটা স্থিতি হলেও ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাআন্ত গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার বৃদ্ধি পায়। বাঙ্গালি তরুণরা মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে সশন্ত্ব আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। এমন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, সার আসল নাম সূর্যসেন (১৮৯৪-১৯৩৪)। তিনি চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম হয় ‘চিটাগাং রিপাবলিকান আর্ম’। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠান দখল করে, সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ‘স্বাধীন চিটাগাং সরকার’ গঠনের ঘোষণা দেয়। যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। ফলে গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে বিপ্লবীরা পিছু হচ্ছে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সূর্যসেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ খ্�রিস্টাব্দে সংক্ষিপ্ত ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং তাঁর লাশ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়। সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাও ছিলেন। তাঁর

ମଧ୍ୟେ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ କଲ୍ପନା ଦତ୍ତ ଓ ପ୍ରୀତିଲତା । ପ୍ରୀତିଲତା ତାର ଯୋଗ୍ୟତାର ଜନ୍ୟ ଚଟ୍ଟଘାମ ‘ପାହାଡ଼ତଳୀ ଇଉରୋପିଆନ କ୍ଲାବ’ ଆକ୍ରମଣେର ନେତୃତ୍ବ ଦେନ । ସଫଳ ଆକ୍ରମଣେର ପରେ ସହ୍ୟୋଦ୍ଧାଦେର ବାଁଚାତେ ଧରା ପଡ଼ାର ଆଗେଇ ବିଷପାନେ ତିନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେନ । ଏହି ଶଶ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେ ୧୯୩୪ ଖିସ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

এই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ গণবিচ্ছিন্নতা। শুধু কিছু সংখ্যক দুঃসাহসী শিক্ষিত দেশপ্রেমিক তরুণ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বিপ্লবীদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে সাধুরণ মানুষ আতঙ্কিত ছিল। বিষয়টি গোপনে পরিচালিত হতো বলে এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না।

তাছাড়া বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠী এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সনাতন ধর্মীয় কিছু আচার আনুষ্ঠানিকতা মেনে শপথ নিতে হতো বলে মুসলমানদের পক্ষে এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

সর্বোপরি চরম দমননীতির কারণে গণবিচ্ছিন্ন বিপ্লবীরা অসীম সাহস দেশপ্রেম থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হন। শশস্ত্র বিপ্লব সফল না হলেও বিপ্লবীদের আত্মাহৃতি, দেশপ্রেম ও সাহস পরামর্শ বাংলা তথা ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে ছিল। তাঁদের আত্ম্যাগ পরবর্তী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়ে ছিল।

| | |
|--|--|
|  <p>অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) শিক্ষার্থীর কাজ</p> | <p>সশন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করছেন।</p> |
|--|--|

 সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দুটি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও যৌথ নেতৃত্বের কারণে হিন্দু মুসলমানের একব্যবস্থা সংগ্রাম দেশব্যাপী গৎসচেতনতা জাগরণ সৃষ্টিতে সফল হয়। অপর দিকে দুঃসাহসী তরঙ্গদের সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তাদের দেশপ্রেম আত্মাহৃতি কিংবদন্তীর মতো মানবে মধ্যে মধ্যে ফিরতে থাকে। সুতরাং এই সব আন্দোলন গণমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

পাঠ্যোন্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

খিলাফত

১। কে তুরস্ককে আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন?

- (ক) রেজা শাহ
(গ) আবুল কালাম আজাদ

(খ) মুহাম্মদ আলী জিনাহ
(ঘ) মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক

২। খিলাফত আন্দোলন বলতে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত?

- (ক) ১৯১৯ সালের মুসলিম জাহানের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন
(খ) ১৯২০ সালে তুরস্কে ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন
(গ) তুরস্কের অধিগৃহণ ও মুসলিম জাহানের খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন
(ঘ) বাংলার মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার যে আন্দোলন

ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ନ ଏବଂ ୩ ଓ ୪ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିନ । (ଅଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ওফাতের পর পর্যায়ক্রমে তার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রধান নিযুক্ত হন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)। সে সময় থেকেই খলিফা পদটি মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ পদ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

৩। উদ্দিপকের ন্যয় মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ পদের সম্মান রাখতে বৃটিশ ভারতে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে?

- (ক) অসহযোগ (খ) খিলাফত
 (গ) স্বদেশী (ঘ) ভারতছাড়

৪। ভারতে উক্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যারা-

- (ক) মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী
- (খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী
- (গ) জওহরলাল নেহরু ও মতিলাল নেহরু
- (ঘ) আবুল কালাম আজাদ ও আবুল হাশিম

অসহযোগ

১। মহাআন্তা গান্ধী কখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন?

- | | |
|---------------|---------------|
| (ক) ১৯০৯ সালে | (খ) ১৯১৪ সালে |
| (গ) ১৯১৮ সালে | (ঘ) ১৯১৯ সালে |

২। কোন আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম সবাই সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল?

- | | |
|---------------------|--------------|
| (ক) খিলাফত ও অসহযোগ | (খ) অসহযোগ |
| (গ) ফরায়েজি | (ঘ) ওয়াহাবী |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

এই অন্ত কিছুদিন আগে বিভিন্ন চা বাগানে নিম্ন মজুরীর প্রতিবাদে চা শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে আসে। রাস্তা অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে থাকলে চা শ্রমিক নেতা নিতাই তাদের সহিংস আচরণ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বান জানান।

৩। উদ্দীপকের শ্রমিক নেতাই, ভারতীয় উপমহাদেশের কোন স্বনামধন্য নেতার গৃহীত নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন-

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (ক) মাস্টারদা সূর্যসেন | (খ) স্যার সৈয়দ আহমেদ |
| (গ) মহাআন্তা গান্ধী | (ঘ) আবুর কালাম আজাদ |

৪। উক্ত নেতার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল-

- i) হিন্দু মুসলিম এক্য দৃঢ়করণ
- ii) নির্যাতন মূলক আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
- iii) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সশস্ত্র

১। মাস্টারদার প্রকৃত নামের ক্ষেত্রে কোনটি সমর্থনযোগ্য-

- | | |
|------------------|--------------|
| (ক) মাস্টার মশাই | (খ) সূর্যসেন |
| (গ) আরজ আলী | (ঘ) অজয় সেন |

২। প্রীতিলতা কোন স্থান আক্রমনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (ক) পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব | (খ) পাহাড়তলী সানশাহিন ক্লাব |
| (গ) পাহাড়তলী খ্রিস্টার ক্লাব | (ঘ) পাহাড়তলী ইউরেশিয়ান ক্লাব |

৩। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন কোনটি?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (ক) নেতৃত্বের অভাব | (খ) গণবিচ্ছিন্নতা |
| (গ) ধর্মীয় বিরোধ | (ঘ) একতার অভাব |

পাঠ-১২.৫ | লাহোর প্রস্তাব



এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি বলতে পারবেন;
- লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া এর পরিণতি জানতে পারবেন।



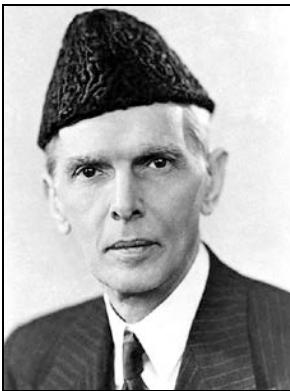
স্বারাজদল, বেঙ্গল প্যাস্ট, নেহরু রিপোর্ট, চৌদ্দ দফা, সাইমন কমিশন রিপোর্ট, গোলটেবিল বৈঠক, দ্বি-জাতিতত্ত্ব, দিল্লি প্রস্তাব-১৯৪৬।

মুখ্য শব্দ (Key Words)



লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দিলে দেশবন্ধু চিন্দ্রঝঞ্জন দাস তাঁর সমর্থকদের নিয়ে ‘স্বারাজদল’ গঠন করেন। তিনি মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সমর্বোত্তা ও সমতার ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত ‘বেঙ্গল প্যাস্ট’ নামের এই চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে পড়ে কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা এবং দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুর কারণে। পরবর্তী কালে ‘নেহরু রিপোর্ট’, জিনাহর চৌদ্দ দফা, ব্রিটিশ সরকারের সাইমন কমিশন রিপোর্ট, লঙ্ঘনে অনুষ্ঠিত তিনটি গোলটেবিল বৈঠক; কোনটিই সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। এই পটভূমিতে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়।



মোহাম্মদ আলী জিনাহ



জওহরলাল নেহরু



শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

এই আইনের আওতায় অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনৈতিক সংকট আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলিম বিদ্যুতী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। তাছাড়া নির্বাচনের পরে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু মন্ত্র্য করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই। মুসলমানদের মধ্যে এর তীব্র বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয়। জিনাহ নেহরুর বক্তব্যের প্রতিবাদে তার ‘দ্বি-জাতিতত্ত্বের’ ঘোষণা দেন। তার দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস-গ্রন্থ সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উভয়যোর জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। এভাবে লাহোর প্রস্তাবের আগেই হিন্দু ও মুসলমানের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের চিন্তার প্রকাশ ঘটতে থাকে।

অবশ্য মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী। দুটি প্রস্তাবের একটিতেও বাংলার মুসলিম প্রধান অঞ্চলের

কথা বলা হয়নি। চৌধুরী রহমত আলীর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।

লাহোর প্রস্তাব : প্রধান ধারাসমূহ

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ. কে ফজলুল হক ২৩ মার্চের অধিবেশনে তাঁর রচিত যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তাই ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ-

ক. ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

খ. পূর্বোক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রদেশগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।

গ. সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ. প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

উল্লিখিত প্রস্তাবের ধারাসমূহের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এটিকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রচার হতে থাকে। ফলে দ্রুত এ প্রস্তাবটি ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতি

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি অসম্ভব বলে উল্লেখ করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে বাঙালি মুসলমান পূর্বাংশ নিয়ে ‘স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ৯ এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জিন্নাহ বেআইনীভাবে ‘লাহোর প্রস্তাব’ সংশোধনের নামে ভিন্ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী নয়, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে উত্থাপিত দিল্লি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্য এই যে- এটি গ্রহণ বর্জন এবং বাতিল কোনোটাই করা হয়নি।

| | |
|---|--|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | লাহোর প্রস্তাব কী পাকিস্তান প্রস্তাব ছিল? এই প্রস্তাবের ধারাসমূহ অনুযায়ী কী পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন। |
|---|--|

১ সারসংক্ষেপ

বিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যার মাধ্যমে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। ভারতের এক জটিল রাজনৈতিক সংকটের সময় এ.কে. ফজলুল হক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের আইন সভার সদস্যদের সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠন করা হয়- যার নাম পাকিস্তান।

ପାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଯନ-୧୨.୫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। বাংলায় স্বরাজ দলের অভূতপূর্ব জয়ের কৃতিত্ব ছিল কার?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (ক) মহাআগামী | (খ) চিন্দ্রজিন দাস |
| (গ) মতিলাল নেহেরু | (ঘ) শরৎ বসু |

২। বেঙ্গল প্যাস্ট স্বাক্ষরিত হয় কখন?

- | | |
|---------------|---------------|
| (ক) ১৯২০ সালে | (খ) ১৯২১ সালে |
| (গ) ১৯২২ সালে | (ঘ) ১৯২৩ সালে |

৩। লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? (জ্ঞানমূলক)

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (ক) মাওলানা ভাসানী | (খ) আল্লামা ইকবাল |
| (গ) এ কে ফজলুল হক | (ঘ) চৌধুরী রহমতুল্লাহ |

৪। লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অঞ্চলসমূহ- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i) ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ii) পূর্বাঞ্চলে iii) দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

উনিশ শতকে চল্লিশের দশকে ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। মনে করা হয়ে থাকে এ প্রস্তাবের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। এটি বৃত্তিশ ভারতের তৎকালিন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ক. কোন আইনের বলে পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম হয়?

খ. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্বীপকে আপনার পঠিত কোন প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে? তার মূল কারণ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ - আপনি কী একমত? মতামত দিন।

পাঠ-১২.৬ | ব্রিটিশ শাসন অবসান



এই পাঠ শেষে আপনি

- ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি বিষয়ে (১৯৩৭-৪৭) মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে পারবেন;
- ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যন্তর বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।



মুক্ত শব্দ (Key Words)

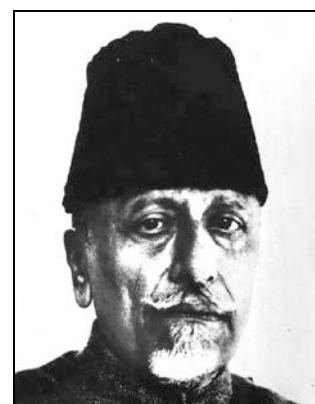
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ক্রিপস মিশন প্রস্তাব; আজাদ হিন্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ সরকার, মিত্রবাহিনী, বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব, নৌবিদ্রোহ, ক্যাবিনেট মিশন, ভারত স্বাধীন আইন-১৯৪৭।



‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস মিশন প্রস্তাব সব মহল প্রত্যাখ্যান করলে সমগ্র ভারত ব্যাপী তীব্র গণঅসত্ত্ব দেখা দেয়। উপমহাদেশের বাইরে এ সময় পৃথিবী ব্যাপী চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসায়জ্ঞ। জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র জাপানের ভারত আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতিকে এই আক্রমণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়লে জাপানের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনার পরিবর্তন হতে পারে। এই চিন্তা করে তিনি ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যেতে বলেন। শুরু হয় কংগ্রেসের ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে তিনি তাঁর দৃঢ় ঘোষণায় উল্লেখ করেন ‘আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই, উষালঞ্চের আগেই যদি তা সম্ভব হয়।’ তিনি আরো বলেন ‘আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করবো। আর এ হবে আমাদের জীবনে শেষ লড়াই।’

কিন্তু ইংরেজ সরকার কোনোভাবেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। সরকার এই আন্দোলন দমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ঐ দিনই মধ্য রাতে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বন্দি গান্ধীজি, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহেরুসহ অনেকে গ্রেফতার হন। কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সব নেতা কারাগারে বন্দি হন। নেতৃত্বন্দির গ্রেফতারের কারণে অহিংস আন্দোলন ভয়াবহ সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। নেতৃত্বহীন আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে সারা ভারত নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কোথাও কোথাও অস্থায়ী সরকার, কোথাও বাজাতীয় সরকার গঠন করা হয়। ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তমলুক থানা দখল করার সময়, মাতঙ্গিনী হাজরা নামে এক বৃক্ষ পুলিশের গুলি সত্ত্বেও জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে রেখে শহীদ হন।



মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

এই আন্দোলনের পরপর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মানুষকে দিশেহারা করে তোলে। তাছাড়া দেশব্যাপী মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, দুনীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি সব মিলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে হতাশ জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে।

সুভাষচন্দ্র বসুর সশন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ

যখন দেশের অভ্যন্তরে চরম হতাশা বিরাজ করছে, ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তখন যুদ্ধ করে ইংরেজ বিভাড়নের জন্য বাঙালিদের নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ বা Indian National Army (INA)। এই বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কংগ্রেসের প্রাঞ্জন সভাপতি, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ বসু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সবার অলঙ্কে দেশত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি ইংরেজদের শক্ত ভূমি জার্মানিতে যান এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি সেনাবাহিনী গঠনে জার্মান সরকারের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, যিনি বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করে মাতৃভূমি স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় ভূখণ্ডের আন্দামান দ্বীপে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সরকারে সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সুভাষ বসু তখন ছিল ইংরেজদের কাছে আতঙ্ক। এই দুঃসাহসী বাঙালি নেতার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মা হয়ে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করে। কোহিমা ইঞ্জলের রণাঙ্গনে বীরত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে এসব অঞ্চল দখল করে নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণাঙ্গনে জাপানি বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পিছু হটলে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পিছু হটতে হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের রেঙ্গুন ত্যাগ, মিত্রবাহিনীর বিজয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রযাত্রা ব্যহত করে। ব্যর্থ হয় এক দুঃসাহসী বাঙালি দেশপ্রেমিকের লড়াই করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা। নেতাজি সুভাষ বসু সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। তখনি রচিত হতো বাঙালির দেশপ্রেম আর বীরত্বের আরেক গৌরবের ইতিহাস।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান রাজনীতিবিদদের উত্থান ঘটে। পরপর যে চারটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সবগুলোই গঠন করেন মুসলিম নেতারা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটি নতুন পার্টি জনসমর্থন লাভ করে। এর সভাপতি ছিলেন এ কে ফজলুল হক। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে। তবে কেউ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এককভাবে সরকার গঠন করার যোগ্যতা থেকে দু'দলই ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তবে এই মন্ত্রিসভা ছিল দুর্বল। ফলে কৃষক প্রজা পার্টি ও দুর্বল হয়ে পড়ে। জিনাহের সাথে মতবিরোধের কারণে ফজলুল হক ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন থাকায় ঐ বছর ডিসেম্বর মাসেই তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বহুদলের সমাবেশে গঠিত এই মন্ত্রিসভা বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করে। ফজলুল হক চেয়ে ছিলেন এই নতুন ধারার মাধ্যমে বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন না পেয়ে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মৃত্যু বরণ করে। এই বছর ১৩ এপ্রিল দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্ত্রিসভারও পতন ঘটে।



হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি

পরের বছর প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম লীগ দু'টি উপদলে বিভক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৪ আসনে জয়লাভ করে। যা প্রকারভাবে পাকিস্তান দাবির প্রতি বাংলার মুসলমানদের সুস্পষ্ট সমর্থনের প্রতিফলন ঘটায়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে

এ নির্বাচন ও নির্বাচনের ফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রকৃত পক্ষে সোহরাওয়ার্দির মন্ত্রিসভার সময়কাল ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান, দেশ বিভাগের রাজনৈতিক পরিবেশে কলকাতার দাঙা, স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও ভারত বিভাগ ছিল এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক চরম পর্যায়ে চলে গেলে তা এক রক্তক্ষয়ী দাঙায় রূপ নেয়। এ রকম এক জটিল ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ঘোষণা করে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাসে বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে খ্যাত।

মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তিকালে শরৎচন্দ্র বসু এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি ‘সোস্যালিস্ট রিপাবলিক’ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের প্রবক্তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর বাংলাকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথম দিকে কংগ্রেস মুসলিম লীগ উভয় দলের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলেও জিনাহ, গান্ধীর প্রতি মৌন সমর্থন ছিল। মুসলিম লীগের গোঁড়াপছীরাও সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এর তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে শুধু কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব সব দলের সমর্থন হারায়।

একই সঙ্গে পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রিক বাঙালি অবাঙালি ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী-এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি ঢাকার হিন্দু সম্পদাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও যুক্ত বাংলার বিপক্ষে সোচার ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যুক্তবাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাতে থাকে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটন ভারত বিভক্তির ঘোষণায় পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের পরিকল্পনা করেন। জুন মাসের ২০ তারিখে বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিলে বাংলা ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে ভারত ভাগের সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। ফলে উক্ত আইন অনুসারে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট জন্ম নেয় পাকিস্তান নামের এক ক্রিম মুসলিম রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলা যুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। আর ১৫ আগস্ট জন্ম হয় আরেক রাষ্ট্র ভারতের, যার সঙ্গে যুক্ত হয় পশ্চিম বাংলা। এ ভাবেই প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যন্তর

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সশস্ত্র অভিযান ব্যর্থ হলেও তাঁর অভিযান ভারতীয় স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার করেছিল। তিনি ব্রিটিশ ভারতে দেশীয় সেনাসদস্যদের আনুগত্যে যেমন ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমন তাদের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এ কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতার পর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোমাইয়ে নৌ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব আলামত প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয়দের আয়ত্নে রাখা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয় লাভ করে। এই পরিবর্তনের ধারা ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। শ্রমিকদল ভারতের স্বাধীনতা দানের এবং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী এ্যাট্লি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন অবাঙালি ব্যবসায়ী ও রক্ষণশীলদের নেতা। অপর দিকে আবুল হাশিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রগতিশীল বাঙালিদের নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীর বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে মুসলমান তরঙ্গ ছাত্রসমাজ মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রধান নির্বাচনী কর্মসূচি করে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক আইন সভায় অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচন এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুস্পষ্ট রায় ঘোষিত হয় এবং মুসলিম লীগ নিজেকে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী এক মাত্র দল হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান পাকিস্তান অংশে এই নির্বাচনে মুসলিম

লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট লাভে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের ভোটে পাকিস্তান প্রস্তাব জয়ী হয়েছিল। এই জয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি এবং তাঁর অনুসারী ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। নির্বাচন-উত্তর উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভিন্ন পরিস্থিতির উভবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিচক্ষণ এ্যাটলি সরকার বুঝতে পারেন যে সম্মানজনকভাবে খুব বেশি দিন ব্রিটেনের পক্ষে ভারত শাসন করা সম্ভব হবে না। ফলে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সচিব প্র্যাথিক লরেসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভারতে আসে। যাকে বলা হয়, ক্যাবিনেট মিশন। এ সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশন পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়ে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্যাবিনেট মিশন মে মাসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে।

মন্ত্রিমিশন বা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। এতে পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য হলেও মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে। কারণ তারা মনে করে যে, পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত আছে। কংগ্রেস এ পরিকল্পনায় এক কেন্দ্রিক সরকার গঠনের মধ্যে অখণ্ড ভারত গঠন দাবির প্রতিফলন দেখতে পায়। কংগ্রেস নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তাবটি গ্রহণে রাজি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে মুসলিম লীগও তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো অকেজো হয়ে যায়।

বড় লাট ওয়েভেল এই অবস্থায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দলকে অস্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের আহ্বান জানান। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি নেহরুর মুসলিম লীগ স্বার্থ বিরোধী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদানের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কিন্তু বড় লাটের আহ্বানে নেহরু সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে। এই দিন ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের আগেই ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের জন্য লর্ড ওয়েভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটনকে ভারতের বড় লাট হিসেবে পাঠানো হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দেশেরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ দেশ-বিভাগে সম্মত হতে বাধ্য হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের ৩ তারিখে মাউন্টব্যাটন সুস্পষ্টভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। অপরদিকে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ায় মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই লন্ডনে কমপ্ল সভার এক ঘোষণায় ভারত, পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন ডেমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার র্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমানা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। ৯ আগস্ট র্যাডক্লিফ তাঁর সীমান্ত রোয়েদাদ সমাপ্ত করে তা ভাইসরয়ের কাছে জমা দেন। যা রহস্যজনক কারণে আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করা হয়। যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বিভক্ত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <p>ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এ্যাটলি ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করেন? সতীর্থদের সঙ্গে এর পিছনের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিন।</p> |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসন অবসানের পূর্ব মুহূর্তে শুধু বাংলা না সারা ভারত জুড়ে ক্ষেত্রের আগুন জলচিল। ভারতবাসী স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ইংল্যান্ডের নব নির্বাচিত লোবার পার্টি সরকার বুরাতে পারে এই অবস্থায় বেশি দিন ভারত শাসন করা যাবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বড় লাট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ‘ভারত স্বাধীনতা আইন’ প্রণয়ন করেন এবং এই বছর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বিভক্ত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ।

পাঠোভ্র মূল্যায়ন-১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। গান্ধীজি কত সালে “ভারতছাড়” আন্দোলন প্রচার করেন?

- | | |
|----------|----------|
| (ক) ১৯৪২ | (খ) ১৯৪৩ |
| (গ) ১৯৪৪ | (ঘ) ১৯৪৫ |

২। ১৯৪৩ খ্রিঃ স্ট্রট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ-

- i) মানুষকে দিশেহারা করে তোলে
- ii) অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে
- iii) ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৩। INA নিচের কোনটিকে সমর্থন করে? (প্রয়োগ)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| (ক) Indian National Army | (খ) Indian National Assembly |
| (গ) Indian aceademy for national Army | (ঘ) International New Army |

৪। বৃহত্তর যুক্ত বাংলার প্রস্তাবকে বলা হয়-

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (ক) বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব | (খ) হাশিম-বসু প্রস্তাব |
| (গ) হাশিম-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব | (ঘ) হক-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব |

উত্তরমালা

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১২.১ : ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ক

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১২.২ : ১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. গ

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১২.৩ : ১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ঘ

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১২.৪ : ১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ক

১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. ক

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১২.৫ : ১. খ ২. ক ৩. খ

১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. ক

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১২.৬ : ১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ক

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা ১৯৪৮-১৯৬৯

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৩.১ : ভাষা আন্দোলন : পটভূমি, ঘটনা প্রবাহ ও প্রভাব

পাঠ-১৩.২ : যুক্তফুট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

পাঠ-১৩.৩ : সামরিক শাসন ও আইয়ুবীয় স্বৈরাচার

পাঠ-১৩.৪ : ছয় দফা আন্দোলন

পাঠ-১৩.৫ : আগরতলা মামলা ও বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাঠ-১৩.৬ : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যর্থনা



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

পাঠ-১৩.১ ভাষা আন্দোলন : পটভূমি, ঘটনা প্রবাহ ও প্রভাব



এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট জন্মের সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বলতে পারবেন;
- ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- একুশে ফেরুজ্যারির ঘটনাবলির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

পাকিস্তানের জন্ম, প্রদেশের সংখ্যা, পাকিস্তান গণপরিষদ, পাকিস্তানে প্রথম গভর্নর জেনারেল ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তমাদুন মজলিশ, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ১১ মার্চ, ২১ ফেব্রুয়ারি, শহীদ দিবস।



ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাস হয়। এই আইন বলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান ছিল এক অস্বাভাবিক রাষ্ট্র। বিশাল ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার ব্যবধানে দুই ভিন্ন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তানকে ৫টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের পূর্বাংশে ছিল পূর্ববাংলা নামক ১টি প্রদেশ এবং পশ্চিমাংশে ছিল ৪টি প্রদেশ। যথা পাঞ্জাব, সিঙ্গু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। ১৯৫৫ সালে পূর্ববাংলা প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। ঐ সালে পশ্চিমাংশের সবগুলো প্রদেশ এক ইউনিটে এনে একটি প্রদেশ করা হয় এবং তার নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৮৪.৩ ভাগ আয়তন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং মাত্র ১৫.৭ ভাগ আয়তন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। জনসংখ্যার শতকরা ৪৩.৭ ভাগ লোকের বাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫৬.৩ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন মোহাম্মদ আলী জিল্লাহ। তিনি লিয়াকত আলী খানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলা নামক যে প্রদেশ ছিল তা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামক দুটি অংশে বিভক্ত করে এবং পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অস্তর্ভুক্ত এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা করে। তখন ঢাকায় পূর্ব বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়।

পূর্ববাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন স্যার ফ্রেডারিক বোর্ণ। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিল্লাহ মৃত্যবরণ করলে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন নূরুল আমিনকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর শাসনামলে পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়।

| |
|------------------|
| লোকসংখ্যা |
| ৪৩.৭ ভাগ |
| পশ্চিম পাকিস্তান |
| ৫৬.৩ ভাগ |
| পূর্ব পাকিস্তান |

| |
|------------------|
| ভূখণ্ড |
| ৪৩.৭ ভাগ |
| পশ্চিম পাকিস্তান |
| ১৫.৭ ভাগ |
| পূর্ব পাকিস্তান |



ভারত ও পাকিস্তান (১৯৪৮-১৯৭১)

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-৫২)

পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৯৭ ভাগ এবং পূর্ব বাংলায় শতকরা ৮০ ভাগ অধিবাসী ছিল মুসলমান। অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্ম এক হলেও ভাষা ছিল ভিন্ন। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির সময় রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্রসমাজ, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী প্রমুখ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করে। উক্তর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানগর্ভ যুক্তি দিয়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি সমর্থন জানান। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত নবগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন পূর্বপাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মী সম্মেলনে বাংলাভাষাকে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করার দাবি জানানো হয়। একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষার প্রশ্নে সোচার হয়। সংগঠনটির নাম ছিল ‘তামাদুন মজলিশ’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম

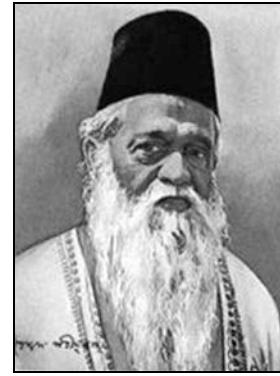
২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে উক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি পুষ্টিকা প্রকাশ করে। পুষ্টিকাটির নাম ছিল : ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা - বাংলা না উর্দু’। তামাদুন মজলিশ ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বহু প্রথ্যাত এবং অখ্যাত লেখক বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাঙালিদের দাবি উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়। যদিও পাকিস্তানের শতকরা মাত্র ৩.২৭ ভাগ লোকের মাত্রভাষা ছিল উর্দু তথাপি পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকেট, মানি অর্ডার ফরম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে কেবল ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয়তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিরোগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি পাকিস্তানের গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। ফলে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮)। অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, যেহেতু পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাত্রভাষা বাংলা, সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু তার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। গণপরিষদের অধিবেশনে লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, যেহেতু পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র তাই পাকিস্তানের সরকারি ভাষা মুসলমানের ভাষা হওয়া উচিত। লিয়াকত আলী খান আরও যুক্তি দেন যে, যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়। গণপরিষদে অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবকে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বিনষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন। গণপরিষদ অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আনীত প্রস্তাব ভোটে দেয়া হলে অগ্রাহ্য হয়। সে সময় পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি মুসলমান সদস্যগণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি গণপরিষদে অগ্রাহ্য হওয়ায় পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। বাংলা ভাষার সংগ্রামকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকার ফজলুল হক হলে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করা হয়। পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। পরিষদে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রত্যেকটি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা: তামাদুন মজলিশ, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল সহ অন্যান্য ছাত্রাবাস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ফেডারেশন।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ (১৯৪৮) পূর্ব বাংলার সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। কিন্তু পূর্ববাংলার সরকার বাংলাভাষার আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিরোধী ঘৃঢ়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করে। সরকারী পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের মিছিল ও সমাবেশে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেফ্টার করা হয়। বন্দুকে, জেলের বাইরে এবং ভেতরে থাকার সময় বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার ভূমিকা পালন করেছিলেন। ছাত্রদের আন্দোলন বন্ধ হয়ে



উক্তর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

যায়নি, বরং পরের দিনগুলিতে এই আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে। সাধারণ জনসাধারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরিস্থিতি খারাপ বুঝতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ১৫ মার্চ আলোচনায় বসেন এবং ৮ দফা চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। চুক্তির মূল বিষয় ছিল ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত যাদেরকে গ্রেপ্তর করা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে, পুলিশ অত্যাচার নির্যাতনের বিষয়ে তদন্ত করা হবে, পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উথাপন করা হবে, সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে ইত্যাদি।

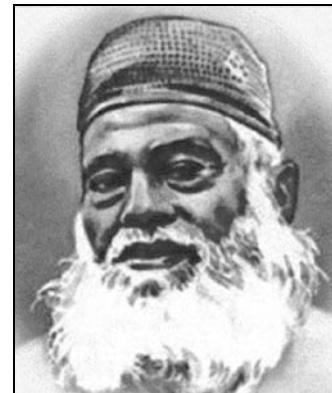
কিন্তু পূর্ববাংলা সরকার চুক্তির শর্তগুলি বাস্তবায়ন না করায় ভাষা আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯ মার্চ পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান। ২১ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। জিন্নাহর এই ঘোষণার প্রতিবাদে জনসভার কোনো কোনো অংশে মৃদু ‘নো’, ‘নো’ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উক্ত জনসভার তিনি দিন পর (২৪ মার্চ, ১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই হবে উর্দু। জিন্নাহর এ উক্তির তৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবুন্ড ‘না’, ‘না’ ধ্বনি উচ্চারণ করে। জিন্নাহর ঘোষণায় পাকিস্তান সরকারের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে ভাষার আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ২৪ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক প্রতিনিধিদল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং জিন্নাহর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

জিন্নাহর পূর্ববাংলা সফর ভাষা-আন্দোলনকে স্তমিত করে দেয়। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ শ্রদ্ধাবোধ অনেক আন্দোলনকারীকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে ফেলে। এমনিক তমাদুন মজলিশও আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে। তবে ভাষার জন্য ছাত্রদের মনে ক্ষেত্র অব্যাহত থাকে। ছাত্ররা ১৯৪৮ এর পর থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত প্রতি বছর ১১ মার্চ পালন করতেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয়। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ২৭ জানুয়ারি (১৯৫২) এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খাজা নাজিমউদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২) ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। ৩০ জানুয়ারির সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা শহরে ছাত্রধর্মঘট, বিক্ষেপ মিছিল ও ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাষা আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ৩১ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে একটি সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানী। সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমাদুন মজলিশ, ইসলামী ছাত্রসংঘ, যুবসংঘ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রত্তি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৮ মতান্তরে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষেপ ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করার কারণ ছিল এই যে, ঐদিন পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বন্দের পরিকল্পনা ছিল ঐ অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ইংরেজি পত্রিকা ‘দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার’ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সমস্ত ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা জারি করার অর্থ একসঙ্গে ৪ জনের বেশি লোকের সমাগম, মিছিল, শোভাযাত্রা, সভা ও সমাবেশ করা আইনবিরোধী।

সরকারি ঘোষণায় ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

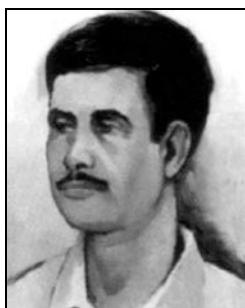


মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার, ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা জমায়েত হতে থাকে। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা দুজন দুজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে থাকে। বেলা ১১ টায় ছাত্রসভা শুরু হয়। সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পত্তা হিসেবে দশজন দশজন করে ছাত্র রাস্তায় মিছিল বের করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অনেকেই এদিন গ্রেফতার হন। পুলিশ মিছিলকারীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। কিন্তু সব বাধা উপেক্ষা করে ছাত্ররা মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান ফটকের কাছে জমায়েত হন। মেডিকেল হোস্টেলের নিকটেই ছিল জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়াম যেখানে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের সভা বসত। আন্দোলনকারী ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলা আইন পরিষদে যোগদানকারী সদস্যদের কাছে বাংলা ভাষার দাবির কথা পৌছে দেয়া যেন তাঁরা অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করেন।

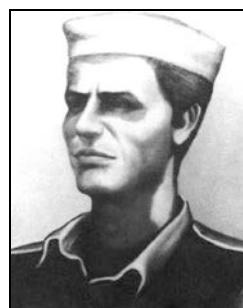
ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে জমায়েত হতে থাকে। বেলা সোয়া তিনটার দিকে এম.এল.এ. এবং মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকেন। তখন ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিতে থাকলে পুলিশ বাহিনী এসে তাদের তাড়া করে এবং ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। একদিকে ইট পাটকেল, আর অন্য দিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠি চার্জ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই আবুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। ১৭ জনের মত গুরুতর আহত হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটায় আবুল বরকত শহীদ হন। গুলি চালানোর সংবাদ দাবানলের মতো শহরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে বিভিন্ন অফিস থেকে কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে।



শহীদ সালাম



শহীদ রফিক



শহীদ জব্বার



শহীদ বরকত

২১ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে আহত কেউ কেউ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। যেমন সালাম মৃত্যুবরণ করেন ৭ এপ্রিল (১৯৫২)। আবার ২১ ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি যে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় সেই মিছিলে গুলিবদ্ধ হয়েও কেউ কেউ শহীদ হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় উক্ত দিন ও পরে কমপক্ষে ৬ জন যে শহীদ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সরকারি বিবরণী অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায়।

একুশে ফেব্রুয়ারির পরের ঘটনাবলি

২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাড়ের প্রতিবাদ স্বরূপ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে ২ জন মৃত্যুবরণ করে। ২১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারির চারদিন ‘ঢাকা বেতার কেন্দ্রে’ পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। এই কয়দিন কেবল সংবাদ বুলেটিন ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি। একুশের ঘটনার প্রতিবাদে দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেন (২৩ ফেব্রুয়ারি)। ড. সাঈদ হায়দার নকশার পরিকল্পনা করেন। শহীদ শফিউরের পিতা ২৪ তারিখে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ সেই মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে।

একুশে ফেব্রুয়ারির পর সরকার জেল-জুলুমের নীতি অবলম্বন করে। চারজন গণপরিষদ সদস্যকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককেও (যেমন প্রষ্ঠের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. বি.সি. চক্রবর্তী, অজিত কুমার গুহ প্রমুখ) গ্রেপ্তার করে।



জাতীয় শহীদ মিনার

সারাদেশে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেক নেতা ঘেঁষার হন। জেল-জুলুমের ভয়ে অনেক রাজনৈতিক নেতা আতঙ্গোপন করেন। ফলে ভাষা আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে। তবে ১৯৫২ সালের পর প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে অনুমোদন করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

- ১। **রাজনৈতিক প্রভাব:** ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। অনেক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধিকারের চিন্তাচেতনা শুরু হয়। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে ভাষা আন্দোলন প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন একধরনের প্রাদেশিকতাবাদের জন্ম দেয়। এরপর যখনই পূর্ববাংলার স্বার্থসংগঠিষ্ঠ কোনো দাবি উচ্চারণ করা হয়েছে তখনই পূর্ববাংলাবাসীর সমর্থন অর্জন করেছে।
- ২। **বিভিন্ন দাবিদাওয়ার উন্মোচন:** ভাষা আন্দোলনের সময় কেন্দ্রীয় গণপরিষদে পূর্ববাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসনসংখ্যা দাবি করা হয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন দাবি করা হয়। কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদেরকে অধিকসংখ্যক নিয়োগ দেয়ার দাবি করা হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়।
- ৩। **বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি ও মুসলিম লীগের পতনের সূচনা:** বাংলা ভাষার প্রশংসনে মুসলিম লীগের বৈরী মনোভাবের কারণে এই দল থেকে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতৃতি নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই দলের চরম পরাজয় ঘটে।
- ৪। **ছাত্রসমাজের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠান:** ভাষা আন্দোলন ছাত্রসমাজকে প্রাচল্য রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের মাত্র দুইমাসের মধ্যেই (এপ্রিল, ১৯৫২) ‘পূর্ববাংলায় ‘ছাত্র ইউনিয়ন’ নামে ছাত্র সংগঠন জন্মালাভ করে। পরবর্তীকালের আন্দোলনসমূহে ছাত্রসমাজই ছিল মূল শক্তি।
- ৫। **বাঙালির ঐক্যসৃষ্টি:** ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রত্বৃতি সকল পেশার লোকদের মধ্যে গ্রংকের এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখি।
- ৬। **অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা:** ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা হয়। ভাষা আন্দোলনের সময় পার্লামেন্টের মধ্যে কংগ্রেস দলীয় হিন্দু নেতৃত্বে ভাষার দাবিতে কথা বলেছেন, আর রাজপথে অকংগ্রেসয়ীরা ধর্মীয় ভাঁওতাবাজির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। ফলে পূর্ববাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটির নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ করা হয়। ফলে এ ভূখণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত হয়।

- ৭। **বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা:** ভাষা আন্দোলনের ফলে ১৯৫৫-তে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে) ও বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত (বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে) হয়।
- ৮। **নারী জাগরণের সূচনা:** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ছাত্রীদের বোরখা পরার অভ্যাস কমে যায়। পরবর্তী সভা সমিতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের ধারা সৃষ্টি হয়। রাজনীতিতেও মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে।
- ৯। **ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা:** ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অনুপ্রেরণা। ভাষা আন্দোলন থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্নেষ্ট ঘটে।
- ১০। **একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ:** ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই স্বীকৃতি ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা বেড়েছে।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <ul style="list-style-type: none"> ● শিক্ষার্থীগণ “ভাষা আন্দোলন” শীর্ষক নিবন্ধ লিখে টিউটর মহোদয়কে দেখাবেন। ● শিক্ষার্থীরা, “ভাষা আন্দোলন ও এর প্রভাব” বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করবেন। ● একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করতে পারবেন। |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

- ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আলোচনার সূত্রপাত হয়।
- পাকিস্তান সরকার বাংলাভাষাকে উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ ভাষা আন্দোলন শুরু হয়।
- পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিল্লাহ পূর্ব বাংলা সফরের সময় ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে সরকারি ভাষা করার ঘোষণা দিলে তার প্রতিবাদ করা হয়।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে আন্দোলন করতে যেয়ে ৬ জন শহীদ হন।
- ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতিয়তাবাদের উন্নেষ্ট ঘটে। পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে ভাষা আন্দোলন অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।
- বাংলা ভাষার প্রতি হটকারী সিদ্ধান্তের ফলে মুসলিম লীগের পতন ঘটে।
- রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ছাত্র সমাজের উত্থান ঘটে।
- অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও নারী জাগরণের সূচনা ঘটে।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দিন

- ১। নিচের কোনটি পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যবর্তী দূরত্ব-

| | |
|-------------------|-------------------|
| ক) ১৩০০ কিলোমিটার | খ) ১৫০০ কিলোমিটার |
| গ) ১৫০০ কিলোমিটার | ঘ) ১৬০০ কিলোমিটার |
- ২। ১৯৪৭ সালে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অংশের মধ্যে পার্থক্য ছিল-

| | |
|-----------------|------------|
| i) ধর্মীয় | ii) ভাষাগত |
| iii) সাংস্কৃতিক | |

 নিচের কোনটি সঠিক?

| | |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
- ৩। কত সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপন্নি হয়?

| | |
|---|---|
| ক) ১৪ আগস্ট পাকিস্তান, ১৫ আগস্ট ভারত ১৯৪৭ | খ) ১৪ আগস্ট ভারত, ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ১৯৪৭ |
| গ) ১৩ আগস্ট পাকিস্তান ১৪ আগস্ট ভারত ১৯৪৭ | ঘ) ১৫ আগস্ট ভারত ১৬ আগস্ট পাকিস্তান ১৯৪৭ |

৪। পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)

- ক) আবুল হাশিম
গ) মোহাম্মদ আলী জিনাহ
অভিযন্তা তথ্যভিত্তিক

খ) মাওলানা আকরাম খান
ঘ) খাজা নাজিমউদ্দিন

নীচের উদ্দিপক্তি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।



৫। অনুচ্ছেদে/চিত্রে কোনটি পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনার সাল নির্দেশ করে—

৬। ১৯৪৭ সাল গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য যুক্তিযুক্তি কারণ-

- ক) ভারত বিভক্ত হয়
গ) বাংলার অখণ্ডতা রক্ষা পায়

খ) পাকিস্তান বিভক্ত হয়
ঘ) সংবিধান প্রণয়ন করা হয়

ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ନ ଏବଂ ୧ ଓ ୨ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିନ—

ঝর্ণা বহিমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল গান শুনছিল। একজন শ্রোতা হিন্দি গান গাওয়ার অনুরোধ জানালে ঝর্ণা তার প্রতিবাদ করে বলে এ অনুষ্ঠানে বাংলা ছাড়া অন্য গান পরিবেশিত হবে না।

৭। বাণীর কর্মকালে পাঠ্য বইয়ের কোন আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে (প্রয়োগমূলক)

- ক) অসহযোগ
গ) ভাষা

খ) খিলাফত
ঘ) ছয় দফা

৮। ঝর্ণার মনোভাবে ফুটে উঠেছে-

- i) ভাষার প্রতি মমত্ববোধ ii) দেশাত্মকবোধ iii) বিদেশী সংস্কৃতিবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

৯। পর্ববাংলা আইন পরিষদের সভা কোথায় অনষ্টিত হতো-

- ক) ঢাকা মেডিকেলের হোস্টেলে
গ) সৎসন্দ ভবনে

খ) জগন্নাথ হলের অডিটরিয়ামে
ঘ) কার্জন হলে

১০ | ১১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কখন?

- କ) ୧୯୯୬ ଥିଲା
ଘ) ୧୯୯୭ ଥିଲା
ଗ) ୧୯୯୮ ଥିଲା
ଘ) ୧୯୯୯ ଥିଲା

সজনশীল প্রশ্ন

জনপ্রিয় সংঘ সভাপতি হরমুজ সাহেবের অবস্থান সর্বদাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিপক্ষে। তার মতে যে ছাত্ররা আন্দোলন করে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, তারাই আবার ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগে পড়বে।

ক উর্দ্ব এবং শুধু উদ্দিষ্ট হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-ক্ষেত্রায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়?

খ “ত্যাদুন মজলিশ” গঠিত হয় কেন?

গুরুমজ সাহেবের বক্তব্যে যে আন্দেলনের প্রতিষ্ঠিতি প্রকাশ পেয়েছে পাঠ্য বইয়ের আলোকে তাৰ পটভূমি ব্যাখ্যা কৰুণ।

ঘ উক্ত আন্দোলনটি জন দেয় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন- আপনার উন্নতির স্বপক্ষে মতামত প্রকাশ করুণ।

পাঠ-১৩.২ | যুক্তফন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যুক্তফন্ট গঠনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- যুক্তফন্ট ঘোষিত ২১ দফা দাবির বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ, নির্বাচন পদ্ধতি, যুক্তফন্ট গঠন, আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইছলামী, গণতান্ত্রী দল, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন।



ভূমিকা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নাম ছিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ। অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। সেই নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে যাদের নির্বাচনী এলাকা নবগঠিত পূর্ববাংলা প্রদেশের মধ্যে ছিল তারা ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২ সালে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক পরিষদের একটি উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ায় পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো নির্বাচন মোকাবিলা করতে ভয় পান। ফলে সরকার কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আইন পাশের মাধ্যমে নির্বাচন পেছানোর কৌশল অবলম্বন করে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পটভূমি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলে প্রদেশের শাসন বিভাগ ও আইনসভা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। কিন্তু স্বাধীন পাকিস্তানে শুরু থেকেই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয় এবং প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়। প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করতেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের গঠন, দায়িত্ব বণ্টন ও কার্যকাল বিষয়েও গভর্নরের উপর গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এমনকি প্রদেশের কোনো অংশে শাস্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে গভর্নর জেনারেল সেই প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারি করতে পারতেন। প্রদেশের আমলারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা প্রাদেশিক সরকারের আদেশ নিয়ে মানতেন না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আমলা গোষ্ঠীতে পূর্ববাংলার কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা সচিবালয়ে কোনো বাঙালি সচিব ছিলেন না। অবাঙালি সচিবগণ পূর্ববাংলার স্বার্থ দেখতেন না। দেশের সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র দপ্তর ও কূটনৈতিক অফিসগুলোতেও পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ১৯৫৬ সালে দেশের সেনাবাহিনীতে মেজর থেকে জেনারেল পর্যন্ত মোট ৬০০ জন অফিসারের মধ্যে মাত্র ১০ জন ছিলেন বাঙালি। অর্থনৈতিক দিকেও প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পর আয়কর পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যায়। বিক্রয় কর, যা ব্রিটিশ আমলে প্রদেশের হাতে ছিল তা ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। ১৯৪৭-১৯৫৪ সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে পূর্ববাংলায় ব্যয় করেছে ৪২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা, একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। বিদেশি সাহায্যের তেরভাগের একভাগ মাত্র পূর্ববাংলায় দেয়া হয়। এভাবে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

এসব বৈষম্য এবং বাংলা ভাষার আদোলন পূর্ববাংলার মানুষের মনে মুসলিম লীগ ও সরকারের প্রতি ক্ষেত্র ও অসম্ভবির সৃষ্টি করে। পূর্ববাংলায় অধিক স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি জোরদার হয়।

এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে উল্লিখিত প্রাদেশিক নির্বাচন পদ্ধতি ১৯৫২ সালে সংশোধন করে যে বিধি করা হয় তা নিম্নরূপ:

ক. নির্বাচন হবে ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে।

খ. অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে।

গ. পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা হবে ৩০৯টি (১২টি মহিলা আসনসহ)। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বণ্টন করা হবে নিম্নরূপভাবে:

| | |
|--|-------------------------|
| ১) মুসলমান আসন | ২৩৭টি (৯টি মহিলা আসনসহ) |
| ২) সাধারণ বর্ণ হিন্দু | ৩১টি (১টি মহিলা আসনসহ) |
| ৩) তফশিলি জাতি হিন্দু | ৩৮টি (২টি মহিলা আসনসহ) |
| ৪) বৌদ্ধ | ২টি |
| ৫) খ্রিস্টান | ১টি |
| <hr/> সর্বমোট ৩০৯টি (১২টি মহিলা আসনসহ) | |

ঘ. মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অন্য আসনেও মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। মহিলাদের জন্য যে ১২টি আসন সংরক্ষিত ছিল সে আসনসমূহের নির্বাচনে কেবল মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মহিলাদেরই ভোটদানের অধিকার ছিল।

ভোটার সংখ্যা, নির্বাচনী তফশিল ও অন্যান্য তথ্য

১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টকে ভিত্তি করে আসন বণ্টন করা হয়। আনুমানিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল তারা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩। ১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরু হয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ১৪ জানুয়ারি ১৯৫৪। মনোনয়নপত্র বাছাই ১৬, ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি (১৯৫৪) এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২১ জানুয়ারি (১৯৫৪)।

ছাপানো কিংবা টাইপ করা কিংবা হাতে লেখা ফরমে মনোনয়ন জমা দেওয়ার নিয়ম করা হয়। তফশিলি নির্বাচনী এলাকা ছাড়া প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণকে ২৫০ টাকা জামানত দাখিল করতে হত। তফশিলি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণের জামানত ছিল ১০০ টাকা।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ব্যালট বাস্তে ব্যবহারের জন্য সরকার চূড়ান্তরপে মোট ২৪টি প্রতীক নির্দিষ্ট করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ‘হারিকেন’ প্রতীক এবং যুক্তফুন্ট ‘নৌকা’ প্রতীক গ্রহণ করে। ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারকে পাঁচ মাইলের বেশি হাঁটতে না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে বুথ প্রতিষ্ঠা করা হয়। গেজেটেড অফিসার, কলেজের প্রফেসর, হাই স্কুল ও হাইমাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার নিয়ুক্ত করা হয়। কোনো ভোটার যাতে একবারের বেশি ভোট দিতে না পারে সেজন্য ভোটদান কালে তার আঙুলে অমোচনীয় (যা সহজে ওঠেনা) কালির ছাপ দেওয়ার বিধান করা হয়।

ভোটগ্রহণ ৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত ৫ দিনে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাচন কমিশনার ছিলেন মো. আজফার।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জেটি

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুসলিম লীগ, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল, খেলাফতে রক্বানী পার্টি প্রভৃতি। অমুসলমান আসনে অংশগ্রহণ করে : পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফশিলি ফেডারেশন, গণসমিতি, অভয় আশ্রম (কুমিল্লা), পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি।

কমিউনিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যগণ মুসলমান আসনে এবং হিন্দু সদস্যগণ হিন্দু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মুসলমান আসনে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলামী ‘যুক্তফ্রন্ট’ গঠন করে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। হিন্দু আসনে গণসমিতি, অভয় আশ্রম ও পূর্ব পাকিস্তান সমাজতাত্ত্বিক দল ‘সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট’ গঠন করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী মিলে ‘যুক্তফ্রন্ট’ নামক একটি নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুবলীগের উদ্যোগে মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। তখন ‘গণতাত্ত্বিক দল’ ও ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ ঐ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নির্বাচনের প্রাক্তালে মুসলিম লীগ বিরোধী জেটি গঠন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জারির সংগে সংগে এ.কে. ফজলুল হক নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর নিজস্ব কৃষক প্রজা পার্টিকে পুনরাজীবিত করেন এবং নামকরণ করেন কৃষক শ্রমিক পার্টি। ১৯৫৩ সালে ২৬ নভেম্বর পূর্বপাক জামিয়তে ওলামায়ে ইছলাম নামক ধর্মীয় সংগঠনটিকে রাজনৈতিক দলে পরিণত করে এর নামকরণ করা হয় ‘নেজামে ইছলামী’।

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইছলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোগো ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও যুবলীগ, কিন্তু ফ্রন্টের কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইছলামীর নেতৃত্বন্দের বিরোধিতায় এই দলগুলোকে ফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি। তবে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যগণ আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে নমিনেশন লাভ করেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, ১৫ জন যুবলীগ সদস্য, ১০ জন গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং ১০ জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী লীগের পরিচয়ে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে সমর্থ হন। অনেক বামপন্থী নেতা স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রূতি

নির্বাচনের প্রাক্তালে বিভিন্ন দল ও জেটি নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রূতি ঘোষণা করেছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রেরণাক্ষণ্ডি ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। তাই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ২১ ফিগারাটিকে চিরস্মরণীয় করার জন্য ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। আবুল মনসুর আহমেদ ২১ দফার খসড়া প্রণয়ন করেন। ২১ দফার দাবিগুলো ভোটারদের মন জয় করে।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচনে মুসলমান আসনে ৩৭.৬০% ভোট পড়ে। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থা, মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে আসতে অনীহা প্রভৃতি কারণে ভোটদানের হার কম ছিল। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হয় ২ এপ্রিল।

নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২১৫টি, মুসলিম লীগ ৯টি, খেলাফতে রক্বানী পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র ১২টি আসন। মুসলমান আসনে স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে ৮ জন যুক্তফ্রন্টে ও ১ জন মুসলিম লীগে ঘোগদান করেন। যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলোর মধ্যে আসনসংখ্যা নিম্নরূপ হয়: আওয়ামী লীগ ১৪২, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৮, নেজামে ইসলামী ১৯, গণতন্ত্রী দল ১৩ (১টি আসনে দলীয় পরিচয় অস্পষ্ট)। ৭২টি অমুসলমান আসনের ২৪টিতে জাতীয় কংগ্রেস, ২৭টিতে তফশিলি ফেডারেশন (রসরাজ মন্ডল গ্রুপ), সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩টি (এর মধ্যে গণতন্ত্রী দল ৩টি)। কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি, বৌদ্ধ ২টি, খ্রিস্টান ১টি এবং স্বতন্ত্র ১টি আসনে জয়লাভ করে।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

১. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট শাসনক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর দলের নেতৃত্বে নিজেদের ভাগ্যগড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা জনগণের সাথে যোগাযোগ ছিল করেন, ফলে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের অনেক জনপ্রিয় নেতা ও সদস্য বিভিন্ন কারণে দলত্যাগ করেন এবং নতুন দল (আওয়ামী মুসলিম লীগ) গঠন করেন। ফলে মুসলিম লীগ সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।
২. বাংলা ভাষার দাবির প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন নীতি বাংলার আপামর জনসাধারণকে বিক্ষুর্খ করে তোলে।
৩. পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক নীতি, সমদর্শিতার অভাব, অবিচার ও শোষণ নীতির প্রভাব নির্বাচনে পড়ে।
৪. দীর্ঘ ৭ বৎসর সহিত প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীর নিকট দলের গ্রাহণযোগ্যতা কমে যায়।
৫. লবণ, কেরোসিন ও সরিষার তেল প্রত্বতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহবধূরাও মুসলিম লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যধিক। পূর্ববাংলায় এটি ছিল প্রাণবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও শাস্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকার দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। পূর্ববাংলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা করেননি। এই নির্বাচনে জনগণ স্বতঃসূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সন্দেহহার করেছে। নির্বাচনে যুক্তফন্টের ২১ দফার দাবির সমক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে উক্ত দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে পাকিস্তানে কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ববাংলায় সেই যে মুসলিম লীগের পতন ঘটলো, এরপর আর কখনো এখানে মুসলিম লীগ দল শক্তিশালী হতে পারেনি।

যুক্তফন্ট সরকারের শাসনামল (১৯৫৪-৫৮)

যুক্তফন্ট গঠনের সময় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে এ. কে. ফজলুল হক যুক্তফন্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের নেতা নির্বাচিত হবেন। সে অনুযায়ী তিনি পূর্ববাংলায় সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পান। কিন্তু শুরুতেই মন্ত্রীপরিষদ গঠন নিয়ে মনোমালিন্য শুরু হয়। ফজলুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগ মনোনীত সদস্যদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। তাই তিনি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে ৩ এপ্রিল (১৯৫৪) মন্ত্রিসভা গঠন করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় কেন্দ্রীয় সরকার সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফন্টের ভাবে চেয়েছে। মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগে মনোমালিন্য, ৩০ এপ্রিল কোলকাতায় ফজলুল হক প্রদত্ত ভাষণের অপব্যাখ্যা, পূর্ববাংলার বিভিন্ন শিল্প কলকারখানার বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্দা প্রত্বতি ফজলুল হককে বেকায়দার ফেলে। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে আপোষ করে এই দলের কিছু সদস্যকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন (১৫ মে, ১৯৫৪)। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ এর সংবাদদাতা জন পি. কালাহান এ.কে. ফজলুল হকের সাক্ষাতকার বিকৃত করে প্রকাশ করেন। উক্ত সাক্ষাতকারে ফজলুল হক পূর্ববাংলার অধিক স্বায়ত্ত্বশাসন পাওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু কালাহান লেখেন যে, ফজলুল হক পূর্ববাংলার স্বাধীনতা চান। কেন্দ্রীয় সরকার কালাহানের রিপোর্টের ভিত্তিতে ফজলুল হককে দেশদ্বৰাহী হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাঁর মন্ত্রিসভা বাতিল করে (২৯ মে, ১৯৫৪) প্রদেশের ওপর গভর্নরের শাসন জারি করে। পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন চলে ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। ১৭ মে থেকে ২৫ অক্টোবর (১৯৫৪) পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন ইক্সান্দার মীর্জা। তিনি পূর্ব বাংলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। গভর্নরের শাসনের প্রথম সম্ভাবন মধ্যেই ১ জন যুক্তফন্ট মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, ১৩ জন নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও ৬৫৯ জন যুক্তফন্ট কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ফজলুল হককে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অনেক বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু যে ফজলুল হককে দেশদ্বৰাহী আখ্যা দেয়া হয়েছিল তাকেই পদচ্যুত করার ২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আঁতাত করেন এবং যুক্তফন্টে আওয়ামী মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর দলের আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে যুক্তফন্ট ভেঙে যায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৫ সালে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দলটিকে

অসাম্প্রদায়িক করে। আতাউর রহমান খানকে আওয়ামী লীগের পার্টিমেন্টারি বোর্ডের নেতা নির্বাচিত করা হয়। এরপর শুরু হয় পূর্ববাংলায় সরকার বদলের পালা। কখনো আরু হোসেন সরকারের কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার, কখনো আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার। এক পর্যায়ে কেন্দ্রে এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার অংশীদার হয়। কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে ১৮ অক্টোবর ১৯৫৭) এবং প্রদেশে আতাউর রহমান খান সরকার গঠন করেন (৬.৯.৫৬ থেকে ৩১.৩.৫৮)। একই সংগে কেন্দ্রে এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার অংশীদার হওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকার পূর্ববাংলায় অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে পূর্ববাংলার উন্নয়ন

পূর্ববাংলার ২ বৎসরের শাসনামলে আওয়ামী লীগ সরকার ফেন্সুগঞ্জে গ্যাস কারখানা স্থাপন করে; সাভারে ডেয়ারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে; ঢাকা আরিচা, নগরবাড়ি-রাজশাহী এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ করে; ঢাকা শহরে রমনা পার্ক গড়ে তোলে। বন্য নিয়ন্ত্রণ ও সোচ সুবিধার জন্য ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ওয়াপদা) প্রতিষ্ঠা করে; ঢাকায় প্রথম চলচিত্র স্টুডিও এফ.ডি.সি. (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা করে। সরকার ভাষা শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। বাংলা একাডেমি বাংলায় পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের স্বল্পকালীন শাসনামলে আরো যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: প্লানিং বোর্ড গঠন, তিন বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৫৭-৬০) প্রণয়ন, শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ভবন নির্মাণের জন্য প্রথমবারের মতো চালুশ লক্ষ টাকা আনুমোদন, ময়মনসিংহে পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন, কৃষিখণ সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, বন উন্নয়ন, স্থায়ী শিল্প ট্রাইবুনাল গঠন, ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য ঢাকা ইমপ্রভুমেন্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা এবং প্রেটার ঢাকা সিটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন ইত্যাদি।

আইন পরিষদের কলঙ্কজনক ঘটনা

১৯৫৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। এই সময়ে আইন পরিষদও কার্যকর হয়নি। আইন পরিষদের স্পিকার (জনাব আবদুল হাকিম) ছিলেন কৃষক শ্রমিক পার্টির এবং ডেপুটি স্পিকার (জনাব শাহেদ আলী) ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে কখনো কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার আবার কখনো আওয়ামী লীগের সরকার দেশ পরিচালনা করে। ১৯৫৮ সালে আওয়ামী লীগ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, স্পিকার আবদুল হাকিম নিরপেক্ষ নন। এরই প্রেক্ষিতে ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত মানেনি। ২৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী স্পিকারের চেয়ারে বসামাত্র কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তাঁর সমর্থক দলের সদস্যবৃন্দ তাঁকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন বস্তু নিষ্কেপ করতে থাকে। ফলে তিনি মুখে আঘাত পান। আহত অবস্থায় শাহেদ আলীকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) বেলা ১:২০ মিনিটে ইন্টেকাল করেন।

এই ঘটনার পর ৭ অক্টোবর (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামারিক আইন জারি করা হলে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অবসান ঘটে।

| | |
|--|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <ul style="list-style-type: none"> শিক্ষার্থীগণ যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা বিশ্লেষণ করে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন। ১৯৫৮ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ নির্বাচনের পদ্ধতি ও নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনার জন্য একটি পাঠচক্র আয়োজন করা যেতে পারে। |
|--|---|

সারসংক্ষেপ

- পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে।
- নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী দলগুলির সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।
- যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করে।
- নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পরাজয় ঘটে।

- নির্বাচনের পর যুক্তফন্ট ভেঙ্গে যায়। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তখন প্রদেশে অনেক উন্নয়ন ঘটে।

H পাঠ্যনির্ণয়-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্র জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণের পিছনে কোনটি কাজ করেছে-

| | |
|--|-----------------------------|
| ক) আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রচারণা | খ) তমাদুন মজলিশের কর্মকাণ্ড |
| গ) নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ চেতনা | ঘ) মুসলিম লীগের দমন নীতি |
- ২। ১৯৫৪ সালে কতটি আসনে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হয়েছিল-

| | |
|--------|--------|
| ক) ২৩৭ | খ) ২৯৭ |
| গ) ৩০৯ | ঘ) ৩১০ |
- ৩। ১৯৫৪ সালে যুক্তফন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল কেন? (অনুধাবন)

| | |
|--|--|
| ক) জনগণকে আশ্বাস দেয়ার জন্য | খ) সরকার বিরোধি প্রচারনায় ২১ সহায়ক ছিল বলে |
| গ) একুশে ফেব্রুয়ারিকে চির অস্ত্রান্বান রাখার জন্য | ঘ) একুশে সংখ্যাটি মঙ্গলজনক ছিল বলে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫, ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার সমর্মনা দলগুলো নিয়ে মহাজোট গঠন করে। নির্বাচনে মহাজোট জয়লাভ করে।
- ৪। উদ্দীপকের মহাজোট পাঠ্য বইয়ের পঞ্চাশের দশকে কোন জোট গঠনের সাথে মিলে যায়

| | |
|---------------------------|---------------------|
| ক) আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন | খ) গণতন্ত্রী দল গঠন |
| গ) যুক্তফন্ট গঠন | ঘ) মুসলিম লীগ গঠন |
- ৫। উক্ত জোট গঠনের পর নির্বাচনের ফলাফল কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)

| | |
|------------------------|--------------------------|
| ক) যুবলীগের জয়লাভ | খ) যুক্ত ফন্টের জয়লাভ |
| গ) মুসলিম লীগের জয়লাভ | ঘ) গণতন্ত্রী দলের জয়লাভ |
- ৬। লিরা লিজাকে যুক্তফন্ট গঠন সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন। যুক্তফন্টে যে দলগুলো অংশগ্রহণ করেছিল-
 - আওয়ামী মুসলিম লীগ ও গণতন্ত্রীদল
 - কৃষক শ্রমিক পার্টি
 - নেজামে ইসলামী

নিচের কোনটি সঠিক?

| | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল

নবম শ্রেণির ছাত্র আনন্দ দাদার কাছে শুনেছে শুধু আঞ্চলিক কারণে একটি দেশের শাসক দলের ত্যাগী নেতারা উপেক্ষিত হয়। তারা দেশটির জন্মগ্নে রেখেছিল প্রভূত অবদান। শাসকদলের এরূপ অগণতান্ত্রিক কাজ তাদের দলটিকে জন বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল।

- ক. যুক্তফন্ট মূলত কয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত?
 খ. যুক্তফন্ট গঠন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় – ব্যাখ্যা করুন।
 গ. উদ্দীপকে দলটির কর্মকাণ্ড পাঠ্য বইয়ের পাকিস্তানের যে দলের কর্মকাণ্ডে সাথে সামঝস্যপূর্ণ সে দলের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করুন।
 ঘ. উক্ত দলটির নেতাদের আচরণে সৃষ্টি হয়েছিল “আওয়ামী মুসলিম লীগ” – মতামত দিন।

পাঠ-১৩.৩] সামরিক শাসন ও আইয়ুবীয় স্বেরাচার



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির প্রেক্ষাপট বলতে পারবেন;
- সামরিক সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচির বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইয়ুব বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের ইতিহাস মূল্যায়ন করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

আইয়ুব খান, সামরিক শাসন, এবড়ো, রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী, ছায়ানট, মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ (১৯৬১), মৌলিক গণতন্ত্র, সংবিধান, শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা আন্দোলন, সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)।



ভূমিকা

আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অবিস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম সাড়ে তিন বছর (২৭.১০.১৯৫৮ থেকে ৮.৬.১৯৬২) সামরিক এবং পরবর্তী ৭ বছর বেসামরিক শাসক হিসেবে পাকিস্তান শাসন করেন। তিনি স্বেরাচারী শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা ভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তা স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আমরা এ অধ্যায়ে আইয়ুবের সামরিক শাসন আমল পর্যালোচনা করব।

আইয়ুবের সামরিক শাসন ১৯৫৮-১৯৬২

সামরিক শাসনের অর্থ হলো, বেসামরিক কর্তৃত্ব বিলোপ। সামরিক শাসন জারি হলে সামরিক বাহিনীর অধীনে সবাইকে কাজ করতে হয়। সামরিক শাসনের অধীনে সংবিধান কখনও বাতিল করা হয়, কখনো বা স্থগিত রাখা হয়। সামরিক শাসন হলো প্রচলিত আইন-বিরোধী, দায়-দায়িত্বহীন ও উৎপীড়নমূলক।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০:৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খান নুনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। ৭ অক্টোবরের ফরমান বলে ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশীক সরকারসমূহকে বরখাস্ত করেন, জাতীয় ও প্রাদেশীক পরিষদসমূহ ভেঙে দেন, রাজনৈতিক দলসমূহ বিলুপ্ত করেন, মৌলিক অধিকার কেড়ে নেন। এরপর নিজেই আইয়ুব খান কর্তৃক উৎখাত হয়ে ২৭.১০.৫৮ তারিখে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।



আইয়ুব খান

আইয়ুব খান ২৮ অক্টোবর এক ফরমান জারি করে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বার গ্রহণ করেন।

আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের পক্ষে যুক্তি প্রদান

আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, দেশের রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, ব্যাপক চোরাচালান, মজুদারি, মুনাফাখোরি ইত্যাদির ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যই সামরিক বাহিনিকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হয়েছে।

ক্ষমতাগ্রহণের পর গৃহীত নির্বর্তনমূলক ব্যবস্থাসমূহ

১. ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, পার্লামেন্টারি প্রেস সেক্রেটারি এবং প্রায় ৬০০ জন সাবেক জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়।
২. আটক দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর ‘নির্বাচিত সংস্থাসমূহ অযোগ্যতা আদেশ ১৯৫৯’ (Elective Bodies Disqualification Order 1959) সংক্ষেপে EBDO (এবডো) এবং ‘সরকারি পদ লাভের অযোগ্যতা আদেশ’, সংক্ষেপে PODO নামক দুটি আদেশ জারি করেন। বিধান করা হয় যে, EBDO বা PODO [Public Office Disqualification Order] এর আওতায় গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ট্রাইবুনালে কেউ অভিযুক্ত হলে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে দেশের যে কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন। অভিযুক্তরা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হতেন। সামরিক সরকার EBDO এর আওতায় ৮৭ জন বিশিষ্ট নাগরিককে অভিযুক্ত করেন। PODO এর আওতায় পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১৩ জন, ফরেন সার্ভিসের ৩ জন, পুলিশ সার্ভিসের ১৫ জন ও প্রাদেশিক সার্ভিসের মোট ১৬২ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়।
৩. বাংলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পালন করার দায়ে আইয়ুব খান ইন্ডেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা তিনটিকে কালো তালিকাভুক্ত করেন এবং সেগুলিকে সরকারি ও আধাসরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বর্ষিত করেন।
৪. আইয়ুব খান বাংলা ভাষার প্রতি বিরুপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেন (১৯৫৯)। বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে ‘বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি’ গঠিত হয়। কিন্তু বাংলি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচল বিরোধিতায় আইয়ুবের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।
৫. আইয়ুব খান ও তাঁর অনুসারীরা বাংলা ভাষাকে পরিবর্তন করে ‘মুসলমানিত্ব’ প্রদান করার উদ্দেশ্যে নজর়লের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামরিক সরকার কে.জি. মোস্তফা, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করে। কিন্তু সংস্কৃতিকর্মীদের আটকিয়ে রাখা যায়নি। বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ এবং অধ্যাপক খান সরওয়ার মোর্শেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘রবীন্দ্র জনশুভেষণিকী’ কমিটি। এই কমিটি ছয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে ছায়ানটের ব্যবস্থাপনায় রমনার বটমূলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সানজিদা খাতুন গঠন করেন ‘ছায়ানট’। মফস্বল শহরেও রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপিত হয়। আইয়ুব খান চেয়েছিলেন রাজনীতিবিদরা যেন ক্ষমতায় আসতে না পারেন, সংবাদপত্র যাতে সরকার বিরোধী খবরাখবর না দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা বাংলি সংস্কৃতি যাতে বিকশিত না হয় সেজন্য তিনি নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সামরিক সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি

১. চোরাকারবারি ও মজুতদারি বিরোধী অভিযান

সামরিক শাসন জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান কিছু চমকপ্রদ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যেমন চোরাকারবারি ও মজুতদারি নিষিদ্ধ করা হয়। চোরাকারবারির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং মজুতদারির সর্বোচ্চ সাজা ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ধার্য করা হয়। আয়কর প্রদানের ব্যাপারে কড়া নির্দেশ জারি করা হয়। সীমান্ত পাহারায় কড়াকড়ি করা হয়। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ভাল ফল পাওয়া যায়।

২. ভূমি সংস্কার

আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সাত সদস্য বিশিষ্ট ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সকল সদস্যই ছিলেন সিভিল সার্ভিসের। সে সময় রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় কোনো রাজনীতিবিদ কমিশনের সামনে ঘটামত দিতে পারেননি। তবে সংবাদপত্রে ভূমি সংস্কারের পক্ষে সম্পাদকীয় লেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সমাজ ব্যাপক ভূমি-সংস্কারের পক্ষে মত দেন। সামরিক সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ সিলিং সোচকৃত জমির জন্য ৫০০ একর এবং অস্বেচকৃত জমির জন্য ১০০০ একর ধার্য করেন। এই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ২২ লক্ষ একর জমি দখল করা হয় এবং তা দেড় লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

৩. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১

আইয়ুব খান ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আইনে উন্নৱাধিকার, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, বহুবিবাহ, তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ, দেনমোহর, স্তৰীয় ভরণপোষণ প্রভৃতি বিষয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উন্নৱাধিকার আইনে কারো দাদার পূর্বে পিতা মৃত্যু বরণ করলেও সে তার দাদার সম্পত্তির অংশ পাবে মর্মে বিধান করা হয়।

৪. মৌলিক গণতন্ত্র

‘মৌলিক গণতন্ত্র’ ব্যবস্থাটি আইয়ুব খানের অভিনব উদ্ভাবন। এটি ছিল চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন ব্যবস্থা। ১৯৫৯ সালে জারিকৃত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ইচ্ছেকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতন্ত্রিক বিকেন্দীকরণ-এর ব্যবস্থা করা। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসনের চারটি স্তর ছিল: (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন কমিটি (শহর এলাকায়), (২) থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে), (৩) জেলা কাউন্সিল এবং (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল।

ইউনিয়ন কাউন্সিল

এই ৪টি স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিল স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ১০ জন সদস্য নির্বাচিত হতেন। বারশ থেকে পনেরেশ ভোটদাতার প্রতিনিধি হিসেবে একজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। এভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ‘মৌলিক গণতন্ত্রী’ বা Basic Democracy Member বা সংক্ষেপে বিডি মেম্বার নামে অভিহিত হন। উভয় প্রদেশ থেকে ৪০,০০০ করে পাকিস্তানে মোট ৮০,০০০ বিডি মেম্বারের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এসব মেম্বারগণ ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের Electoral College বা ভোটারে পরিণত হন। এটিই হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থার অভিনব বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পিছনে আইয়ুব খানের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টি করা। এই ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীগণ আইয়ুব খানের সে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। এই ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, এমপি, এমএনএ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করায় রাজনীতিতে জনগণের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। ফলে এই ব্যবস্থা জনগণের কাছে অপ্রিয় ও অগ্রহণযোগ্য হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলের হাতে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পন করা হয়। গ্রাম পুলিশের সহায়তায় ইউনিয়নের শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ছেটখাট ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর অর্পিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য জনসাধারণের উপর বিভিন্ন ট্যাক্স আরোপ ও তা আদায়ের ক্ষমতা ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দেয়া হয়।

থানা, জেলা ও বিভাগীয় কাউন্সিল

থানা কাউন্সিল: থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও সমসংখ্যক থানা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে থানা কাউন্সিল গঠিত হয়। থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর কাজের সমন্বয় করাই ছিল থানা কাউন্সিলের কাজ। মহকুমা প্রশাসক কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার থানা কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করতেন।

জেলা কাউন্সিল: জেলা পর্যায়ের ২০ জন সরকারি কর্মকর্তা, ১০ জন বেসরকারি সদস্য ও জেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে ১০ জনসহ মোট ৪০ জন সদস্য সমন্বয়ে জেলা কাউন্সিল গঠিত হতো। ডেপুটি কমিশনার জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, বিজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রত্বিত ছিল জেলা কাউন্সিলের কাজ।

বিভাগীয় কাউন্সিল: বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলা কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধনই ছিল বিভাগীয় কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। বিভাগীয় কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। বিভাগের অন্তর্গত জেলা কাউন্সিলগুলির চেয়ারম্যান, বিভিন্ন উন্নয়ন দফতরের প্রতিনিধিবর্গ ও কিছু ইউপি চেয়ারম্যান সমন্বয়ে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হতো।

আইয়ুবের অধীনে বিভিন্ন নির্বাচন

‘মৌলিক গণতন্ত্রী আদেশ ১৯৫৯’-এর আওতায় সারাদেশে প্রথম মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১.০১.১৯৬০ তারিখে। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) গোপন ব্যালটে হ্যান্না ভোটের মাধ্যমে আইয়ুব খান ৫ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সংবিধান প্রণয়ন

১৯৫৬ সালে প্রণিত সংবিধান ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির সময় বাতিল করা হয়। আইয়ুব খান দেশ পরিচালনা করছিলেন সামরিক আইনের মাধ্যমে। পাকিস্তানে একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৭.০২.১৯৬০ তারিখে একটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিশন গঠন করেন। দেশে তখন সামরিক আইন চালু থাকায় জনগণের বাক-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। এতদসত্ত্বেও কমিশন প্রশংসনীয় পূরণের মাধ্যমে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাক্ষাতকার প্রদানকারীগণ ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন এবং সংবিধানে সংস্দীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি করেন। কমিশন ১৯৬১ সালের ৬ মে একটি রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপন করেন। কিন্তু রিপোর্টটি প্রেসিডেন্টের মনঃপূর্ত না হওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করেননি। এরপর প্রেসিডেন্ট ৩১.১০.৬১ তারিখে একটি নতুন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ‘জনগণ কী চায়’ তা প্রাধান্য না দিয়ে ‘প্রেসিডেন্ট কী চান’ - এই নীতির ভিত্তিতে সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ তা ‘অনুমোদন করেন এবং তা’ কার্যকরি করা হয় ১৯৬২ সালের ৮ জুন।

১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

- দীর্ঘ এবং লিখিত দলিল:** ১৯৬২ সালের সংবিধান একটি দীর্ঘ এবং বিস্তারিত লিখিত দলিল।
- প্রস্তাবনা:** সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয় যে, সমগ্র বিশ্বের মালিক আল্লাহ। ইসলামে বর্ণিত সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রত্বিতি পাকিস্তানে অনুসরণ করা হবে।
- মৌলিক অধিকার:** ১৯৬২ সালের মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কেন্দ্রীয় উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ১৯৬৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে তাতে সীমিত মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান, পাকিস্তানের যে কোনো নাগরিক দেশের যে কোনো স্থানে সম্পত্তি অর্জন কিংবা বিক্রয় করতে পারবে।
- প্রেসিডেন্সিয়াল বা রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতি:** ১৯৬২ সালের সংবিধান দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করে। প্রেসিডেন্ট মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। ৩৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক মুসলমান ধর্মাবলম্বী এবং জাতীয় সংসদে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য হবে। এই সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে অতিমাত্রায় নির্বাচন ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। তিনি অর্ডিন্যাপ্লের মাধ্যমে জরুরি আইন ঘোষণা, জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা, স্থগিত রাখা কিংবা জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়ার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। জাতীয় সংসদে পাস করা বিলে তিনি ভেটো দিতে পারতেন। তিনি প্রদেশের গভর্নর ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়োগ করতেন। প্রেসিডেন্টের অনুমোদনক্রমে গভর্নর প্রদেশের মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত

করতেন। অন্যান্য সকল বড় বড় পদে, যেমন প্রধান সামরিক কর্মকর্তা, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদানের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ছিল।

জাতীয় সংসদের অধিবেশন না চলাকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট ছয় মাস মেয়াদের জন্য যেকোন অর্ডিন্যাঙ্গ জারি করতে পারতেন। পাকিস্তানের নিরাপত্তার স্বার্থে ও দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার্থে দেশের যেকোন নাগরিককে তিনি আটক রাখার হুকুম দিতে পারতেন।

৫. এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ: ১৯৬২ সালের সংবিধান এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করে। জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫৬ জন (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৭৫ জন করে। ৬টি মহিলা আসন সংরক্ষিত ছিল।) প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫০ এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫টি। মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কোনো ক্ষমতা ছিল না।
৬. যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশের সম্পর্ক: পাকিস্তানকে ফেডারেল রাষ্ট্র বানানোর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। প্রদেশের হাতে খুব কম বিষয়ই ছিল যার ওপর প্রদেশের নিরক্ষুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল। নিরাপত্তার নামে প্রদেশ সংক্রান্ত যে কোন আইন পাশের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। প্রদেশের গভর্নরের নিয়োগ ও মেয়াদকাল প্রেসিডেন্টের হাতে থাকায় গভর্নরগণ প্রেসিডেন্টের বশৎবদে পরিণত হন। সংবিধানটি বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করে।
৭. অন্যান্য: এই সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ছিল। সংবিধানে বাংলা ও উর্দু উভয়কেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়।

সামরিক শাসন ও আইয়ুবীয় স্বৈরাচার

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন কেন্দ্রে ও প্রদেশ দুটিতে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। তাঁর সামরিক শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীকরণ। তিনি নিজের হাতে সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক সরকারের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামরিক শাসনামলে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকে। দুর্নীতি দমনের নামে অনেক জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতার উপর উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্রকে নির্বাসন দেওয়া হয়। তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানেন। রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। নজরঞ্জের কবিতাকে ইসলামীকরণের নামে কবিতার অনেক শব্দ পরিবর্তন করা হয়।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে ৪৪ মাসে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। কোনোরূপ বক্তব্য বিবৃতিও উচ্চারিত হয়নি। আইয়ুব খান কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

- (ক) সোহরাওয়ার্দী প্রেফতারের প্রতিবাদ: ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে তার প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘট ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, ইতেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদ ও অনেক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এইভাবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সামরিক শাসন বিরোধী প্রকাশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।
- (খ) সংবিধান বিরোধী আন্দোলন: ১৯৬২ সালের ১ মার্চ সংবিধান ঘোষণা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষেপ, সমাবেশ এবং ক্লাশ বর্জন শুরু করে। সরকারও দমন পীড়ন নীতি অবলম্বন করে। বহুসংখ্যক ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। সরকার ২৮ এপ্রিল (১৯৬২) জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করার পর ৮ জুন (১৯৬২) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

(গ) শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন (সেপ্টেম্বর, ১৯৬২): আইয়ুব খান শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষা সচিব এস.এম.শরীফকে সভাপতি করে গঠিত এগার সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশন ‘শরিফ কমিশন’ নামে অভিহিত। কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট তার সুপারিশ পেশ করে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

- তিন বছরের বি.এ কোর্স পদ্ধতি চালু করা (এর আগে ছিল দু'বছরের বি.এ পাস কোর্স)।
- স্কুল-কলেজের সংখ্যা সীমিত রাখা।
- শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অভিভাবককে বহন করতে হবে।
- ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হবে।

কমিশনের এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়। ঢাকা কলেজে সর্বপ্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এই কলেজের ছাত্ররা ‘ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম’ নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই সংগঠনের নামে ঢাকা শহরের অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন পরিচালনা করে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেয়। তখন সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে করা হয় ‘ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম’। এক পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল আহ্বান করা হয়। হরতালের দিন ছাত্র জনতা মিলিতভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। মিছিলে গুলিবর্ষণ করা হলে বাবুল, বাসকন্টাঞ্চির গোলাম মোস্তফা ও গৃহত্বত্য ওয়াজিউল্লাহ নিহত হয়। আহত হয় প্রায় আড়াইশ জন। ২৩ সেপ্টেম্বর ১ জন ছাত্র নিহত হয়। ফলে আন্দোলন ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় রাজনৈতিক নেতৃত্বন্দি এই আন্দোলনে অংশ নেননি। ছাত্রদের আন্দোলনের ফলেই সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করে। এই আন্দোলনের তৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররাই প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

আইয়ুব খানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৬২ সালের ৮ জুন পাকিস্তানের জাতীয় সংবিধান কার্যকর করা হয়। ঐদিন সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়। এর ফলে রাজনীতিবিদগণ ও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ পায়। রাজনীতিবিদগণ প্রথমেই যে দাবিনামা উত্থাপন করে তা হলো সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া, দলীয় রাজনীতি শুরু করা ইত্যাদি।

সংবিধান কার্যকর হওয়ার সপ্তাহখানকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৬০ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য (৭৮ জনের মধ্যে) সরকারের নিকট দাবি করে যে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, বিচার বিভাগ কর্তৃক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈশম্য কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পার্লামেন্টের বাইরে নয় জন রাজনৈতিক নেতা এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে আইয়ুবের সংবিধানকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি করেন।

এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ৩০ জুন (১৯৬২) ‘রাজনৈতিক দল আইন’ শীর্ষক একটি বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। বিলটি ১৪ জুলাই (১৯৬২) জাতীয় পরিষদে পাশ হয়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসময় জামায়াতে ইসলামী ও নেজামী এসলামীর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা জেলে থাকায় এবং এবড়ো আইনের আওতায় পড়ায় এসব দলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়। আইয়ুব খানের চক্রান্তে মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়। তার অনুসারীদের নিয়ে গঠিত হয় কনভেনশন মুসলিম লীগ (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)। আইয়ুব বিরোধীরা গঠন করেন কাউঙ্গিল মুসলিম লীগ। আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন। কাউঙ্গিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন খাজা নাজিমউদ্দিন। এসময় আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি আওয়ামী লীগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বদলে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করেন (৪ অক্টোবর, ১৯৬২)। জোটের নাম দেন ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট (সংক্ষেপে

এন.ডি.এফ.)। সোহরাওয়ার্দি জীবিত থাকাকালীন আওয়ামীলীগ পুনরজীবিত হয়নি। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর তার মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন (তিনি ১৯৫৩ সাল থেকেই দলটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন)। ইতোপূর্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ৩১ আগস্ট (১৯৬৩) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আইয়ুব বিরোধী মধ্যে সমবেত হওয়ার লক্ষ্যে গঠন করা হয় ‘সম্মিলিত বিরোধী দল’ (Combined Opposition Party বা COP)।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটার ছিলেন সমগ্র পাকিস্তানে ৮০,০০০ (আশি হাজার) মৌলিক গণতন্ত্রী। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন আয়োজন করা হয়। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে গঠিত হয় ‘সম্মিলিত বিরোধী দল’ (COP)।

আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মনোনীত করা হয় মিস ফাতিমা জিন্নাহকে। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাগী। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান ছাত্রশক্তি নামক তিনটি ছাত্রসংগঠন মিলে ‘পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্র সমাজ’ নামক একটি ছাত্র ঐক্য গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) ৯ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করে, যেমন-

১. একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করা হবে,
২. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হবে,
৩. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদকে আইন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হবে,
৪. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন দেয়া হবে,
৫. প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাহাস করা হবে,
৬. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হবে,
৭. আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে প্রদান করা হবে,
৮. সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয়া হবে, এবং
৯. নিবর্তনমূলক সকল আইন বিলুপ্ত করা হবে।

নির্বাচনী ফলাফল

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ভোট দেন আইয়ুব খানকে। আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৩.৭% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩.১% ভোট লাভ করেন। নির্বাচনে স্বল্প সংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রীকে আইয়ুব খানের পক্ষে বশীভৃত করা সহজ হয়। সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ আইয়ুব খানের পক্ষে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে কাজ করেন।

অন্যান্য নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ২১ মার্চ (১৯৬৫) জাতীয় পরিষদের এবং ১৬ মে (১৯৬৫) প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীগণ এই নির্বাচনের ভোটার ছিলেন। স্বভাবতঃই আসন প্রতি ভোটার সংখ্যা সামান্য ছিল। জাতীয় পরিষদের প্রতি আসনে ৫৫০ জন (৩টি থানা এলাকা) এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৭৫ জন (গড়ে ২টি থানা এলাকা)। এ নির্বাচনেও মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে বশীভৃত করা হয়। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কনভেনশন মুসলিম লীগ ১১৫, কপ ৯, এন্ডিএফ ৪ অন্যান্য ৪ এবং স্বতন্ত্র সদস্য ১৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে কনভেনশন মুসলিম লীগ ১৫৫টি আসনের মধ্যে ৬৬, কপ ২৫, অন্যান্য ৬ এবং স্বতন্ত্র সদস্যগণ ৫৮টি আসন পান। স্বতন্ত্র সদস্যগণ পরে অধিকাংশই সরকারি দলে যোগদান করেন।

নির্বাচনী ফলাফলের প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ফল এটাই প্রমাণ করে যে, জনসমর্থন বিরোধিদলের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় সরকারি দলের প্রার্থীকে পরাজিত করা কঠিন। এ ব্যবস্থায় দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন অর্জন সম্ভব নয়। স্বভাবত মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ গ্রহণ করতে পারেনি।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানে তার প্রভাব

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭ দিন ব্যাপী যুদ্ধ চলে পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি পাশ হয় ২০ সেপ্টেম্বর। যুদ্ধ বন্ধ হয় ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৬৫)। এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানের কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। এই অবস্থা পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্ত্বাসনের দাবিকে আরও জোরদার করে।

| | |
|---|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <ul style="list-style-type: none"> • সামরিক শাসনের কুফলসমূহ পর্যালোচনা করে একটি এ্যাসাইনমেন্ট লিখুন। • ‘১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন’ শিরোনামে আরেকটি এ্যাসাইনমেন্ট লিখে টিউটরকে দেখাবেন। |
|---|--|

সারসংক্ষেপ

- ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি ছিল।
- সামরিক শাসক আইয়ুব খান বেশ কিছু সংক্ষারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারমধ্যে মৌলিক গণতন্ত্র বাংলাদের মনে ক্ষেত্রের সঞ্চার করে।
- ১৯৬২ সাল থেকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। কত সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়? (জ্ঞানমূলক)
 - ক) ৫ অক্টোবর ১৯৫৮
 - খ) ৬ অক্টোবর ১৯৫৮
 - গ) ৭ অক্টোবর ১৯৫৮
 - ঘ) ৮ অক্টোবর ১৯৬৮
- ২। আইয়ুব খান কত সালে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন-
 - ক) ১৯৫৯
 - খ) ১৯৬০
 - গ) ১৯৬২
 - ঘ) ১৯৬৩
- ৩। সিরাজ সাহেব ছেলে রাশেদকে মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানিয়েছিলেন। বাবা পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যা কত বলেছিলেন?
 - ক) চালুশ হাজার
 - খ) ষাট হাজার
 - গ) আশি হাজার
 - ঘ) এক লাখ
- ৪। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রণীত মৌলিক গণতন্ত্রীদের হাতে প্রদান করা হয় (অনুধাবন)
 - i) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার ক্ষমতা
 - ii) জাতীয় আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষমতা
 - iii) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৫। আইয়ুব খানের শাসন ক্ষমতা গ্রহনের ফলে দেশে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়?

- | | |
|---|------------------------------------|
| ক) বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় | খ) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় |
| গ) গণতন্ত্র ধর্ম ও এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা হয় | ঘ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয় |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উভর দিন।

পূর্ব পাকিস্তানে চালিশ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চালিশ হাজার মোট আশি হাজার প্রতিনিধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। এদের হাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন করার এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

৬। উল্লিখিত ব্যবস্থাকে কি নামে অভিহিত করা হয়? (প্রয়োগমূলক)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ক) পরিচালনা কমিটি | খ) নির্বাচক মন্ডলী |
| গ) প্রকৃত গণতন্ত্র | ঘ) মৌলিক গণতন্ত্র |

৭। জনগণ উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়— কারণ (উচ্চতর দক্ষতা)

- i) জনগন আইনসভার সদস্য নির্বাচনের অধিকার হারায়
- ii) মৌলিক গণতন্ত্রীদের অত্যাচার বেড়ে যায়
- iii) মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব সরকারের পতন ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

জনাব মেহবুব একটি দেশের প্রেসিডেন্ট। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালিন সংবিধান বাতিল করেন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেন। এছাড়া রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। একসময় তার সামরিক আইন প্রশাসক তাকে অপসারণ করে নিজে প্রেসিডেন্ট হন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকারে রেখে দেশে এক ধরনের গণতন্ত্র কর্যম করেন।

ক. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কখন রচিত হয়।

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে যে সামরিক শাসকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে পাঠ্য পুস্তকের আলোকে তার কর্মকাণ্ড উল্লেখ করুন।

ঘ. আপনি কি মনে করেন উদ্দীপকের সমরিক আইন প্রশাসকের (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট) প্রবর্তিত ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে কুফল বয়ে এনেছিল? উভরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-১৩.৪ ছয়দফা আন্দোলন



উদ্দেশ্য

- এই পাঠ শেষে আপনি
- ছয়দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
 - ছয়দফা দাবিসমূহ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
 - ছয়দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



ছয়দফা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, মুক্তিসনদ, ছয়দফার গুরুত্ব, স্বাধীনতার বীজ।

মুক্ত্য শব্দ (Key Words)



ভূমিকা

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলসমূহের নেতৃত্বের এক কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান যে ছয়দফা দাবিনামা উত্থাপন করেছিলেন তা আদায়ের জন্য তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল ইতিহাসে তা ‘ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলন’ নামে অভিহিত হয়ে আছে। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয়দফা দাবি উত্থাপনের পেছনে দীর্ঘ পটভূমি ছিল। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

পটভূমি

পাকিস্তানের এতো বহুভাষা ভাষী এবং ভিন্ন সংস্কৃতির অধিবাসী ও ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুদৃঢ় করতে হলে তাদের মধ্যে ‘একজাতি একরাষ্ট’ - এই চেতনাবোধ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। তা সম্ভব ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে একের সমস্যা অন্যের অনুধাবন করার মানসিকতা অর্জনের মাধ্যমে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের যাত্রা লগ্নেই সূচনা ঘটে এক অংশের প্রতি অন্য অংশের অবিশ্বাস ও সন্দেহের।

বাঙালিদের মনে ক্ষেত্রের সঞ্চার হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল। স্বাধীনতার পরপরই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় তাতে পূর্ববাংলা প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন ধারণা জন্মালভ করে যে তাদের কখনই রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার দেওয়া হবে না। প্রথমে ভাষার প্রশ্নে বাঙালি অধিকার সচেতন হয়। ত্রিমাস্তৱে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যগুলি তাদেরকে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। সেসব বৈষম্য পর্যালোচনা করলে আমরা ছয়দফা দাবির আন্দোলনের যৌক্তিকতা বুঝতে পারব। নিম্নে পূর্ব ও পর্যবেক্ষণ পাকিস্তানের মধ্য সৃষ্টি বৈষম্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'লো-



(ক) রাজধানী নির্মাণজনিত কারণে সৃষ্টি বৈষম্য

পাকিস্তান জন্মালভের পর তার রাজধানী করা হয় করাচিতে। এরপর আইয়ুব খান প্রথমে রাওয়ালপিণ্ডিতে (১৯৬১) এবং পরে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। করাচিকে রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যয় করা হয় ৫৭০০ মিলিয়ন টাকা (পাকিস্তান সরকারের মোট ব্যয়ের ৫৬ শতাংশ)। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ব্যয় ছিল

দেশের মোট ব্যয়ের মাত্র ৫ শতাংশ। আইয়ুব খান ইসলামাবাদের উন্নয়নে ১৯৬৭ সালে যেখানে বরাদ দেন ৩০০০ মিলিয়ন টাকা, সেখানে ঢাকার উন্নয়নে বরাদ দেন মাত্র ২৫০ মিলিয়ন টাকা। এভাবে রাজধানী শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়।

(খ) অর্থনৈতিক বৈষম্য

আইয়ুব খানের শাসনামলে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য কমানোর পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের হার বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল পাট রফতানি। পাট রফতানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো তা ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। ১৯৪৭-৬৬ সময়কালে পাকিস্তানের মোট রফতানিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিল ৪২ ভাগ, অথচ মোট আমদানিতে তার অংশ ছিল ৬৯ ভাগ। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রফতানি থাতে অবদান ৫৮ ভাগ হলেও সেখানে আমদানি হয় মাত্র ৩১ ভাগ।

ব্যাংকিং সেক্টরেও পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত ছিল। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৩৬ টি, যার মোট ১১৩০টি শাখার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শাখা ছিল মাত্র ৩৬২টি (৩২%)। স্বভাবতই ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে যে বিনিয়োগ করা হয় তার সিংহভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান।

(গ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই সরকারি নিয়োগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বাড়তে থাকে। কর্মচারী রাজধানী প্রতিষ্ঠা করায় সেখানকার বিভিন্ন অফিস-আদালতে সৃষ্টি নতুন ছোট বড় পদে পশ্চিম পাকিস্তানীরাই একচেটিয়া চাকুরি লাভ করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সামরিক শাসনের ৪৮ মাসে ৭৯০ জন জুনিয়ার প্রেড কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল মাত্র ১২০ জন (১৫%)। ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩৩৮ এবং ৩৭০৮ জন। একই বছর নন-গেজেটেড কর্মচারী সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানী ২৬,৩১০ জন এর পশ্চিম পাকিস্তানী ৮২,৯৪৪ জন। তাছাড়া ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত, অর্থ ও সংস্থাপন সচিব, অর্থমন্ত্রী, স্টেট ব্যাংকের গভর্নর কখনই পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিযুক্ত হননি। ক্যাডার সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানীদের হার ছিল নিম্নরূপ: সচিব ১৪%, যুগ্মসচিব ৬%, উপ-সচিব ১৮%, সহকারি সচিব ২০% (মোট ৭৪১ জনের মধ্যে মাত্র ৫১ জন)।

ফরেন সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসেও ব্যাপক বৈষম্য ছিল। ফরেন সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তা-কর্মচারীর হার ছিল ১৯৬২ সালে ২১%। প্রতিরক্ষা সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণ সেনাবাহিনীতে ১.৫৬%, নৌবাহিনীতে ১.১৬%, বিমান বাহিনীতে ৮.৫৭% (১৯৫৬)।

(ঘ) শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৭ সালে প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছর পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষা বাবদ অর্থ বরাদের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বাড়তে থাকে। ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে শিক্ষাখাতে পূর্বপাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু বার্ষিক বরাদ ছিল ৫.৬৩ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তা ৮.৬৩ টাকা।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি ও ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ পরবর্তী বাঞ্ছিলির ক্ষোভ

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কতটা দুর্বল ছিল তা এই যুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের সতেরো দিন প্রশাসনিক দিক দিয়েও এই প্রদেশ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি, যা দেশভাগের সময় থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর আরো তা জোরদার হয়। স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগ।

শেখ মুজিব কর্তৃক ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর পরই স্বায়ত্ত্বাসনের প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্ত্বাসন আদায় অতি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। শুধু ঘোষণা দিয়েই মুজিব ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয়দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধিদলসমূহের নেতৃত্বের এক কনভেনশনে, যা আইয়ুব খান কর্তৃক তাসখন চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করার জন্য

আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে (৬.৬.১৯৬৬ তারিখে) শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। কনভেনশনটি মূলত পাকিস্তানের ডানপন্থী দলসমূহ নিয়ে গঠিত ছিল। কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিলেন মাত্র ২১ জন। উক্ত ২১ জনের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের ৪ জন নেতা। এই কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৩৫ জন প্রতিনিধি তা তৎক্ষণিকভাবে নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব তার ছোট প্রতিনিধিদল নিয়ে সম্মেলন স্থল ত্যাগ করেন এবং ঢাকা ফিরে আসেন। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপা হয়। এ দাবিগুলি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা অবহিত ছিলন। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তা পেশ করা হয়নি। ফলে কিছু প্রবীণ নেতা ক্ষুর্দ্ধ হন। তবে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতৃবৃন্দ ছয়দফা কর্মসূচি সমর্থন করেন। প্রবীণ নেতাদের আপত্তি বা গড়িমসি সত্ত্বেও তরুণ কর্মীরা ‘বাঙালির দাবি ৬ দফা’, ‘বাঁচার দাবি ৬ দফা’, ‘৬ দফার ভিতরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসন নিহিত’ ইত্যাদি প্রোগ্রাম সংবলিত পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে ফেলেন। ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদনের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা-কর্মসূচি’ শীর্ষক এক পুষ্টিকা বিলি করা হয়।

১৩ মার্চ (১৯৬৬) আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। কাউন্সিল অধিবেশনেও (১৮-১৯ মার্চ ১৯৬৬) তা অনুমোদিত হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে নতুন কমিটি গঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ছয়দফার বিবরণ

এক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাণ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

দুই. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

তিনি. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এর যে কোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়:

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অর্থ সহজে বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেপি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ‘স্টেট’ ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেপি থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চার. সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

পাঁচ. এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে শাসনতাত্ত্বিক বিধানের সুপারিশ করা হয়:

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।
২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ার থাকিবে।
৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।
৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশকে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রফতানি চলিবে।

৫. ব্যবসায়-বাণিজ্য সমষ্টি বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতাত্ত্বিক বিধান করিতে হইবে।

ছয়. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

১৩ মার্চ ১৯৬৬ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। মওলানা তর্কবাগীশ এবং আরো কিছু প্রবীণ নেতা ছয়দফার বিরোধিতা করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হলেও তা পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কাউন্সিল অধিবেশন বসে ১৮ ও ১৯ মার্চ ১৯৬৬। পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৬ দফার বিরোধিতা করে সভাস্থল ত্যাগ করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। এই সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। তাছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়।

ছয়দফার আন্দোলন ও সরকারের নির্যাতন

ছয়দফা দাবি কী ও কেন এ বিষয়টি জনগণকে বোঝানোর জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে ছয়দফার প্রচারণা শুরু করেন। শেখ মুজিব ২০ মার্চ থেকে ৮ মের মধ্যে ৫০ দিনে ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। এই অন্তসময়ের মধ্যে তিনি ৬ দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন। শেখ মুজিব ছাত্রলীগকেও ছয়দফার প্রচারণায় সংশ্লিষ্ট করেছিলেন। ছয়দফা কর্মসূচি জনপ্রিয় হতে থাকলে আইয়ুব-মোনেম চক্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব যেনে জনসভা করতে না পারেন সেজন্য যেখানেই তিনি জনসভা করতে যান সেখানেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। আবার জামিনও দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ৮ মে (১৯৬৬) তাকে দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। দলের প্রায় ৩৫০০ নেতা-কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয়।

শেখ মুজিব ও দলের নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ১৯৬৬ সালের ৭ জুন গোটা প্রদেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৭ জুনের হরতালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকরা জড়িয়ে পড়ে।

৭ জুন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁয় পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত ও অগণিত মানুষ আহত হন। তাছাড়া দেড় হাজার ব্যক্তিকে কারাগারে আটক করা হয়।

ছয়দফার আন্দোলনকে স্তুতি করে দেওয়ার জন্য সরকার ১৯৬৬ সালের ১৩ জুনের মধ্যে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় স্তরের নেতাদেরকে গ্রেফতার করে। এভাবে সেপ্টেম্বরের মধ্যে (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের ৯৩৩০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৬ জুন ইউরোপ নিয়ন্ত্রণ এবং নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াঙ্গ করা হয়।

ছয়দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালির স্বায়ত্ত্বাসন আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ছয়দফার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের পর্যায় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি যে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় ছয় দফা দাবি ঘোষণার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবিকে ‘বাঙালির বাঁচার দাবি’ হিসেবে উল্লেখ করেন। ছয়দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্পদ, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক আয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করা হয়। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতাও দাবি করা হয়।

ছয়দফা দাবিকে বাঙালির ‘মুক্তিসন্দ’ বলা হয়। ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবন্ধ হয়। ইতোপূর্বে ভাষার দাবিতে হয় ভাষা আন্দোলন, ছাত্রদের দাবি ভিত্তিক হয় শিক্ষা আন্দোলন, কিন্তু ছয়দফার আন্দোলন ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন। পূর্বের আন্দোলনগুলিতে ছাত্ররাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ছয়দফার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সংগঠন আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতৃত্ব পরিণত হন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সরকার জেল-জুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে ছয় দফার আন্দোলনকে স্থিমিত করতে পারলেও ছয়দফার দাবিগুলিকে বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ঘোষিত ১১ দফা দাবির মধ্যে ৬ দফা দাবিসমূহ অস্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনী মেনিফেস্টো প্রচার করে

তাতে ছয়দফা দাবিগুলি সন্নিবেশিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকে নির্বাচনী ম্যাণ্ডেট হিসেবে ঘোষণা করেন। ছয়দফা ও এগার দফার আন্দোলনের সময় বাঙালির মধ্যে যে সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে উঠে তার ফল পাওয়া যায় সন্তরের নির্বাচনে। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানবাসী আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়ী করে। নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফার প্রতি জনগণের রায় পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা অগ্রহ্য করার উপায় ছিল না। নির্বাচনে নিরক্ষুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ফলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। তাই বলা যায় যে, ছয় দফা আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) <i>/শিক্ষার্থীর কাজ</i> | ‘ছয়দফার আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল’- শিরোনামে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিন। |
|---|---|

৫ সারসংক্ষেপ

- শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলনও গড়ে তোলেন।
- ছয়দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।
- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ঘোষিত ১১ দফা দাবির মধ্যে ৬ দফা দাবিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকে নির্বাচনী ম্যাণ্ডেট হিসেবে ঘোষণা করেন।
- ছয়দফার আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

৬ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন? (জ্ঞানমূলক)
 - ক) করাচিতে
 - খ) চট্টগ্রামে
 - গ) লাহোরে
 - ঘ) ঢাকায়
- ৬ দফাকে বলা হয় বাঙালির (অনুধাবন)
 - i) জাতীয় দাবী
 - ii) প্রাণের দাবী
 - iii) আভ্যন্তরিণ অধিকারের দাবী
 নীচের কোনটি সঠিক?
 - ক) i ও ii
 - খ) i ও iii
 - গ) i ও iii
 - ঘ) i, ii ও iii
- শিক্ষক ছাত্রদেরকে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্ট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নীচের কোনটির উল্লেখ করেন? (প্রয়োগমূলক)
 - ক) ৪ দফা
 - খ) ৬ দফা
 - গ) ১১ দফা
 - ঘ) ২১ দফা
- ভাষা আন্দোলনে জন্ম নেওয়া চেতনা বোধকে ত্বরান্বিত করেছিল কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
 - ক) আইয়ুব খানের ক্ষমতা লাভ
 - খ) পাকিস্তানীদের বৈষম্য নীতি
 - গ) পাক ভারত যুদ্ধ
 - ঘ) ৬ দফা দাবি

পাঠ-১৩.৫ আগরতলা মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আগরতলা মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আগরতলা মামলার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আগরতলা মামলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

আগরতলা মামলা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা, ট্রাইবুনাল, হাইকোর্টে রিট, সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যাকাণ্ড, শেখ মুজিবুর রহমান।



ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, সিভিল সার্ভিসের দুইজন বাঙালি কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮ জানুয়ারি আরেকটি প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে উক্ত মামলার ১নং আসামী বলে ঘোষণা করা হয়। এই মামলার বিচারের জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। এই মামলার সরকারি নাম ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য’। লোকমুখে এই মামলা পরিচিতি লাভ করে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ হিসেবে। বঙ্গবন্ধু এই মামলার নামকরণ করেছিলেন ‘ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা’ নামে। প্রকৃতপক্ষে কোনো ষড়যন্ত্র হয়ে থাকলেও তা ছিল বাংলাদেশের মুক্তির জন্য এক প্রচেষ্টা, তাই এটি ষড়যন্ত্র হতে পারে না। সেজন্য আমরা একে উল্লেখ করেছি শধু ‘আগরতলা মামলা’ নামে।

মামলার বিষয়বস্তু

এই মামলায় পাকিস্তান সরকার অভিযোগ করেছিল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনা অফিসারের সংগে ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিব ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। এজন্য ১৯৬২ সালে তিনি গোপনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যান। সেখানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সংগে দেখা করেন এবং তার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে লে. কমান্ডার মোয়াজেম হোসেনের ভূমিকা ছিল বেশি।

এখন প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, মামলাটির ভিত্তি ছিল। তবে পাকিস্তান সরকার যেভাবে মামলাটি সাজিয়েছিল আসলে ঘটনাটি তেমন ছিল না। তবে, অভিযুক্তরা দেশকে মুক্ত করার জন্য একটা পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তাঁরা জীবনের বাঁকি নিয়েছিলেন।

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলীর স্মৃতিকাহিনী পড়ে এই ধারণা হয় যে, তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে এই মামলাটি সাজানো হয়েছিল।

- (১) ১৯৬২-৬৩ থেকে লে. কমান্ডার মোয়াজেম হোসেন প্রধানত নিম্ন পর্যায়ের কিছু নৌসদস্যদের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন,
- (২) ক্যাপ্টেন শওকত আলী একই উদ্দেশ্যে আলাপ করেছিলেন মূলধারার কিছু বাঙালি অফিসারের সাথে,
- (৩) সিভিল সার্ভিসের রঞ্জ কুদুস, আহমেদ ফজলুর রহমান ও খান শামসুর রহমান এবং আরও কয়েকজন সদস্য নিজেদের মধ্যে এনিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথেও হয়তো তাঁদের আলাপ হয়েছিল। কিন্তু এক্যবন্ধ কোনো পরিকল্পনা তাঁরা নিতে পারেননি।

শক্তিকর আলীর মন্তব্য যে, মোয়াজেম হোসেন তাড়াহুড়া করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থ গোপনীয়তা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না। ফলে সেনা সদস্যরা ধরা পড়েন। বঙ্গবন্ধু এই প্রয়াসের সঙ্গে হয়তো সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, তবে হয়তো তাঁর প্রশংস্য ছিল। তবে তিনি যে বাংলাদেশের মুক্তির প্রচেষ্টায় আগরতলা গিয়েছিলেন তা সত্য। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন তাও সত্য। পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা দফতর তা জানতো। তাই অংকুরেই সে চেষ্টা বিনাশ করার লক্ষ্যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মামলাটি সাজানো হয়েছিল।

মামলার প্রতিক্রিয়া

কিন্তু তার ফল হয়েছিল উল্টো। বাঙালির মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, শেখ মুজিব যেহেতু বাঙালির মুক্তিসনদ ছয়দফা আদায় করার জন্য লড়েছেন সে কারণেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

বিচারকার্য

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বেলা এগারটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলাটি ছিল পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২ ক এবং ১৩১ ধারা অনুসারে। মামলায় সাক্ষীর সংখ্যা ছিল ১১ জন, রাজসাক্ষীসহ মেট ২২৭ জন। প্রথ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি আত্মপক্ষ সমর্থকদল গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা বিটেনের প্রথ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বিশেষ ট্রাইবুনালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কোঁসুলী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি.এইচ.খান। ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস.এ.রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম.আর.খান ও মকসুমুল হাকিম। ২৯ জুলাই ১৯৬৮ মামলার শুনানি শুরু হয়। এ সময় স্যার টমাস উইলিয়াম ট্রাইবুনালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৫ জুলাই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইবুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।

মামলা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন

ইতোমধ্যে মামলার শুনানির কার্যবিবরণী পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করতে থাকে। পত্রিকায় অভিযুক্তদের প্রতি নানান অত্যাচারের বিবরণী প্রকাশ হতে থাকলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সাল থেকে জেলে ছিলেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন জোরদার হতে থাকলে পাকিস্তান সরকারও আন্দোলন দমনে গুলির পথ বেছে নেয়। ইতোমধ্যে ছাত্রসহ কয়েকজন নিহত হন। পুলিশের নিপীড়নে আহত হন অনেকেই। ১৯৬৯ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। হাসপাতালে জহুরুল হক মারা গেলে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসে। আইয়ুব খান পরিস্থিতি সামান দেওয়ার জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন ও প্যারোলে শেখ মুজিবকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব তা প্রত্যাখান করেন। কিন্তু ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে ও বিনাশকৰ্ত্তা ৩৫ জন অভিযুক্তকেই মুক্তি দেয়।



সার্জেন্ট জহুরুল হক

| | |
|--|--|
| অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | শিক্ষার্থীগণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলার গুরুত্ব বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন। |
|--|--|

সারসংক্ষেপ

- ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার এক ঘড়্যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে ও একটি মামলা দায়ের করে। এই মামলার ১নং আসামী করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। মোট আসামীর সংখ্যা ছিল ৩৫।
- ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। বাঙালিরা এটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করে এবং মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন জোরদার হলে সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং বিনাশর্তে ৩৫ জন অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়।

পাঠ্যতার মূল্যায়ন-১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। সরকারি নথিতে আগরতলা মামলার নাম কী ছিল? (জ্ঞানমূলক)

| | |
|-------------------------------|--|
| ক) আগরতলা মামলা | খ) করাচি ঘড়্যন্ত্র মামলা |
| গ) ইসলামাবাদ ঘড়্যন্ত্র মামলা | ঘ) রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য |
- ২। আগরতলা মামলা কেন করা হয়? (অনুধাবন)
 - হয় দফা দাবীকে নস্যাত করতে
 - নিপীড়নের মাধ্যমে মানুষকে দমিয়ে রাখতে
 - পাকিস্তানের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি প্রদান করতে।

নিচের কোনটি সঠিক?

| | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |
- ৩। আগরতলা মামলার পেছনে আইয়ুব সরকারের উদ্দেশ্য ছিল- (উচ্চতর)
 - শেখ মুজিবকে ধ্বংস করা
 - আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা
 - বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করা

নিচের কোনটি সঠিক?

| | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

পাঠ-১৩.৬ | ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান



এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৬৯ -এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি বলতে পারবেন;
- ছাত্রদের এগার দফা দাবি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

শেখ মুজিবুর রহমান, ডাকসু, এগারদফা কর্মসূচি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, স্বায়ত্ত্বাসন, শহীদ আসাদুজ্জামান, শহীদ ড. শামসুজ্জেহা, বঙ্গবন্ধু উপাধি, জয়বাংলা শ্লোগান, গোলটেবিল বৈঠক, ইয়াহিয়া খান।



ভূমিকা

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর একমাত্র আন্দোলন যা সারা বাংলাদেশে ত্রুট্যমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সেকারণেই ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানরূপে অভিহিত হয়েছে।

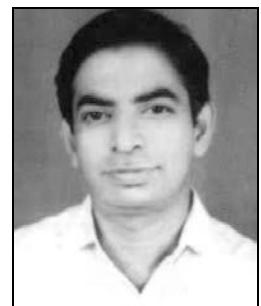
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি

- (১) ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় থেকেই পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি উচ্চারিত হচ্ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের সময়, অর্থাৎ সময় ও সুযোগ পেলেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি পেশ করা হয়। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর এই দাবি আরো জোরাদার হয়। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কতটা দুর্বল তা স্পষ্ট হয়ে যায়। মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধেই পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনিক দিক দিয়েও কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে।
- (২) পূর্ববাংলা/পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক কর্মীরাও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উপর প্রচল ক্ষুঢ় ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই বাংলাভাষাকে ইসলামীকরণ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে আরবি কিংবা রোমান অক্ষরে পরিবর্তিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলায় ভাষা পুর্ণগঠন কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ব বাংলায় তা কড়া প্রতিবাদ হওয়ায় ঐ কমিটির রিপোর্ট ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৫৯ সালে রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেয়। তবে তীব্র প্রতিবাদের মুখে আইয়ুব খানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ থাকে। ১৯৬৭ সালে আগস্ট মাসে (১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণের পূর্বে) বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। আইয়ুব-মোনেম চক্র কেবল রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাংলা ভাষা সংক্রান্ত করে একটি ‘জাতীয় ভাষা’ প্রচারের উদ্যোগ নেয়। বাংলা ভাষা পাকিস্তান সংস্কৃতি বিরোধী পাকিস্তান সরকারের এসব অপচেষ্টার কারণে পূর্বপাকিস্তানে বুদ্ধিজীবী মহল ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী প্রচল ক্ষুঢ় হয়।
- (৩) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নেয়। শেখ মুজিবকে ঐ মামলায় আসামী করা হয় ১৮ জানুয়ারি (১৯৬৮)। ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। ছাত্র নেতৃত্বে আলোচনা শুরু করেন ছয়দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে মওলানা ভাসানী বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ‘ঘৰাও কর্মসূচি’ নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু ও চারটি ছাত্র সংগঠনের সাত জন নেতা প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচি। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র নেতৃত্বে ১১ দফা ঘোষণা করেন। মূলত ৬ দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা। কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনই ছিল ১১ দফা দাবির মূল বক্তব্য। এগার দফার আন্দোলনই উন্সত্ত্বের গণ আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। ১১ দফার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাও অন্তর্ভুক্ত করে আরো ৫টি দাবি সন্ধিবেশিত করা হয়।

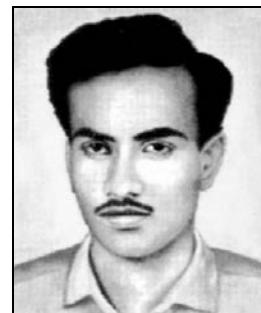
উন্সত্ত্বের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলি

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয়দফা অন্তর্ভুক্ত হয়। এগারো দফায় বাঙালি মধ্যবিত্ত ও কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এগারো দফার আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্র-নেতৃত্বের হাতে চলে আসে।

আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে এবং মধ্য জানুয়ারিতে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। আইয়ুববিরোধী মিছিল মিটিং সভা সমাবেশ নিত্যদিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আন্দোলন কেবলমাত্র ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা পল্লীগ্রামসহ সকল মফস্বল শহরেও বিস্তৃত হয়েছিল। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে অনেকেই সে আহ্বানে সাড়া দেন। কয়েকজন বিরোধী দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার্ণ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের সংগে একাত্তা ঘোষণা করেন। আইয়ুব পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে ঐ আন্দোলন স্তুর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আন্দোলনতো স্তুর হয়নি বরং শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণে তা দিন দিন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রন্পের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে যখন প্রট্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় ১৮ ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলি ও বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। ড. জোহার মৃত্যুসংবাদে সারাদেশে এমন ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় যে, সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ঘড়্যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়। মুক্তি দেয়া হয় রাজবন্দীদেরও।



শহীদ ড. শামসুজ্জোহা



শহীদ আসাদ

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি লাভে ঢাকায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। পাঁচ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে উক্ত সমাবেশে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবনায় শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। উক্ত সভাতেই ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের উত্তর ঘটে। সভায় ‘বঙ্গবন্ধু’ ছয়দফা ও এগার দফা দাবি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়ার পর আন্দোলনের ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায়। এমনি পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নেন, ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন, এমনকি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না দাঁড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানান। রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত (১০.০৩.১৯৬৯) উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু যোগদান করেন। মওলানা ভাসানী ও জুলাফিকার আলী ভুট্টো উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে বয়কট করেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈঠক ব্যর্থ হয়।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিকুঠু হয়ে ওঠে, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আর কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপকতা লাভ করে। এমতাবস্থায় আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ২৪ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানে আবার জারি করা হয় সামরিক আইন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে প্রায় ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানি নিহত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ৩৪ জন শিল্প-কারখানার শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ১ জন স্কুল শিক্ষক অন্যতম।



১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

| | |
|--|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) শিক্ষার্থীর কাজ | <ul style="list-style-type: none"> ● ‘গণঅভ্যর্থনা’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখুন। ● এগারদফা ও ৬ দফার মধ্যে কোন কোন দফার মিল আছে তা শিক্ষার্থীগণ মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করবেন। |
|--|---|

সারসংক্ষেপ

১৯৬৯ -এর আন্দোলন বাংলাদেশে ত্বকমূল পর্যন্ত পৌছেছিল। সেজন্য এ আন্দোলন গণআন্দোলন ও গণঅভ্যর্থনা নামে অভিহিত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ক্রমাগতভাবে পূর্ব বাংলা/পূর্বপাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে তার বিহিতন্ত্রিকাশ ঘটে উন্সত্ত্বের গণঅভ্যর্থনানে। এসময় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ঘোষিত ১১ দফা দাবীর মধ্যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ছয়দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যর্থনানে প্রায় ১০০ জন পূর্বপাকিস্তানী নিহত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা তাদের মধ্যে অন্যতম। এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আগরতলা মামলা বাতিল হয়। শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেয়ে রেসকোর্সের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত হন।

পাঠোভ্র মূল্যায়ন-১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। ১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে কে নিহত হন?

- ক) ড: শামসুজ্জোহা খ) জহুরুল হক গ) আসাদুজ্জামান ঘ) মতিউর রহমান

২। ডঃ শামসুজ্জোহা ছিলেন-

- ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র খ) ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবী
গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ঘ) রাজশাহী সরকারি কলেজের শিক্ষক

৩। ইলিয়ট গঞ্জে কলেজের ছাত্রা ‘ক’ নামক দাবীর মাধ্যমে গণঅভ্যর্থনানের ডাক দেয়। ‘ক’ এর সাথে সাদৃশ্য দেখা যায় কোনটির?

- ক) ৬ দফা খ) ১১ দফা গ) ২১ দফা ঘ) ৮ দফা

৪। ১৯৬৯ সালে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। এখানে তাকে কী উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

- ক) জাতির জনক হিসেবে খ) বাঙালির পিতা হিসেবে গ) বঙ্গবন্ধু হিসেবে ঘ) বীরশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে

৫। ১৯৬৯ সালের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল-

- অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।
- বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।
- ব্যাংক বীমা ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১৩.১ : ১. ঘ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. ঘ ৯. খ ১০. ঘ

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১৩.২ : ১. গ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫. খ ৬. খ

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১৩.৩ : ১. গ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১৩.৪ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১৩.৫ : ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১৩.৬ : ১. গ ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ

১৯৭০ এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৪.১ : ১৯৭০ সালের নির্বাচন

পাঠ-১৪.২ : অসহযোগ আন্দোলন : মার্চ ১৯৭১

পাঠ-১৪.৩ : বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা

পাঠ-১৪.৪ : স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পাঠ-১৪.৫ : বেসামরিক ও সামরিক প্রতিরোধ এবং ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ

পাঠ-১৪.৬ : জেনোসাইড বা গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ১৯৭১-এর শরনার্থী

পাঠ-১৪.৭ : মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা

পাঠ-১৪.৮ : মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত

পাঠ-১৪.৯ : স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও বিজয় দিবস

পাঠ-১৪.১০ : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সরকার গঠন



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ

পাঠ-১৪.১ | ১৯৭০ সালের নির্বাচন



এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি, নির্বাচন পদ্ধতি, আসন বন্টন প্রভৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইন কাঠামো আদেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ, এক ইউনিট, আইন কাঠামো আদেশ, নির্বাচনী মেনিফেস্টো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভূট্টো, আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, সাইক্লোন।



ভূমিকা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেশটির কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন চালু ছিল। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রথম দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে।

১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের সময় ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। স্বত্বাবতার নির্বাচন অনুষ্ঠান ও জাতীয় পরিষদ গঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি সামরিক আইনের অধীনে বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে জারি করেন। ২৮ নভেম্বরের (১৯৬৯) বেতার ভাষণে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইয়াহিয়া খান দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

প্রথমত : তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ স্থাপ্ত করেন।

দ্বিতীয়ত : ‘এক ব্যক্তি এক ভোট’ এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা দেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেওয়া হয়।

২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) ইয়াহিয়া খান আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যেমন,

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার,
২. প্রাণ্ডব্যক্ত ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন,
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা,
৪. বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা এবং
৫. পাকিস্তানে একটি ইসলামি ভাবাদৰ্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ঘোষণা করা হয় ‘আইন কাঠামো আদেশ’ (Legal Frame Work Order, LFO)।

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইন কাঠামো আদেশের বিরুপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

নির্বাচন

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়।

নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬২ টি সাধারণ আসনে একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন দলই সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। উক্ত ১৬২টি আসনে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল যথাঃ মুসলিমলীগ (কনভেনশন) ৯৩, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) ৬৫, মুসলিম লীগ (কাউঙ্গিল) ৫০, জামায়াতে ইসলামী ৬৯, জমিয়াতুল উলামা ও নেজামে ইসলামী ৪৫, পিডিপি ৮১, ন্যাপ (মোজাফফর) ৩৬, স্বতন্ত্র ১০৯ এবং অন্যান্য ছোট দলসহ সর্বমোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৭৬৯ জন।

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে ঘোষণা করে। তারা নির্বাচনকে ছয়দফা ও এগারদফার প্রশ্নে একটি গণভোট বলে অভিহিত করেন। নির্বাচনে জয়লাভ করলে ছয়দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান প্রণয়ন করবে বলে প্রতিক্রিতি দেয়। আওয়ামী লীগ ‘জয়বাংলা’ স্লোগানকে বাঞ্ছিল জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই শ্লোগানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করতে পারলে আওয়ামী লীগ দেশে অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিক্রিতি দেয়। ঘোষণা করা হয় যে, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর আয়ুল পরিবর্তন এবং ব্যাংকবীমা কোম্পানিসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে জনগণের মালিকানায় আনা হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের প্রতি ব্যাপক সমর্থন ও সেবা শিল্পের উপর নির্ভরশীল মানুষকে পেশাগত ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ। পাট, তুলা ব্যবসায় জাতীয়করণ এবং অর্থকরী ফসল চা, ইকু, তামাকের উপর অবজ্ঞার অবসান ঘটিয়ে চাষীদের জন্য ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। ২৫ বিধা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করা হবে ইত্যাদি।



বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী প্রচার অভিযান

অন্যান্য দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নীতি, পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী নীতি এবং ভারত বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৫৬ সালের সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করে উক্ত সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে মত দেয়। সংশোধনীগুলি ছিল যেমন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল ইত্যাদি। জামায়াত আওয়ামী লীগের ছয়দফার বিরোধিতা করে।

ন্যাপ (ওয়ালী) এর পূর্ব পাকিস্তান শাখা ন্যাপ (মোজাফ্ফর) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের দাবিকে অগ্রাধিকার দিলেও ক্ষমতার বেটন প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ছয়দফা থেকে তাদের দাবি অনেক নমনীয় ছিল।

১৯৭০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সাইক্লোন ও নির্বাচনে তার প্রভাব

১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা হয়। স্বত্বাবতই নির্বাচনের তারিখ পুনঃ নির্ধারিত হয়ে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ১৭ ডিসেম্বর। কিন্তু ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় প্রায় দুই লক্ষ লোকের জীবন কেড়ে নেয়। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা এক ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। এই বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে প্রায় সকল দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার দ্রুত প্রতিবাদ করে। অবশেষে নির্বাচন পূর্বঘোষিত সময় অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি ঘূর্ণি-উপদ্রুত নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন এক মাস পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনের ফলাফল

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টির নূরগ্ল আমিন)। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে)। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রায় সর্বগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রাথী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে দেশের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কোনো মিল ছিল না।
৩. পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুল রায় ছিল ৬ দফার প্রতি গণরায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের জন্য বাঙালির ম্যান্ডেটস্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে প্রত্যাখান করে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন প্রশ্নে দুই মেরামতে অবস্থান করে। আওয়ামী লীগ ছয়দফার দাবিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ণ রাখে। পক্ষান্তরে পিপিপি সহ অন্যান্য ডানপন্থী দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। ভূট্টো হুমকি দেন যে, তাঁর মতামত গ্রহণ করা না হলে তাঁর দল জাতীয় সংসদে অধিবেশন বয়কট করবে। তাঁর প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধুও স্পষ্ট করে ঘোষণা দেন, প্রয়োজনে তিনি একাই সংবিধান প্রণয়ন করবেন। এমনি পরিস্থিতিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর দাবির নিকট মাথা নত করেন। তিনি ১ মার্চ (১৯৭১) এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থাগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষেপে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় মার্চের অসহযোগ আন্দোলন।

| | |
|---|--|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) <i>/শিক্ষার্থীর কাজ</i> | ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন। |
|---|--|

১ সারসংক্ষেপ

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। এক ব্যক্তি এক ভোট ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করায় এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন ও ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি সাধারণ ও ৭টি মহিলা আসন লাভ করার মাধ্যমে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নিরঞ্জুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, যা মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

২ পাঠোভৱ মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের অবসানের পর কে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন? (উত্তমূলক)
 - ক) ঢিক্কা খান
 - খ) জুলফিকার আলী ভূট্টো
 - গ) লিয়াকত আলী খান
 - ঘ) ইয়াহিয়া খান
- ২। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূলে কৌ ছিল? (অনুধাবন)
 - ক) সরকারের সাথে সমরোতার ভিত্তি
 - খ) বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ছয় দফা দাবির ভিত্তি
 - গ) সর্বদলীয় এক্যের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ
 - ঘ) পিপলস পার্টির সহযোগিতা নেওয়া
- ৩। নিচের ছক্টি দেখে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

| নির্বাচন | মোট আসন সংখ্যা | আওয়ামীলীগ | পিপলস পার্টি |
|-----------------|----------------|------------|--------------|
| জাতীয় পরিষদ | ৩১৩ | ১৬৭ | ৮৮ |
| প্রাদেশিক পরিষদ | ৩০০ | ২৮৮ | - |

উদ্দীপকে (ছক্টে) কত সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হয়েছে?

- ক) ১৯৫৪
- খ) ১৯৬৫
- গ) ১৯৭০
- ঘ) ১৯৭৩
- ৫। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
 - ক) পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বন্দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে
 - খ) পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়
 - গ) পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বগ্রহণে লিঙ্গ হয়
 - ঘ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়
- ৫। বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষ বাঙালিদের দুঃসময়ে এগিয়ে আসলেও পাকিস্তানের শাসকবর্গ নিক্ষীয় ভূমিকা পালন করে। এটি কোন ঘটনা মনে করিয়ে দেয়?
 - ক) ১৯৬৯ সালের জলোচ্ছব্বাস
 - খ) ১৯৭০ সালের ঘুর্ণিঝড়
 - গ) ১৯৭১ সালের দুর্ভিক্ষ
 - ঘ) ১৯৭২ সালের বন্যা

পাঠ-১৪.২ | অসহযোগ আন্দোলন : মার্চ ১৯৭১



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বন্দি হওয়ার কথা উল্লেখ করতে পারবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন, টিক্কা খান, পল্টন ময়দান, স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা।



৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিত ব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং পরদিন সারাদেশে হরতাল ডাকেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষেপে ফেটে পড়ে। ২ এবং ৩ মার্চ হরতালের ফলে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড ঘুরে পড়ে। কোনো কোনো ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠন স্বাধীনতার ঘোষণা দিবি করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সভায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ‘স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। ইশতেহারে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের তিনটি লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়। যেমন:

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি করা হবে,
২. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা হবে এবং
৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করা হবে।

সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য যেসকল কর্মপন্থা ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করতে হবে,
২. আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি বাহিনী গঠন করতে হবে,
৩. হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে, ইত্যাদি।

২ মার্চ হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং অনেকে আহত হলে ঐ দিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আন্দোলনের কর্মসূচিতে ছিল : ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা থেকে বেলা ২:০০ টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। ৭ মার্চ বেলা ২ টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। ৩ মার্চ ছাত্রলীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের ট্যাক্সি প্রদান বন্ধ রাখার জন্য জনগণকে নির্দেশ দেন।

এমনি পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ (১৯৭১) জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। একই দিন তিনি কঠোর প্রকৃতির সামরিক অফিসার জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণটি ইতিহাসে ‘বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ’ নামে অভিহিত হয়েছে। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধুর দুটি উদ্দেশ্য লক্ষ করা যায়, যেমন-



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

১. ‘এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’

-এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

২. উক্ত ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন, যেমন:

- অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে,
- অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে,
- প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং
- (জাতীয় অধিবেশনের পূর্বেই) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এই শর্তগুলো মানলেই যে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ আত্মত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন এমন নিশ্চয়তা ভাষণে দেননি। ৭ মার্চের ভাষণে আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন।

৭ মার্চ ভিন্ন এক ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সাতদিন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দশদফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দফাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- কর না দেওয়ার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে,
- সকল অফিস ও আদালতে ধর্মঘট চলতে থাকবে,
- রেল ও বন্দরসমূহ চালু থাকবে। তবে সেনাবাহিনী চলাচলের কাজে শ্রমিক-কর্মচারীরা সহযোগিতা করবে না,

৪. রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে গণআন্দোলনের সংবাদ গোপন রাখা যাবে না,
৫. কেবল স্থানীয় এবং আন্তঃজেলার মধ্যে ট্রাক ও টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে,
৬. সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে,
৭. কোন মাধ্যমেই ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠাবে না,
৮. প্রতিদিন সব ভবনের উপর কালো পতাকা ওড়ানো হবে,
৯. অন্য সব ক্ষেত্রে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে ধর্মঘট আহ্বান করা হলে তা পালন করতে হবে,
১০. প্রতিটি মহল্লা, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা এবং জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে।

৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নাম থেকে পূর্বপাকিস্তান বাদ দিয়ে কেবল ‘ছাত্রলীগ’ করা হয়। জেলা থেকে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ‘স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’, গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো, উর্দু সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৯ মার্চ এক প্রচারপত্রে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়।

৯ মার্চ মাওলানা ভাসানী ‘পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন’ শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।

৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেলিনবাদী) এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, অস্ত্র হাতে লড়াই করতে আহ্বান জানায়।

১১ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রচারপত্রে শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ববাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করে তোলার আহ্বান জানায়।

১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতির মাধ্যমে এ যাবত কার্যকরী সকল নির্দেশাবলি বতিল করে দেন এবং ১৫ মার্চ থেকে কার্যকর করার জন্য ৩৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি

পূর্ব পাকিস্তানে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, গোটা বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমনি মুহূর্তে ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি করেন।

সর্বশেষ সমরোতা অভিযন্ত

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে সমরোতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন জেনারেলসহ ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আগত। পাঞ্জাবিরা কিছুতেই ছয় দফার বাস্তবায়নে সম্মত ছিল না। আওয়ামী লীগও ছয় দফার প্রশ্নে ছাড় দিতে রাজি ছিল না। ইতোমধ্যে ঢাকায় ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান সংকটের সামরিক সমাধান দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় কালক্ষেপণ করে অলক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি আনয়ন করতে থাকে। পাকিস্তান সামরিক জাত্তা শক্তির সাহায্যে বাঙালির

দমন করার একটি পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এর নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সার্চলাইট’। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ৩ ব্যাটেলিয়ান পাকিস্তানী সৈন্য ‘অপারেশন সার্চলাইট’ অংশ গ্রহণ করে।

অবশেষ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা সংগঠিত করে। ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তান বাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১টা ১০ মিনিটে (২৬ মার্চের প্রথম প্রহর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বন্দি করে এবং পরে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যায়। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তাঁর বন্দি হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ৯ এপ্রিল (১৯৭১)। বন্দি হওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

| | |
|---|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণের মর্মকথা পর্যালোচনাপূর্বক একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষককে দিবেন। |
|---|--|

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে লাগাতারভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। যা ইতিহাসে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে ‘স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি’ ঘোষণা করে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১৫ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সংগে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার অভিনয় করেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার গণহত্যা চালায় এবং রাত ১.২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে। বন্দি হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। ৩ মার্চের জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয় কবে? (জ্ঞানমূলক)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক) ২৭ ফেব্রুয়ারি | খ) ২৮ ফেব্রুয়ারি |
| গ) ১ মার্চ | ঘ) ২ মার্চ |

২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয় (অনুধাবন)

- i) ২ মার্চ ১৯৭১ ii) ৩ মার্চ ১৯৭১ iii) ৪ মার্চ ১৯৭১

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

অচিন্ত্যপুর, পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সমন্বয়ে এক দেশ। পশ্চিমাংশের লোকরা পূর্বাংশে অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করলে দেশটির পূর্বাংশের এক নেতা জনগণের প্রতি অসহযোগ আন্দোলনের সম্পৃক্ত হওয়ার ডাক দেন। ফলে কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী শিক্ষার্থী সাধারণ জনতা নির্বিশেষে সকলে অবিসংবাদিত নেতার আহবানে সাড়া দিয়েছিল।

৩। উদ্বীপকে বর্ণিত অংশে কোন নেতার ছবি ফুটে উঠেছে?

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ক) এ.কে ফজলুল হক | খ) মাওলানা ভাসানী |
| গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী | ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান |

৪। এই অবিসংবাদিত নেতার আন্দোলন ছিল মূলত-

- i) স্বেরাচার শাসকের বিরুদ্ধে
- ii) পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে
- iii) সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৫। বঙ্গবন্ধুর কত তারিখের বক্তব্য ছিল স্বাধীনতার একটা মাইলফলক?

- | | |
|-------------|-------------|
| ক) ৭ মার্চ | খ) ১১ মার্চ |
| গ) ১৫ মার্চ | ঘ) ১৯ মার্চ |

পাঠ-১৪.৩ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর বাণী বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- সশন্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



স্বাধীনতার ঘোষণা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর।

মুখ্য শব্দ (Key Words)



বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

বঙ্গবন্ধু বন্দি হওয়ার পূর্বেই চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম. এ. হান্নানের নিকট স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি স্বাধীনতার দলিলপত্র ত্রৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (পৃ.১)। বাণীটি নিম্নরূপ:

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

(বাংলা অনুবাদ): 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। এই আমার শেষ কথা। যে যেখানেই থাকুন না কেন সকলের প্রতি আমার আবেদন রইল, যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করুন এবং বাংলার মাটি থেকে পাক দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় না-হওয়া পর্যন্ত লড়ে যান'।



স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র

এম.এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন।

২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটি ও স্বাধীনতার দলিলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে পাদটাকায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল'।

সেনাবাহিনীর অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলে নয় মাস। এ যুদ্ধ আপামর জনসাধারণের কাছে মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। সে কারণে তা স্বাধীনতার যুদ্ধ নামেও পরিচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শক্রমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে। এ জন্য দিবসটি আমাদের কাছে বিজয় দিবস হিসেবে পরিচিত।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি মুখস্থ করুন। |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১.২০ মিনিটে (২৬ মার্চের প্রথম প্রহর) পাকিস্তানী বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে। বন্দি হওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম.এ. হান্নানের নিকট স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন।

পাঠ্য মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস?

- | | |
|-------------------|----------------|
| ক) ২১ ফেব্রুয়ারি | খ) ২৬ মার্চ |
| গ) ১৪ ডিসেম্বর | ঘ) ১৬ ডিসেম্বর |

২। ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহরে গ্রেফতারের পূর্বে কে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ক) আতাউল গণি ওসমানি | খ) মাওলানা ভাসানী |
| গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান | ঘ) অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ |

৩। আকলিমা রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঘূরতে এসে জেনেছে ১৯৭১ সালে এখানেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন পুলিশ বাহিনীর অসংখ্য সদস্য। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত-

- i) ২৫ মার্চ গভীর রাত
- ii) অপারেশন ক্লিনহার্ট
- iii) অপারেশন সার্চলাইট

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

পাঠ-১৪.৪ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকার গঠনের পটভূমি ও সরকারের সদস্যদের নাম বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

| | |
|-------------------------------------|---|
| মুক্ত্য শব্দ (Key Words) | মুজিবনগর সরকার, মুক্তিযুদ্ধ, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, ইন্দিরা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, উপদেষ্টা কমিটি। |
|-------------------------------------|---|



ভূমিকা

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার ‘মুজিবনগর সরকার’ নামেই বেশি পরিচিত। অনেকে একে প্রবাসী সরকার বলেন। তবে এ সরকারকে বাংলাদেশ সরকার বা মুজিবনগর সরকার বলাই শ্রেয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের অবদান ছিল অতুলনীয় ও অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিজয় অর্জনের সময় পর্যন্ত এই সরকারের কর্মকাণ্ডের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করা, দেশের অভ্যন্তর থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাণ্ডল ছাত্র জনতা ও যুবকদের যুব শিবিরে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে আসের সৃষ্টি করা, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বৃদ্ধ করা এবং সাথে সাথে আলোড়ন সৃষ্টি করা এসবই ছিল প্রবাসী সরকারের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

মুজিবনগর সরকার গঠনের পটভূমি

বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাঙালি জাতিকে একটি যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ অনিবার্য-এই বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কাছে পরিষ্কার ছিল। সেজন্য তিনি যেমন আপামর বাঙালিকে যুদ্ধে যাবার জন্য ব্যাকুল করে তুলেছিলেন, সে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটা সুচিত্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও একটা বিকল্প নেতৃত্বও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর মনে আস্থা জন্মেছিল যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই বিকল্প নেতৃত্ব যুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হবে। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনার ফসল হচ্ছে মুজিবনগর সরকার। এই সরকার গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা পূর্ব পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায়।

২৬ মার্চ (১৯৭১) প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হলে ভারত সরকারের সাহায্যের বিষয় আলোচনা করার জন্য তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম তৎক্ষণিকভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত যান এবং ১ এপ্রিল তারা ‘ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় ভারতীয় গোয়েন্দা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দিল্লি পৌছেন। সেখানে অতি সহজেই ভারতের তদনীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সংগে তাদের সাক্ষাত হয়। পরে তাজউদ্দিন আহমেদ সরকার গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু হন রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম নির্বাচিত করা হয়। তাজউদ্দিন এই সরকারের অপর তিনি মন্ত্রী নির্বাচিত করেন যথাক্রমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। তাজউদ্দিন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকালীন এক সংকটময় সময়ে এত সহজে এই মন্ত্রিসভা গঠন করেন যেন মনে হয় বঙ্গবন্ধু প্রবাসী সরকার গঠন না করে রাখলেও একটা দলীয় হাইকম্যান্ড গঠন করেছিলেন। এই হাইকম্যান্ডে ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান (বঙ্গবন্ধু নিজে), সাধারণ সম্পাদক (তাজউদ্দিন) এবং তিনজন সহ-সভাপতি (যথাক্রমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী)। তাজউদ্দিন আহমেদ এই হাইকম্যান্ডকেই প্রবাসী সরকারে পরিণত করেন। এই প্রবাসী সরকারকে ভারত গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার সবুজ সংকেত পাওয়া যায়। প্রবাসী সরকার গঠন এবং সেই সরকারকে ভারতের স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনা ঘটে এপ্রিলের ৪ থেকে ৬ এর মধ্যে। এপ্রিলের ৮ অথবা ৯ তারিখে তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। দিল্লি ত্যাগের পূর্বেই তাজউদ্দিন আহমেদ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বেতার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারের লক্ষ্যে একটা ভাষণ রেকর্ড করেন এবং বিএসএফের গোলক মজুমদারের নিকট ক্যাসেটটি হস্তান্তর করা হয়। দশ এপ্রিল রাত ৯:৩০ মিনিটে অল ইন্ডিয়া রেডিওর

শিলগুড়ি কেন্দ্র থেকে ভাষণটি প্রচারিত হয়। শিলগুড়ি কেন্দ্রের একটি অতিরিক্ত ট্রান্সমিটার এজন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ট্রান্সমিটারের নাম ঘোষণা করা হয় ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’। প্রকৃতপক্ষে এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি পরিষ্কার করেন। প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমেদের দৃঢ়তার ফলে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়।

তাজউদ্দীন আহমেদ ১২ এপ্রিল মন্ত্রীদের মধ্যে দণ্ডের বর্ণন করেন।

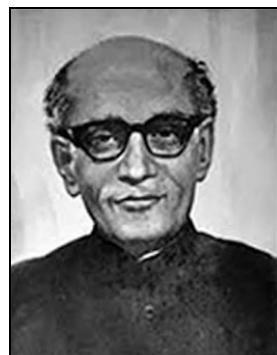
- | | |
|-----------------------------|---|
| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান | - প্রেসিডেন্ট |
| সৈয়দ নজরুল ইসলাম | - ভাইস-প্রেসিডেন্ট |
| তাজউদ্দীন আহমেদ | - প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় |
| খন্দকার মোশতাক আহমেদ | - পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ |
| এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান | - অভ্যন্তরীণ সরকার, আণ ও পুনর্বাসন |
| ক্যাপ্টেন মনসুর আলী | - অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প |



সৈয়দ নজরুল ইসলাম



তাজউদ্দীন আহমেদ



ক্যাপ্টেন মনসুর আলী



এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

১৭ এপ্রিল (১৯৭১) নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। নতুন সরকার বৈদ্যনাথতলার নাম পাল্টে রাখেন মুজিবনগর। বাংলাদেশ সরকার কখনই মুজিবনগরে অবস্থান করেননি। কিন্তু ‘মুজিবনগর’ নামটি প্রতিকী তাৎপর্য বহন করতে থাকে। সরকারের প্রকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কোলকাতায়।

মুজিবনগর সরকারের বড় কৃতিত্ব ‘স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র’ দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বিশেষ যে ক'টি দেশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছিল বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে এ সম্বলিত ইংরেজিতে প্রণীত প্রক্রমেশেন অব ইনডিপেন্ডেন্স বা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মুজিবনগরে পাঠ করা হয় ১৭ এপ্রিল যা ২৩ শে মে ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই বাংলাদেশ গঠনের এবং পরবর্তীকালে সংবিধানের ভিত্তি। কারণ, এই ঘোষণার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ও রাষ্ট্রগঠন আইনত স্বীকৃতি লাভ করে।



বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগরে সালাম গ্রহণ করছেন, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

স্বাধীনতা সনদের তাৎপর্য

ঘোষণাটি আইনের ভাষায় রচিত এবং তা রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম। নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার এবং চলমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে আইনগত ভিত্তি দেয়ার জন্য ‘স্বাধীনতার সনদ’ ঘোষণা করা হয়। এর মাধ্যমে মুজিবনগর প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধকরণ করা হয়। এই সনদে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন দেয়া হয়।

এই সনদটি যে জাতিসংঘ ঘোষিত আতুনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় সংক্রান্ত সনদের আলোকে বৈধ ছিল তাও যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করা হয়। সনদে যুক্তি উপস্থাপন করে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র এলাকা এবং সম্মিলিত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে শাসন করার আইনগত অধিকার অর্জন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে প্রদেয় প্রতিশ্রূতি আদায় থেকে বাধিত হওয়ায় তারা নিজেদের একত্রি করার একটি আইনগত অধিকার অর্জন করেছে। এই অধিকার বলেই ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ বৈধতা পেয়েছে।

সনদে জাতিসংঘের সকল দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এবং এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রত্যাশা করা হয়।

আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ জারি

১০ এপ্রিল (১৯৭১) জারিকৃত এই আদেশটি ২৬ মার্চ (১৯৭১) থেকে কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান আমল থেকে চলমান সকল আইন (প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন সাপেক্ষে) বৈধকরণ ও কার্যকর করা। এ আদেশের বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত স্থাপিত হয়।

মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন

মুজিবনগর সরকার একটি পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনাব রফিউল কুদুস প্রধান সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জুলাই মাসে (১৯৭১) বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এগুলোর নাম দেয়া হয় জোনাল কাউন্সিল। মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষভোটে ১১ জন আঞ্চলিক চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে একজন করে আঞ্চলিক প্রশাসক বা জোনাল এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আশ, প্রকৌশল, পুলিশ, তথ্য ও হিসাব কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশন গঠন

দেশ শক্রমুক্ত করার পরপরই যেহেতু পুনর্গঠন একটি কাজ হবে এবং সে কাজে সরকারের পক্ষে কোনরূপ কালঙ্কেপণ করা যাবে না, তাই স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং সদস্য ছিলেন (১) ড. খান সরওয়ার মুর্শেদ, (২) ড. মোশাররফ হোসেন, (৩) ড. এস. আর. বোস এবং (৪) ড. আনিসুজ্জামান।

মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটি গঠন

মুজিবনগর সরকারকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনদানকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বস্বরূপে নিয়ে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই কমিটির মেতা। এর আহবায়ক ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন:

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (মক্ষেপষ্ঠী ন্যাপ এর প্রতিনিধি)

মনিসিংহ (কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি)

মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস দলের মেতা)

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (আওয়ামী লীগ দলের প্রতিনিধি)

এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান (আওয়ামী লীগ দলের প্রতিনিধি)

খন্দকার মোশতাক আহমদ (মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি)

মুজিবনগর সরকারের বেতার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকা

(ক) বেতার মাধ্যম

মুজিবনগর সরকার শুরু থেকেই প্রচার মাধ্যমকে শুরুত্ব প্রদান করেন। বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হয় ২৬ মার্চ দুপুর ২ টায় কালুরঘাট কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে। ২৭ থেকে ৩০ মার্চ কালুরঘাট

বেতার কেন্দ্র চালু থাকে। ৩০ এপ্রিল এটি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বেতারকর্মীগণ ত্রিপুরা রাজ্যের বাগফা নামক স্থান থেকে ৩ এপ্রিল পুনরায় অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেন। ২৫ মে পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি চালু ছিল। বিছিন্নভাবে ১০ এপ্রিল থেকে পরবর্তী কয়েকদিন শিলিঙ্গড়ি থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র চালু রাখা হয় যে কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের প্রথম বেতার ভাষণ প্রচার করা হয়। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক ২৫ মে থেকে একটি বেতার কেন্দ্র পরিচালনার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আব্দুল মাল্লান এম.এন.এ-র উপর। ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি চালু ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তৎপর্যবাহী।

(খ) পত্রিকা প্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। গণমাধ্যম হিসেবে মূল্যবান অবদান রেখেছে এসব পত্র-পত্রিকা। সে সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখ্যপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ‘সাংগঠিক জয়বাংলা’। আব্দুল মাল্লান এম.এন.এ. ছিলেন এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি এবং জিল্লুর রহমান এম.এন.এ. ছিলেন প্রধান সম্পাদক। ১১ মে থেকে ১৬ ডিসেম্বর এটি প্রকাশিত হয়। বিঃবিশ্বে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকার Bangladesh নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ সমরসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরনের তৎপরতার খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকাগুলোতে থাকতো বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন ও আন্দোলনের খবর এবং বাঙালি কুটনীতিকদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণী।

পরিশিষ্ট

“স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনুদিত)

মুজিবনগর, বাংলাদেশ

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামীলীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতৃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মিন্দ্রিয়ের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একবিত্ত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরপে গঠন করিলাম,

এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া

এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রয়োগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মূলতবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্য্যালয় ক্ষমতার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহার প্রয়োগ ও পালন করিবেন। আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।'

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও

তদবীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

[সংবিধান থেকে উদ্ধৃত]

| | |
|---|--|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <ul style="list-style-type: none"> • মুজিবনগর সরকারের অবদান পর্যালোচনা পূর্বক একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিন। • মুজিবনগর দিবস উদযাপন করুন। ঐ দিন একটি সেমিনার আয়োজন করে মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করেন। |
|---|--|

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিতি। ১০ এপ্রিল ঘোষিত মুজিবনগর সরকার ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ করে। বৈদ্যনাথতলার পরিবর্তিত নাম মুজিবনগর। ১০ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে মুজিবনগর প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধকরণ করা হয়। যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের মৌলিক আইনের ভিত্তি ছিল এই স্বাধীনতার সনদ। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এটিই ছিল দেশের সংবিধান।

ପାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ-୧୪.୮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞানমূলক)

- ক) মেহেরপুর
- খ) ফরিদপুর
- গ) যশোর
- ঘ) খুলনা

২। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল কেন?

- ক) দেশের অর্থ সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার জন্য
- খ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতার জন্য
- গ) উজীবিত বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য
- ঘ) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বহির্বিশ্বের সহায়তা লাভের চেষ্টার জন্য

৩। আনিসা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের জাদুঘরে গিয়ে দেখলো যে সেখানে খোদাই করে লেখা আছে “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম” উক্তিটি দেখে আনিসার কোন ঘটনা মনে পরেছে? (প্রয়োগ)

- ক) গণঅভ্যর্থনা
- খ) ভাষা আন্দোলন
- গ) ৭ মার্চের ভাষণ
- ঘ) শিক্ষা আন্দোলন

৪। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির আহবায়ক কে ছিলেন?

- ক) শেখ মুজিবুর রহমান
- খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- গ) এইচ এম কামারুজ্জামান
- ঘ) তাজউদ্দীন আহমেদ

৫। সৈয়দ নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য-

- i) তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা
- ii) তিনি মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি
- iii) তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

ছক্কটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-রাষ্ট্রপতি

↓
সৈয়দ নজরুল ইসলাম-উপ-রাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

↓
তাজউদ্দীন আহমদ-প্রধানমন্ত্রী

↓
খন্দকার মোশতাক
পররাষ্ট্র মন্ত্রী

↓
এ এইচ এম কামারুজ্জামান
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

↓
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
অর্থমন্ত্রী

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় কবে?

খ. আগরতলা মামলা কী? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্বীপকে প্রদর্শিত সরকার কাঠামোটির সাথে পাঠ্য বইয়ের যে সরকার কাঠামো মিল দেখা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উক্ত সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয়েছিল- বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-১৪.৫] বেসামরিক ও সামরিক প্রতিরোধ এবং ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রতিরোধ সংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনী গঠনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক বিভিন্ন বাহিনী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

| | |
|--|---|
|  মূখ্য শব্দ (Key Words) | ৭ মার্চের ঘোষণা, প্রতিরোধ যুদ্ধ, মুজিবনগর সরকারের দণ্ডর বণ্টন, মুক্তিবাহিনী, গণবাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, মুজিব বাহিনী, যৌথবাহিনী, বঙ্গবন্ধু, নৌবহর। |
|--|---|

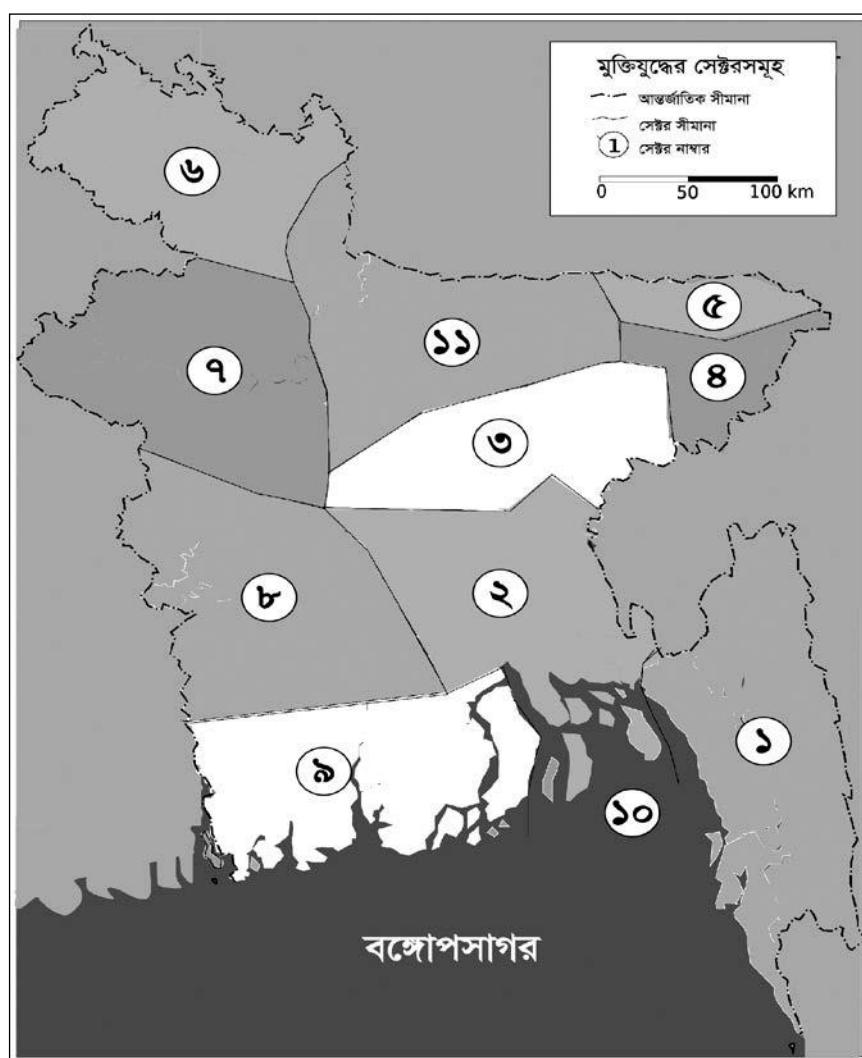
 ২৬ মার্চ (১৯৭১) প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম.এ. হানানের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন। গোটা বাঙালি জাতির হাদয়ে তখন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা: ‘এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট করেই জাতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শক্র মোকাবিলা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু সেদিন, আগাম একথাও বাঙালি জাতিকে জানিয়েছিলেন, ‘আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা (সবকিছু) বন্ধ করে দিবে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে গোটা বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ২৫ মার্চ (১৯৭১) দিবাগত রাতে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকা শহরের দ্বুমত নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর যে গণহত্যাযজ্ঞ ও সর্বাত্মক অভিযান শরু করে তখন তার প্রতিবাদে তৎক্ষণিকভাবেই সারা বাংলাদেশে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। পাঁচিশে মার্চ রাতেই পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ইপিআর, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ। সামরিক জওয়ান ও আফিসারদের প্রতিরোধ যুদ্ধের পাশাপাশি দেশের প্রায় সকল নগর-বন্দর-শহরে, থানা ও জেলা সদরে, রেলওয়ে স্টেশনে, হাট-বাজারে, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দের নেতৃত্বে ২৬ মার্চ থেকেই প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। বিছিন্নভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধের বাঙালি আফিসারদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এম.এ.জি. ওসমানী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কে.এম. সফিউল্লাহ এবং ১০ কর্নেল এম. এ. রব। সেখানে চার সিনিয়র অফিসারকে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব দেয়া হয়: (১) মেজর কে. এম. সফিউল্লাহ-এর কমান্ডে ব্রাক্ষণবাড়িয়া ও ময়মনসিংহ, (২) মেজর খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে কুমিল্লা ও সিলেট, (৩) মেজর জিয়াউর রহমানের কমান্ডে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং (৪) মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে কুষ্টিয়া অঞ্চলে।

মুজিবনগর সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনী গঠন

শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনীকে মোকাবিলা করে পরাস্ত করার জন্য সুশ্রেষ্ঠ সামরিক কাঠামোর অধীনে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রতি তাজউদ্দীন আহমেদ প্রথমেই নজর দেন। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ এপ্রিল বেতারে তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি সারা দেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেছিলেন। সেগুলো হলো:

- মেজর খালেদ মোশাররফ - সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চল।
- মেজর জিয়াউর রহমান - চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চল।
- মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল।
- মেজর কে এম সফিউল্লাহ - ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল।
- মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ - রাজশাহী অঞ্চল।
- মেজর নাজমুল হক - সৈয়দপুর অঞ্চল।
- মেজর নওয়াজেশ - রংপুর অঞ্চল।
- মেজর জলিল - ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চল।

মুজিবনগর সরকারের দপ্তর বণ্টন হলে তাজউদ্দীন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে রাখেন। ১৪ এপ্রিল কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক। মে ও জুন মাসে তিনটি বিগেড গঠিত হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। ফোর্সগুলির নাম ছিল: ‘জেড ফোর্স’, ‘এস ফোর্স’ এবং ‘কে ফোর্স’। অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান, লেঃ কর্ণেল কে. এম সফিউল্লাহ ও লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ। ১১ থেকে ১৭ জুলাই কোলকাতায় ইতোপূর্বে গঠিত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাজউদ্দীন আহমেদ উক্ত সভায় সভাপতিত করেন। এই সভাতেই বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এভাবে সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড স্থাপন করার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীকে মুজিবনগর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে।



মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

অসংগঠিত বা পরে সংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিফৌজ, বা মুক্তিসেনা নামে অভিহিত করা হতো। পরে যারাই যুদ্ধ করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত বাহিনীকে মুক্তিবাহিনী হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনিয়মিত ও নিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিতদের গণবাহিনী বলা হতো। নিয়মিত বাহিনীর অঙ্গর্গত ছিল সৈন্যরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপি.আর.-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকিরা গণবাহিনীতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে গণবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও অনেকে গেরিলা বাহিনী গঠন করেন। যেমন টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্ধিকীর কাদেরিয়া বাহিনী, সিরাজগঞ্জে রফিক মির্জা বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, বিনাইদহের আকবর বাহিনী, বরিশালের কুন্দুস বাহিনী, ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী প্রভৃতি।

ভারতের বাহিনীর মেজর জেনারেল ওবানের অধীনে বঙ্গবন্ধুর নামে ‘মুজিব বাহিনী’ নামে একটি বাহিনী গঠিত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর এ.কে. খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিমান বাহিনী। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করা নৌসেনাদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয় প্রথম নৌবহর ‘বঙ্গবন্ধু নৌবহর’। এছাড়া নৌকমাড়োও গঠিত হয়। ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও অস্ত্র দিয়ে সহায় করে। তাছাড়া যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানী সেনাদের থেকেও অস্ত্র যোগাড় করা হয়।

বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তিবাহিনী যার পরিসমাপ্তি ঘটে যৌথ বাহিনীর কমান্ডে বিজয় অভিযানে।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধ শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাযুদ্ধ শব্দ দুটির মধ্যে তফাত আছে। মুক্তিযুদ্ধ বলতে বোায়া বাঙালির সার্বিক মুক্তি। আর স্বাধীনতা যুদ্ধ কথাটির অর্থ হচ্ছে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাত থেকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক মুক্তি। অপরদিকে বঙ্গদিনের পুঞ্জীভূত বথনা, নিপীড়ন থেকে মুক্তি চাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি।



৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডিত্রি

| | |
|--|--|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) | মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন। |
|--|--|

সারসংক্ষেপ

২৫ মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার গগহত্যা শুরু করলে তৎক্ষনিকভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। মুজিবনগর সরকার ১০ এপ্রিল সারাদেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেন। ১১ থেকে ১৭ জুলাই উক্ত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, আকবর বাহিনী, কুন্দুস বাহিনী, আফসার বাহিনী প্রভৃতি। ভারতে আলাদাভাবে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে।

 পাঠ্যনির্দেশনা-১৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

পাঠ-১৪.৬ | জেনোসাইড বা গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ১৯৭১-এর শরণার্থী



উদ্দেশ্য

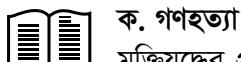
এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও শরণার্থীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বধ্যভূমির সংখ্যা বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।



গণহত্যা, জেনোসাইড, বধ্যভূমি, গণকবর, নারী নির্যাতন,

মুখ্য শব্দ (Key Words)



ক. গণহত্যা

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ জেনোসাইড (Genocide)। গ্রিক জেনোস এবং লাতিন সাইড শব্দ দুটি মিলে জেনোসাইড শব্দের সৃষ্টি। জেনোস অর্থে বোঝায় জাতি। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গণহত্যার অর্থ কোন সরকার কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় জনগণকে নিঃশেষ করা। ১৯৪৫ সালে জেনোসাইড শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে গণহত্যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত যার কোন ক্ষমা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে। মাত্র নয় মাসে এত বেশি মানুষ আর কোথাও হত্যা করা হয়নি।

পাকিস্তানী বাহিনী পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রিতে। বাঙালিকে শক্তির সাহায্যে দমন করার পরিকল্পনার নাম তারা দিয়েছিল ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ বাঙালিদের দমন করার জন্য ৩ ব্যাটালিয়ন সৈন্য ‘অপারেশন সার্চ লাইটে’ অংশগ্রহণ করে। রাত ১১ টার দিকে অপারেশন শুরু হয়। এই অপারেশনের লক্ষ্য ছিল গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ। ঐ রাতে পুরো ঢাকা শহর আক্রান্ত হয়। সে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের হত্যা করে জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন জায়গায় গণকবর দেয়া হয়। সে রাতে ৭ জন শিক্ষক শহিদ হয়েছিলেন। শাঁখারি বাজার, তাঁতিবাজার, নয়াবাজার পুড়িয়ে দেয়া হয়। সে রাতে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকা শহরে দশ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল।



ত্যাল কালো রাত ২৫ মার্চ

২৫ মার্চ (১৯৭১) থেকে গণহত্যা শুরু হয় এবং তা চলে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই গণহত্যা চালানো হয়েছিল। যেখানে একসঙ্গে মৃতদেহ গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়েছে তাকে আমরা গণকবর বলি। আবার নির্দিষ্ট কিছু স্থানে মানুষ ধরে নিয়ে যেয়ে হত্যা করে ফেলে রাখতো— সেগুলি বধ্যভূমি নামে অভিহিত। যেমন ঢাকার রায়ের বাজার বধ্যভূমি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সংরক্ষণের অভাবে অনেক গণকবর ও বধ্যভূমি আজ বিলুপ্ত। এক জরিপে বাংলাদেশে এক হাজারেরও বেশি গণহত্যা ও বধ্যভূমির নাম পাওয়া গেছে।



গণহত্যা

খ. নারী নির্যাতন

মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নারী। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা ধর্ষিতা বা নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা আনুমানিক ছয় লাখের কাছাকাছি। মুক্তিযুদ্ধের পর নির্যাতিত নারীদের সেবা প্রদানের জন্য এসেছিলেন অন্ট্রেলিয়ান ডাক্তার জিওফ্রে ডেভিস। তাঁর মতে নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা চার লাখের কম নয়। তাঁর বর্ণনায় অন্তঃস্বত্ত্ব মহিলার সংখ্যাই ছিল ২ লাখ। অন্তঃস্বত্ত্ব মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আন্তর্হত্যা করেছেন, কেউ কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।



নারী নির্যাতন

গ. ১৯৭১-এর শরণার্থী

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শরণার্থী। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসরদের হত্যা, নিপীড়ন, ধর্ষণ এড়াতে ২৬ মার্চ থেকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালিরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী রাজ্যে যেতে থাকে। এরা শরণার্থী হিসেবে অভিহিত। বাংলাদেশের শতকরা ৯৪ ভাগ সীমান্ত ভারতের সাথে, বাকি ৬ ভাগ মিয়ানমারের সাথে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু বাসিন্দা সীমান্ত পেরিয়ে মিয়ানমারে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিয়ানমার যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সহানুভূতির সাথে দেখেনি, তাই মিয়ানমারের সীমান্ত অতিক্রম করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শরণার্থী সেদেশে বেশি যায়নি। বাংলাদেশের সংগে ভারতের পশ্চিমবাংলা, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত ছিল। এসব রাজ্যের

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষজন শরণার্থীদের প্রতি সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাঢ়িয়েছিল। উভয় অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিল আছে। অনেকের আত্মায় স্বজনও ছিলেন ওপারে।। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশেও অনেক শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।

শরণার্থী স্ন্যাত এপ্রিল থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতীয় হিসাব অনুযায়ী মোট ৯৮,৯৯,৩০৫ জন শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। শরণার্থী শিবিরের বাইরেও ছিলেন অনেক শরণার্থী। এই প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে স্বাভাবিক ভাবেই মানবের জীবনযাপন করতে হয়েছে। কলেরা ও অন্যান্য রোগে মারা গেছেন অনেকে।



১৯৭১-এর শরণার্থী

ভারত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শরণার্থীদের সাহায্য দেওয়ার। শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন ভারত বর্ষের সাধারণ মানুষ, প্রবাসী বাঙালি, জাতিসংঘ ও বিশ্ববাসী। তবে সেসব দান ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

শরণার্থী সমস্যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথমত: বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাপ ভারতের পক্ষে দীর্ঘদিন সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ভারত সরকারকে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছিল শরণার্থীদের জন্য। এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল পাকিস্তানের পরাজয় ও মুক্তিযুদ্ধের জয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। দ্বিতীয়ত: পাকিস্তান ভূখণ্ড থেকে শরণার্থীর স্ন্যাত অনবরত ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে থাকায় পাকিস্তান এ কথা প্রমাণ করতে পারেনি যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে বিশ্বজনমত তার পক্ষে নেয়া সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত: শরণার্থী সমস্যাকে প্রধান করে ভারত বিশ্বজনমতকে তার পক্ষে ও বাংলাদেশের পক্ষে আনতে পেরেছিল।

| | |
|--|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | নিজের এলাকার যেকোন একটি গণহত্যা বা বধ্যভূমি সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন। |
|--|---|

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ছয় লক্ষ নারী নির্যাতিত হন। সেসময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ପାଠୋତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ-୧୪.୬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। প্রতিবছরের মত এবারও ২৫ মার্চ রাতে তাসনিম তার বাবাকে কালো ব্যাজ পরতে দেখেছে। তিনি কোন হত্যাকাণ্ডের

শোক প্রকাশের জন্য এই ব্যাজ পরছেন?

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ক) ন্যাষনি কর্তৃক ইহুদি নিধন | খ) অপারেশন সার্চ লাইট |
| গ) হিরোশিমা নাগাসাকি হত্যাকাণ্ড | ঘ) চুকনগর হত্যাকাণ্ড |

২। ২৫ মার্চের গণহত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী কী চেয়েছিল?

- | |
|--|
| ক) গণহত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলার মাটির নিয়ন্ত্রণ নিতে |
| খ) নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদদের হত্যা করতে |
| গ) অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বন্দি করতে |
| ঘ) ভৌতিক অবস্থা প্রদর্শন করে শাসন করতে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সাজ্জাদ জহির একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে এসে তিনি বলেন— এক রাতে পাকবাহিনী বাংলায় নারীকীয় হত্যায়জ্ঞ চালায়। সে হত্যায়জ্ঞ এখনো বিশ্বব্যাপী নিন্দিত। নির্বিচারে তারা মানুষ হত্যা করে। অনেক অনৈতিক কাজ করে। যা প্রথমে ঢাকা এবং পরবর্তিতে সারা দেশে পরিচালিত হয়।

৩। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রাত হলো—

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক) ৭ মার্চের রাত | খ) ১০ মার্চের রাত |
| গ) ২৪ মার্চের রাত | ঘ) ২৫ মার্চের রাত |

৪। এ রাতে গণহত্যার কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i) বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাত করা ii) পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা iii) পাকিস্তানকে আলাদা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৫। এ রাতে গণহত্যার ফলে—

- i) বাঙালির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়
ii) মানুষ ভীত হয়ে পালিয়ে যায়
iii) কঠোর প্রতিরোধ গড়তে প্রস্তুত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল

১৯৯০ সালের ২ মার্চ ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রান্ত হয়। আকস্মিক আক্রমণে হতবিহবল কুয়েতি জনগণ পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশি দেশ সৌদিআরবে আশ্রয় নেয়। প্রতিবেশি দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান এর ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও জনগণ আশ্রয় প্রত্যাশী শরণার্থীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

ক. “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম” কে এই ঘোষণা দেন?

খ. মুজিবনগর সরকার কেন গঠিত হয়?

গ. উদীপকের ঘটনাটি পাকিস্তান আমলের যে ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে, পাঠ্য বইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উল্লিখিত মিত্র দেশটির সহযোগিতা ছিল আক্রান্ত দেশটির স্বাধীনতা লাভের অনুপ্রেরণা উৎস— উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-১৪.৭ | মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক ও পেশাজীবী শ্রেণির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা ও ভারতের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে দালাল, রাজাকার, আলবদর-আলশামসদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

বুদ্ধিজীবী, ‘পূর্ববাংলা বিক্ষুল শিল্পী সমাজ’, ‘লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ’, ‘বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি’ তারামন বিবি, সিতারা বেগম, বামপন্থী দল, প্রবাসী বাঙালি, জর্জ হ্যারিসন, ওস্তাদ রবিশঙ্কর, ইন্দিরা গান্ধী, পিস কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, বিহারী, টিক্কা খান, নারী নির্যাতন।



বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের অতি দ্রুত জয়লাভের কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, নারী, শ্রমিক ও আপামর জনসাধারণের সমর্থন, প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ, ভারতের সমর্থন। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক. ছাত্রদের ভূমিকা

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৭৫% ছিল ছাত্র, যাদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে— যেমন সেকশন কমান্ডার, প্লাটান কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল বেশি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ছাত্রাই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সংগে মাত্র তিন সপ্তাহের সামরিক ট্রেনিংকে সম্পূর্ণ করে তারা নিজ জীবনকে বাজি রেখে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের পরোক্ষ ভূমিকাও ছিল। ছাত্রদের মধ্যে যারা সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কেউ শরণার্থী শিবিরে ও ইয়োথ ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে। কেউ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মুক্তি যোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করেছে।

খ. বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র যুদ্ধের পাশে বিশ্ব জনমত গঠন করা, কুটনৈতিক তৎপরতা চালানো, প্রচার মাধ্যমকে সচল রাখার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা, রেডিওতে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রোগ্রাম প্রচার করা, প্রবাসী সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ ছিল অত্যন্ত জরুরি। এদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এসব কাজের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কেবল ১৯৭১ সালেই নয়, ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তাতেও বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেসময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘পূর্ব বাংলা বিক্ষুল শিল্পী সমাজ’ (৬.৩.১৯৭১), ‘লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ’ (৬.৩.১৯৭১) ইত্যাদি সংগঠন। তাছাড়া শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক সমিতি, আইনজীবী সমিতি, চলচিত্র শিল্পী সমিতি ও বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির ব্যানারে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণির সদস্যবৃন্দ রাস্তায় নেমে আসেন এবং বিভিন্ন মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অসংখ্য শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অসামরিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন: প্রবাসী শিক্ষকগণ ভারতীয় শিক্ষকবৃন্দের নৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ২১ মে (১৯৭১) গঠন করেন ‘বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি’। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল কোলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত ‘বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’। ভারতের শিক্ষকগণের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষকগণ শরণার্থী শিবিরে ৫৬ টি স্কুল চালু করেছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতি ‘বাংলাদেশ : দ্যা রিয়েলিটি’, ‘বাংলাদেশ : দ্যা ট্রুথ’ প্রভৃতি নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সদস্যগণ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন।

ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, নাট্যকার, চারু ও কারু শিল্পী প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় ‘বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইন্টেলিজেন্টশিয়া’। এই সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত গঠনের কাজ করে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। কেউ সশন্ত্র যোদ্ধা হিসেবে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের অন্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারীরপে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার রাখা করে, অনুপ্রেণা যুগিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে, সেবাদান করে ইত্যাদি নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিটি নারী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন ও স্ত্রী-এর যেকোনো একটি। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো: কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে ৪০০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সশন্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন। আগরতলার লেমুচোরা ক্যাম্পে মহিলা গেরিলা ক্ষেয়াড-এর আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর ট্রেনিং হয়। রণাঙ্গনের যোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। চিকিৎসার কাজে মহিলা চিকিৎসকগণের গৌরবময় দৃষ্টান্ত ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম। তিনিও বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন। জনমতগঠনে দেশী-বিদেশী নারী মহিলা সংগঠন যেমন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, লঙ্ঘনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারী সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রশংসনীয় অবদান ছিল।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দলসমূহের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মক্ষেপন্থী বামপন্থুলো যেমন কমিউনিস্ট পার্টি (মনিসিংহ), ন্যাপ (মোজাফফর), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও কৃষক সমিতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই চারদলের প্রায় ছয় হাজার সদস্য বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা পালন করে এবং স্পেশাল গেরিলা বাহিনীর ২০০০ সদস্য ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। স্পেশাল বাহিনীর একটি দলকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ফিরে আসার পূর্বেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

চ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে লঙ্ঘন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে (যেখানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন) বাঙালিরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন, স্মারকলিপি দেন, সংসদ সদস্যদের কাছে ধর্ণা দেন, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লঙ্ঘনে ইউরোপের অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিরা এসে মিলিত হতেন। লঙ্ঘনে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিদেশের দুর্তাবাসসমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: কোলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের হোসেন আলী এবং অন্যান্য বাঙালি স্টাফ (১৮.০৪.৭১), নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনসুলেট জেনারেলের

ভাইস কনসাল আবুল হাসান মাহমুদ আলী (২৬.০৪.৭১), লঙ্ঘনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ (১.০৮.৭১), ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসে ইকনমিক কাউন্সিল পদে কর্মরত আবুল মাল আব্দুল মুহিত (১.০৮.৭১), আবুল ফতেহ (ইরাকে কর্মরত ২১.০৮.৭১), হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (দিল্লীতে কর্মরত, ৪.১০.৭১), আবদুল মোমিন (আর্জেন্টিনায় কর্মরত, ১১.১০.৭১), ওয়ালিউর রহমান (সুইজারল্যান্ডে কর্মরত, ০৩.১১.৭১) প্রমুখ।

অতএব বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ছ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ বাঙালিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও সেদেশের নাগরিকেরা বাঙালিদের সমর্থনে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, মার্কিন সরকার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। যুক্তরাজ্যের নাগরিকেরা বাঙালিদের সংগে রাস্তায় নেমেছেন। পাকিস্তানে সিভিল সমাজের অনেকেই বাঙালিদের সমর্থন করতে গিয়ে জেলে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক কবি বাঙালি শরণার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকারের দানের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিতে অনশন করেছেন। ব্রিসবেনে আয়ার্সে নোবেলজয়ী লেখক বোহের্স, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বুদ্ধিজীবী ভিট্টোরিয়া ওকাস্পো বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল করেছেন। জর্জ হ্যারিসন, রিংগো স্টার, লিয়ন রাসেল, ওস্টাদ রবিশক্র প্রমুখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাঙালিদের জন্য কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। জন বেজ বাংলাদেশের জন্য গেয়েছিলেন। অ্যালেন গিনসবার্গ বাংলাদেশের জন্য কবিতা লিখেছেন।

জ. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে ভারতের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দীর্ঘ নয় মাস ভারত প্রায় এককোটি শরণার্থীর ভরণ-পোষণের সকল খরচ বহন করে। মুক্তিবাহিনীর জন্য ভারতের মাটিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদান, অস্ত্র সরবরাহ, রসদ প্রদান এসবই করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী। শেষ পর্যন্ত যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। ভারত শরণার্থী খাতে প্রায় ২৬০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও রসদ খাতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করে। তাছাড়া পাকিস্তানি বাহিনী ও যৌথ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে ভারতের প্রায় চার হাজার অফিসার ও জওয়ান শহীদ হয়েছেন।



ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অবস্থান ছিল ভারতে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, পত্র-পত্রিকা প্রত্তি কেবল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি, বিশ্ব জনমত গঠন করা, আন্তর্জাতিক বৃটনেতিক যোগাযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায় করা ইত্যাদি কাজগুলোও তারা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লিখতে হলে ভারতের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠি ও দল

লে. জেনারেল টিক্কা খান ৬ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও ৭ মার্চ গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ঐ দুই পদে বহাল থাকেন। ২ সেপ্টেম্বর ডা. এ.এম. মালিক গভর্নর এবং লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়। ডা. মালিকের নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর বাঙালিদের এক মন্ত্রিসভা গঠন করার মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিম্বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সকল বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক

নয়। এসব বিশ্বাসঘাতক বাঙালিরাই মার্ট থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সরকারের বাইরে থেকেই সৃষ্টি করেছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী, সারাদেশে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও বিডি মেধারদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পিস কমিটি। এসব পিস কমিটির সদস্য এবং রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ওপর চালিয়েছিল অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বাড়িঘর লুষ্টন ও তা আগনে পুড়িয়ে দেয়া এসব জঘন্য কাজ।

পিস কমিটি বা শান্তি কমিটি

৯ এপ্রিল (১৯৭১) ঢাকায় ডানপন্থী বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে ১০৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করে। ১৪ এপ্রিল কমিটির নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। পরে জেলা, মহকুমা, থানা ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি কমিটি সাধারণ মানুষের কাছে পিস কমিটি নামে বেশি পরিচিত। পিস কমিটির সদস্যদেরকে দালাল বলা হয়। এখনও মানুষ রাজাকার ও দালালকে আলাদা নামে চেনে। রাজাকার বাহিনী গঠন, রাজাকারদেরকে পরিচালনা করা, রাজাকারের অপকর্মকে সম্মতি দেয়া এবং রাজাকারকে দিয়ে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা, যুবতী মেয়েদেরকে ধরে আনা এসব কাজ দালালরাই করেছে।

রাজাকার বাহিনী

লে. জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে ‘পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যাস ৭১’ জারি করেন। তার পূর্বেই ’৭১-এর মে মাসে মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ ৯৬ জন জামায়াত কর্মীর সমষ্টিয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে ‘রাজাকার বাহিনী’ গঠন করেন। পরবর্তীকালে অর্ডিন্যাসে এই নাম গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান মোঃ ইউসুফ রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান রক্ষার সংগ্রামের চাইতে লুটপাট, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ এসব কাজে মগ্ন থেকেছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান দেওয়া, হানাদার বাহিনীকে তাদের বাড়িঘর চিনিয়ে দেওয়া, গ্রাম থেকে যুবতী নারী ধরে এনে আর্মি ক্যাম্পে সরবরাহ করা ইত্যাদি অপকর্মে রাজাকারদের নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

আলবদর বাহিনী

রাজাকার বাহিনী গঠনের পর আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। তবে রাজাকারের অধ্যাদেশের মত এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উদ্যোগ ও প্রেরণায় এই বাহিনী গঠিত হয়। আলবদরদের অন্তর্শন্ত্র সরবরাহ করেছে পাকিস্তান বাহিনী। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরাই আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই বাহিনীর কাজ ছিল দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ভাবধারার সমর্থক ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক শ্রেণিকে হত্যা করা।

আলশামস বাহিনী ও বিহারী সম্প্রদায়

আলশামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানত অবাঙালি (বিহারি)-দের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী বাহিনী এদের হাতে অন্ত তুলে দেয় এবং বাঙালি নিধনে দেয় অবাধ অধিকার। বাঙালির সম্পদ লুট করতেও এদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে বিহারী সম্প্রদায় যে লুটপাট ও হত্যায়জ্ঞ চালিয়েছে তা অকল্পনীয়।

শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর বাহিনী প্রধানত গঠিত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মীয় পাকিস্তান পন্থী দলের কর্মী ও বিহারিদের দ্বারা। তবে, নৃশংস আলবদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রসংঘের সদস্যদের দ্বারা। এইসব হত্যাকাণ্ডে জামায়াতি ও মুসলিম লীগ নেতারা বিশেষ করে গোলাম আজম, ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রমুখ প্রধান ভূমিকা নেন।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | <p>মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী ও দল সম্পর্কে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন।</p> |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, পেশাজীবী শ্রেণি, শিল্পী, খেলোয়াড়, প্রবাসী বাণিজি প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও অবদান ছিল। অনেক বিদেশী নাগরিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তান সরকারকে ও বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীসমূহ।

পাঠ্ঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে শক্রমুক্ত করে-

- i) কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক ii) পুলিশ ইপিআর সেনাবাহিনী iii) আলবদর আল শামসবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

২। কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে কতজন নারী সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- | | |
|-----------|-----------|
| ক) ২০০ জন | খ) ৪০০ জন |
| গ) ৬০০ জন | ঘ) ৮০০ জন |

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন, শুধু এদেশের সর্বস্তরের জনগণই নয় অনেক দল ও সংগঠন এমনকি অনেক দেশ ও এ যুদ্ধে সহায়তা করেছে প্রতিবেশী একটি দেশ প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে সে সময় আশ্রয় দেয়। যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা তৈরির সশস্ত্র প্রশিক্ষণও দিয়েছিল।

৩। এদেশকে বেসরকারিভাবে সহযোগিতা করেছিল- (অনুধাবন)

- i) অধিকাংশ রাজনৈতিক দল
ii) পেশাজীবী সংগঠন
iii) সেনাবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৪। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন দেশের কথা বলা হয়েছে-

- | | |
|---------|-----------------|
| ক) চীন | খ) নেপাল |
| গ) ভারত | ঘ) যুক্তরাষ্ট্র |

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বুয়েনস আয়ার্সে মিছিল করেছেন-

- i) বোহের্স ii) অ্যালেন গিনসবার্গ iii) ভিস্টোরিয়া ওকাম্পো

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i | খ) i ও ii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

পাঠ-১৪.৮] মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিরপেক্ষ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

| | |
|-----------------------------------|---|
| মুখ্য শব্দ (Key Words) | <p>পরাশক্তি, চীন, আমেরিকা, মুসলিম দেশ, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ, শরণার্থী।</p> |
|-----------------------------------|---|

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। একভাগের নেতৃত্বে পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ও মুসলিম দেশসমূহ, অন্যদিকে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহ এবং ওআইসি বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার প্রতিবাদ করেনি বরং পাকিস্তানকে সমর্থন করতে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে।

সোভিয়েত বলয়ভুক্ত দেশসমূহ সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। মার্কিন বলয়ভুক্ত দেশসমূহ মার্কিনী সরকারের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়নি। তারা গণহত্যার নিন্দা করেছে, শরণার্থীদের সহায়তা করেছে, রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানিয়েছে।

চিন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। চীনের গণহত্যা সমর্থন বিশ্বজুড়ে এমনকি ভারত ও বাংলাদেশের চিনাপঙ্খী কমিউনিস্টদের বিপদে ফেলেছে।

জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে তিন পরাশক্তির বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের সহায়তা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যের নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে বাঙালির স্বাধীকার সমস্যার সমাধান করা। বাংলাদেশের ঘটনায় ব্রিটেন সরকারিভাবে উৎকর্ষ প্রকাশ করে এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক আণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকারের নিরপেক্ষ নীতির কারণে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকায় ও বেতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারণা সহজতর হয়েছিল এবং ব্রিটেনের মাটিকে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার জন্য কোন সরকারি বাধা বিল্ল ছাড়াই জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এসব অবস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন সরকার পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। এমনকি ডিসেম্বরে বঙ্গোপসাগর অভিযুক্তে সম্ম নৌবহর প্রেরণ করে। সে সময় মার্কিন সরকারের যুক্তি ছিল যে, পাকিস্তান পুরনো বন্ধু, সিয়াটো-সেন্টের সদস্য, সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ, তদুপরি মার্কিন-চিন সম্পর্ক উন্নয়নে পাকিস্তান তখন মধ্যস্থতা করছিল। কিন্তু তখন মার্কিন আইন পরিষদের সদস্যরা, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, গণমাধ্যম, জনসাধারণ অর্থাৎ এক কথায় সরকার ব্যতিরেকে আর সকলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

| | |
|---|--|
|  অ্যাক্রিটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে একটি অ্যাসাইমেন্ট লিখুন। |
|---|--|

৫ সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। ভারত ও সেভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তবে সরবরাহের জন্মত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। পরাশক্তিসমূহের বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। সে সময় যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

৬ পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-১৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দিন

- ১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব কয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল-

| | |
|--------|------------|
| ক) ২টি | খ) ৩টি |
| গ) ৪টি | ঘ) অবিভক্ত |
- ২। ভারতে আশ্রায় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য কোন সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেয়?

| | |
|-----------------------|---------------|
| ক) যুক্তরাষ্ট্র | খ) যুক্তরাজ্য |
| গ) সংযুক্ত আরব আমিরাত | ঘ) চীন |

পাঠ-১৪.৯] স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও বিজয়দিবস



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো দেবার বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।



গেরিলা আক্রমণ, ইন্দিরা গান্ধী, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী, ভারতীয় বাহিনী, যৌথবাহিনী, মুক্তিবাহিনী, সপ্তম নৌবহর, জেনারেল জগজিং সিং অরোরা, জেনারেল নিয়াজী, কাদের সিদ্দিকী।

মুখ্য শব্দ (Key Words)

পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসর দালাল, আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বাঢ়তে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন বাঢ়তে থাকে। ভারত ক্রমশ পাকিস্তানের সংগে সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করেন। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে- স্পষ্ট করে বলা হয় যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী এক দেশ আক্রান্ত হলে অন্য দেশ তাকে সাহায্য করবে। নভেম্বরে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীকে স্পষ্ট করে নির্দেশ দেয়া হয় যে, সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর হামলায় নিরাপত্তা বিস্তৃত হওয়ার ভূমিক দেখা দিলে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে। এভাবে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক যৌথভাবে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনি পরিস্থিতিতে আসন্ন পরাজয়ের মুখে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ও ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ১৮ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে পর্যন্ত করে ভারতের বিমান বাহিনী। মুক্তিবাহিনী ও যৌথবাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সর্বত্র পিছু হটতে শুরু করে।



বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে তৎকালীন রমনায় [বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] রেসকোর্সে পাকিস্তান বাহিনী ও এর সহযোগী শক্তিসমূহের আত্মসমর্পণ

৬ ডিসেম্বর ভূটান ও ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিল্সন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনি তিনবার ভেটো দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর প্রেরণ করে। তার পাল্টা ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম নৌবহর দ্বিতীয় নৌবহরের পিছু নেয়। মিত্র বাহিনীও মার্কিন নৌবহরের চট্টগ্রাম অবতরণের সকল ব্যবস্থাই অচল করে দেয়। শেষপর্যন্ত জেনারেল আবদুল্লাহ নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্সের যে স্থানে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে ৯৩ হাজার সৈন্য ও অফিসারসহ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন লে. জেনারেল জগজিং সিং অরোরা, জিওসি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রন্থ ক্যাপ্টেন এ. কে. খোন্দকার উপস্থিতি ছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর সংগে ঢাকায় আগত কাদের সিদ্ধিকীও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সূচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ‘আনুষ্ঠানিক অভ্যন্তর’।

| | |
|---|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলির বিবরণ লিখে শিক্ষককে দিন। |
|---|---|

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথবাহিনী। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনি তিনবার ভেটো দেয়। যৌথবাহিনীর হাতে পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়ে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বিজয় ঘটে।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন-১৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার যথার্থ কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
 - ক) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ
 - খ) পাকিস্তানের ভূটান আক্রমণ
 - গ) পাকিস্তানের নেপাল আক্রমণ
 - ঘ) পাকিস্তানের ভূটান আক্রমণ
- ২। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে ভেটো দানকারি দেশ হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)
 - ক) ভারত
 - খ) চীন
 - গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন
 - ঘ) ফ্রান্স
- ৩। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের কত হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল?
 - ক) ৯০ হাজার
 - খ) ৯১ হাজার
 - গ) ৯২ হাজার
 - ঘ) ৯৩ হাজার
- ৪। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় দিবস কবে?
 - ক) ২১ ফেব্রুয়ারি
 - খ) ২৬ মার্চ
 - গ) ১৭ এপ্রিল
 - ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

পাঠ-১৪.১০ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সরকার গঠন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- যুদ্ধবিধিস্থ বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বঙ্গবন্ধুকে কী কী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ (Key Words)

জাতির জনক, যুদ্ধবিধিস্থ বাংলাদেশ, ‘অস্তবর্তীকালীন শাসনতত্ত্ব আদেশ’, ১৯৭২, যুদ্ধবন্দি, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, প্রশাসনিক কাঠামো, সীমান্ত চোরাচালান, দালাল, সংবিধান প্রণয়ন।

ভূমিকা: স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতির জনক। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে কেবল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে উপহার দেননি, সেই রাষ্ট্রের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিও তিনি শক্তিশালী করেছিলেন।



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর (১২-০১-১৯৭২ থেকে ১৪-০৮-১৯৭৫ পর্যন্ত) বাংলাদেশের সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্বল্পতম সময়ে একটি যুদ্ধবিধিস্থ দেশকে পুনর্গঠন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বাস্তবায়িত সংস্কার কর্মসূচিগুলো আলোচনা করলে আমরা এই মহান নেতার রাষ্ট্রনায়কেচিত নানান কৃতিত্বের কথা জানতে পারব।

সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কয়েকদিনের মধ্যেই মুজিবনগর প্রশাসনের সিনিয়র আমলাবৃন্দ (সচিব রঞ্জল কুদুসের নেতৃত্বে) ঢাকায় এসে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণভাব গ্রহণ করেন। ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের সদস্যবৃন্দ ঢাকায় আসেন। ঢাকায় পৌছে তাজউদ্দীন আহমেদ তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর লক্ষন-দিল্লি হয়ে ১০-০১-৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রবাসী সরকার গঠনের

সময়েই বঙ্গবন্ধু ঐ সরকারের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তাঁর অনুপস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধু সেই পদে বহাল ছিলেন। সুতরাং বঙ্গবন্ধু ১০.১.১৯৭২ তারিখে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবেই নিজ মাতৃভূমিতে



বঙ্গবন্ধুর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকায় ফেরার পরদিন (১১.১.৭২ তারিখ রাতে) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ‘অঙ্গবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র আদেশ, ১৯৭২’ জারি করেন। এই আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির কাছে প্রথমে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পরে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সরকার প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। তখন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন।



বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের সময় যুদ্ধবিধিবন্ত বাংলাদেশের চিত্র

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের সময় গোটা বাংলাদেশ ছিল এক যুদ্ধবিধিবন্ত ভ্রথণ। মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস ও পিস কমিটির সদস্যরা সারা বাংলাদেশে ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ১৯ হাজার গ্রাম্য হাট-বাজার, ৩ হাজার অফিস-ভবন, ৬ হাজার হাই স্কুল, ১৮ হাজার থাইমারি স্কুল ও মাদরাসা এবং ৯০০ কলেজ ভবন পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ৩০০ রেল সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রায় ২০০ মাইল রেল লাইন সম্পূর্ণ বা আংশিক অকেজো করা হয়, শত শত বাস-ট্রাক ধ্বংস হয়, চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর দুটিতে মাইন পোতার ফলে অকার্যকর হয়ে পড়ে, দেশের বিমান বন্দরসমূহের রানওয়ের ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দেশের টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক লুটপাটের ফলে ব্যাংকগুলো হয়ে পড়ে তহবিল শূন্য। পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের পূর্বমুহূর্ত বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। তারা বিভিন্ন খাদ্য ও পুরুষ মজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ, সার ও কীটনাশক ধ্বংস করে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তান বাহিনী ও রাজাকার-আলবদর কর্তৃক লক্ষাধিক গরু জবাই করে মাংস খাওয়ার ফলে হালচামের জন্য গবাদি পশুর সংকট সৃষ্টি হয়। উপরন্ত মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে কৃষকগণ বস্তবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে থাকার

কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বিস্থিত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এমন সংকটময় অবস্থাতে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে ৯০ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী, ৩৭ হাজার রাজাকার ও দালাল ও প্রায় সোয়া লক্ষ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য সরবরাহের এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে সময় দক্ষ জনবলের অভাব (অর্থাৎ দক্ষ প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, ব্যাংকার, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীবর্গের অভাব) পূরণ করা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভেঙ্গে যাওয়া প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা বঙ্গবন্ধুর সরকারের জন্য ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। বঙ্গবন্ধুর সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে আরও যেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. একটি সংবিধান প্রণয়ন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা;
২. স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ করা;
৩. জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন করা;
৪. যুদ্ধবিধিস্থ বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অনুদান লাভ করা;
৫. মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও তাদেরকে পুনর্বাসন করা;
৬. শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং ভারতে আশ্রয়সহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে বাংলাদেশে পুনর্বাসন করা;
৭. দালালদের আটক করে বিচারের সম্মুখীন করা;
৮. পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা;
৯. বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রায় সোয়া লক্ষ ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো;
১০. সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা;
১১. আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব মোকাবিলা করা;
১২. বাংলাদেশকে ঘিরে স্থৃত আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধর্মসের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা;
১৩. সরকার বিরোধী রাজনীতি (যেমন জাসদ ও সর্বহারা পার্টির সরকার বিরোধী কার্যকলাপ) মোকাবেলা করা;
১৪. ঐতিহাসিক এগার দফায় উল্লিখিত দাবিগুলো, যেমন ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, ব্যাংক-বীমা, পাটকল ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা, কৃষকদের খাজনা কমানো, বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা;
১৫. শিল্প-কলকারখানা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সচল করে তোলা; এবং সর্বোপরি-
১৬. দেশের জনগণের আকশুচৰ্মী আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

| | |
|--|---|
|  অ্যাকচিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | ‘যুদ্ধ বিধিস্থ বাংলাদেশের চিত্র’ শিরোনামে একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা বাড়ির কাজ তৈরি করুন। |
|--|---|

৪. সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর লক্ষন-দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ জানুয়ারি ‘অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র আদেশ ১৯৭২’ জারি করেন। ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েই পদত্যাগ করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধিস্থ।

পাঠোন্তর মূল্যায়ন-১৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন কবে?

২। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার কেন শ্রেণী করেন?

- ক) বিশ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের জন্য
গ) সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য

খ) দুষ্ক্ষতিকারীদের শান্তি প্রদান করতে
ঘ) স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

‘ক’ নামক শস্য শ্যামল একটি দেশের হাসান, লিঙ্গা গোমেজ, শংকর ও সীমা বড়ুয়া তাদের নিজস্ব পার্বন ঈদ, বড় দিন, দোলযাত্রা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা ইত্যাদি স্বাধীন ভাবে পালন করে। এসব অনুষ্ঠান উদয়াপনে রাষ্ট্রিয় কোনৰূপ সহায়তা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

৩। উদ্দীপকের শস্য-শ্যামল রাষ্ট্রিতির সাথে বাংলাদেশের ১৯৭২ এর সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যটির সদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছে?

৪। উক্ত বৈশিষ্ট্যটি দেশের জনগণকে দেয়-

- ক) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
গ) সামাজিক স্বাধীনতা

খ) সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা
ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতা

৩৮ উত্তরমালা

পাঠোভ্র মূল্যায়ন- ১৪.১ : ১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. খ

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন- ১৪.২ : ১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. ক ৫. ক

ପାଠୋତ୍ତର ମଲ୍ୟାଯନ- ୧୫.୩ ୦ ୧. ଖ ୧. ଗ ୩. ଖ

পাঠ্টোন্তর মল্লায়ন- ১৪ ৪ : ১ ক ২ ঘ ৩ গ ৪ ঘ ৫ ঘ

ପାଠୀକର ମଳାଯନ- ୧୫ ୯ : ୧ ସ ୧ ଗ ୩ ସ ୪ ଗ

ପାଠ୍ୟକର ମନ୍ତ୍ରାୟନ- ୧୫ ୬ ମୁଣ୍ଡର ପାଠ୍ୟକର ମନ୍ତ୍ରାୟନ- ୧୫ ୬ ମୁଣ୍ଡର

ପ୍ରାଚୀତବ ମଳିଯେନ ୧୫୭୦ ୧ କ ୧ ଅ ୨ କ ୪ ଗ ୫ ଗ

পাঠ্যকার মন্তব্যেন ১৪৮ং ১ ক ১ অ

ପ୍ରାଚୀନ ମଲିମେଳ ୧୯୮୦ ମେସାହି ୧୩ ମୁହଁ ୧ ମେସାହି